জীবনানন্দ
সমগ্র
তৃতীয় খণ্ড

সূ চি প ত্র

উপন্যাস

বড় গল্প

গল্প

কবিতা

উপন্যাস

কা রু বা স না

আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে, শ্রাবণ চলছিল। এই বর্ষায় বইয়ের বড্ড ক্ষতি হয়। কয়েক দিন আগে স্টেশনের বইগুলো দেখেছিলাম—স্টলের সমস্ত বইগুলোই প্রায় পুরোনো, ছেঁড়াখোড়া মালিকের সঙ্গবিহীন গ্রন্থিহীন জীবনের জর্জরতার অপরাধ এদের চোখেমুখে। নতুন বইও কয়েকখানা আছে। গত বছর কলকাতায় যখন পঁচিশ টাকা ট্যুইশান করি, ট্রাম-সিনেমা ও চায়ের পথ এড়িয়ে, খুব একটা শাদাসিধে মেসের জীবন্মৃত অবস্থার ভিতরে থেকে কয়েকখানা বই কিনতে পেরেছিলাম: ইংরেজি কবিতার বই দুটো, একখানা আমেরিকান উপন্যাস গত শতাব্দীর, একখানা নভেল এবং আরো দু-তিনখানা বই। ক্যাটেলগ দেখে কিনি নি; কারো পরামর্শ নিয়েও নয়; ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সমালোচনা ও খবরাখবর আমি অনেক দিন ধরে দেখি নি; বই ক-খানা কিনেছিলাম নিজের মনের কর্তৃত্বে আমি। টিনের সুটকেসে করে বইগুলো দেশে নিয়ে এলাম; খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে পড়লাম; বাইরে বিকেলের আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে কখনো শরৎ কখনো হেমন্তকে দেখেছি: শালিখ ঘাসে-ঘাসে পোকা খুঁটে খেয়েছে, ফড়িং উড়েছে, পাতা খসেছে, দাঁড়কাকের দল গভীর কীর্তির অব্যর্থতায় ঘরের দিকে উড়ে গেছে তাদের, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মতো লাল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।

আমাদের ঘরে উইয়ের অত্যাচার বড় বেশি; মেঝেটা মাটির—বড্ড স্যাঁতসেঁতে; বর্ষাকালে উইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য নানা রকম চেষ্টা চলে বটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নির্জীব নয়—খুব সতেজ ও পরিহাসপ্রিয়। মিশরে যিনি একদিন পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছিলেন, আমাদের কুঁড়েঘরে তিনি উই ছড়িয়ে দিয়ে তামাশা দেখেন। নানা রকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিশের, ছিবড়ে কুড়িয়ে-কুড়িয়ে, তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।

দু-তিনদিন আগে শেল্‌ফের বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখেছি একবার। আজ আরেকবার দেখা যাক, কিন্তু যাই-যাই করে আর যাওয়া হয় না; জানালার ভিতর দিয়ে বর্ষার

দিকে তাকিয়ে মন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দুপুরবেলা দেখলাম বইয়ের তাক ঠিকই আছে, উইয়ে ধরে নি, নতুন বইয়ের লাল-নীল মলাটগুলো কেমন ছাতকুড়োয় শাদা-শাদা হয়ে গেছে।

কল্যাণীকে বললাম—'আমি চলে গেলে এই বইগুলো মাঝে মাঝে দেখো।'

কল্যাণী সেলাই করছিল; কোনো জবাব দিল না। বইগুলো মুছতে-মুছতে—'মাঝে মাঝে রোদে দিও এগুলো।'

কল্যাণী কোনো কথা বললে না।

সে আমার উপর বিরক্ত; দেশে এসে বলেছিলাম ছ-সাত দিন থাকব; থাকতে-থাকতে তিন মাস হয়ে গেল। প্রায় এক মাস থেকে বলছি, চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় আজকালই যাব। কিন্তু আজও গড়িমসি করে দেশের বাড়িতেই কাটাচ্ছি। এত অপরাধ ও বেদনার জন্য তার জীবন প্রস্তুত ছিল না।

সে একটা অস্টিন মোটরকার চায় না বটে, সুসজ্জিত বাংলোও চায় না, আমাকে যখন প্রথম বিয়ে করেছিল, তিন বছর আগে, মানুষের জীবনের নিদারুণ পরিমাপের টের যখন সে পায় নি, তখন কী চাইত জানি না, কিন্তু আজ একজন সামান্য ইস্কুলমাস্টারের গৃহস্থালির ব্যবস্থাও নিজের হাতে যদি সে পায়, জীবনকে ধন্য মনে করে। কিন্তু এমনই ব্যবস্থা, একটা ইস্কুলমাস্টারিও জোটে না। 'আচ্ছা, আমি যদি ট্রাম কন্ডাকটার হই? কী বলো কল্যাণী?'

'টি-সি হবার জন্যই এম-এ পাশ করেছিলে?'

'কিন্তু সেও তো কাজ—মাসে-মাসে ২৫, ২০ কি দেবে না?'

'বেশ তো, তা হলে তাই করো গিয়ে।'

'এবার কলকাতায় গিয়ে যা হয় একটা কিছু করবই।'

কল্যাণী চুপ করে রইল।

'কী করব জানো?'

কোনো সাড়া নেই।

হেমন্তের বিকেলের নিস্তব্ধ ম্লানতার ভিতর একটা রুগ্ণ হাঁসের মতো শুকনো পাতার উড়াউড়ির মধ্যে হংসগামিনী গতিতে একা-একা অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। গলা খাঁকরে—'কী করব, জানো কল্যাণী?'

কল্যাণী আঁতকে উঠে—'বাপরে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এ-রকম। বেটপকা চেঁচিয়ে ওঠো কেন?'

'না, চেঁচাই নি তো'—

'না, না, এ-রকম আচমকা ভয় পাইয়ে দিও না, ইস্, কী রকম ধড়ফড় করছে বুক।'

'এখনো? কী হল?'

'কিচ্ছু না, বাপরে, কী রকম চমকে গিয়েছিলাম।'

'নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে?'

কল্যাণী—'কথা বোলো না, আমাকে একটু চুপ থাকতে দাও; কথা বলতে গেলে হার্টে কষ্ট হয়।'

'বুকে হাত বুলিয়ে দেব?'

'থাক্'

'কাছে আসি?'

'না'

'কেন?'

'আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দাও।'

পাখা নিয়ে এগিয়ে গেলাম—বাতাস দিতেই কল্যাণী—'পাখা রেখে দাও, ঠাণ্ডা লাগে;'

রেখে দিলাম।

'গরম দুধ খাবে?'

'না, দরকার নেই।'

বালিশে খানিকক্ষণ মাথা গুঁজে পড়ে থেকে কল্যাণী—'বাঃ, তুমি আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'দেখছিলাম'

'না, মরতে এখনো দেরি আছে ঢের।'

'মরার কথা নয়।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলে, আমাকে একটু গরম দুধ এনে দাও তো।'

'আচ্ছা দিচ্ছি।'

'কিন্তু এখন দুপুরবেলা সব্বায়ের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে; কোত্থেকে এনে দেবে?'

'কেন খুকির দুধই তো আছে।'

'তা হলে খুকি কী খাবে?'

মাথা হেঁট করে একটু ভেবে, 'বেশ, পিসিমার দুধের থেকে এনে দেব তাহলে।'

'কী করে আনবে?'

চুপ করে ছিলাম।

'পিসিমার কাছে গিয়ে চাইবে?'

ঈষৎ হাসতে চেষ্টা করে—'হ্যাঁ, দরকার হয়েছে, চেয়ে আনব।'

'কেন, আমি কি ভিখিরির মেয়ে যে পরের কাছ থেকে দুধ ভিখ করে ছাড়া খেতে পারব না?'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'এক গ্লাশ দুধ, তা পিসিমা খুশি হয়েই দেবেন।'

কল্যাণী একটা নিশ্বাস ফেলে, 'যাক্ যা কাজ করছিলে তাই করো গিয়ে, দুধ আমার লাগবে না।'

বই মুছতে লাগলাম।

কল্যাণী উঠে বসে, সুচ-সুতো হাতে নিয়ে—'তোমাকে বিশ্বাস নেই।'

'কেন?'

'আধঘণ্টা পরে হয়তো পিসিমার কাছ থেকে দুধ চেয়ে এনে বলবে, বিনয় ভট্টাচার্যের চায়ের দোকান থেকে নিয়ে এলাম।'

একটু থেমে, 'না তা আর বলব না।'

'বিনয় ভট্চাজের চায়ের দোকানে খুব ভালো দুধ পাওয়া যায়?'

মাথা নেড়ে, 'তা পাওয়া যায়।'

'কত করে নেয় এক গ্লাশ?'

'দু আনা'

'ওঃ, দু আনা বুঝি?'

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ; কল্যাণী সেলাই করছিল, আমি বই ঝাড়ছিলাম, মুছছিলাম, পাতা উলটাচ্ছিলাম—কিন্তু দু আনা পয়সার সম্বল আজ আমার কাছে নেই। এবং আমার বয়স চৌত্রিশ, বারো বছর আগে এম-এ পাশ করেছিলাম বটে, বিয়ের আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছি—আরো অনেক কাজ করেছি; কিন্তু সংসার ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের জীবনের পদ্ধতির সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ [ভিন্নতা] ও জটিলতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি আমি। কাজেই এম-এ ডিগ্রি ও স্ত্রী সন্তান সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়সে আজও আমি সংসারী হয়ে উঠতে পারলাম না, আক্ষেপের কথা হয়তো। কিংবা আক্ষেপের কথাই-বা কেন আর? জীবন তো শুধু স্ত্রী-সন্তান নিয়েই নয়।

বিকেলের ধূসরতার ভিতর যখন সবুজ ঘাসের মাঠের পথে হাঁটতে থাকি, কিংবা হেমন্তের সন্ধ্যায় চড়ুই-শালিখ যখন উড়ে চলে গেছে, দিকে-দিকে কুয়াশা জমে ওঠে, লক্ষ্মীপুজোর ধূপের ভিতরেও যখন গন্ধ, কিংবা আরো গভীর রাতে অশ্বত্থের ডালপালা যখন জ্যোৎস্নার বাতাসে ঝিরঝির করে, কত বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার নীড় বুকে নিয়ে বিরাট বটগাছ দাঁড়িয়ে থাকে, বটের নীচে উপকথার পথিক গিয়ে দাঁড়ায়—এক মুহূর্তের ভিতরেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি, এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো-অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।

সংসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন—জীবনের এই আর-এক রূপ। এই রূপের পথে চলতে-চলতে কিশোর বেলার নষ্ট প্রেমের বেদনা ও লাঞ্ছনা ভুলতে চেয়েছিলাম, আজকের সংসারের ক্ষয় ও ক্ষতি নিয়ে আক্ষেপ করব?

অবিশ্যি বাবার কাছে চাইলে দু আনা পয়সা পাওয়া যায়। দু আনা চাইলে তিনি হয়তো চার আনাও দিয়ে দেবেন। আমি মুখ ফুটে বড় একটা চাই না কি-না। সেই জন্য, চাইলেই, তিনি যতদূর সম্ভব দিয়ে দেন। অবিলম্বে অকাতরে আমার কলকাতার খাওয়ার খরচও তিনিই জোগাড় করে দেবেন; তারপর দাদাকে বেরিলিতে লিখে দেবেন আমার কলকাতার মেসের খরচটা কিছু দিন চালাতে—যে পর্যন্ত না আমি ট্যুইশান পাই।

আমি ট্যুইশান পাই বা না পাই, আমি কলকাতায় এলেই দাদা একটা মাস মেসের খরচ দেন; তারপর বন্ধ করে দেন—শত অনুনয়-অনুরোধ করলেও কিছুই গ্রাহ্য করেন না, আমার টিকিটের পয়সা খরচ হয় শুধু; কাজেই অনুরোধ করে চিঠি লিখতে যাই না, এক মাসের টাকা দিয়ে তিন মাস চালাতে চেষ্টা করি—দেশের বাড়িতে খরচ যেন তিনি বন্ধ না করেন, ভবিতব্যের কাছে এই প্রার্থনা করি।

বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন বন্ধ করবেন না, কিন্তু বাবা চলে গেলে পর? জীবন যদি তখনো আমার এই পথে চলে? কিন্তু কেনই-বা চলবে? ভবিষ্যতের জন্য আশা করা যাক। না হয়, চরকায় সুতো কেটে কাপড়ের ব্যবস্থা করব, যেটুকু জমি আছে তাতে লাউ-কুমড়ো-বেগুন-মরিচের গাছ লাগিয়ে দেব; আর চাল? ভাবছিলাম।

কল্যাণী—'খুব বেশি নেয় তো তা হলে?'

'কে বেশি নেয়, কল্যাণী?'

'এক গ্লাশ দুধ দু আনা নেয় বললে—'
'হ্যাঁ'
'বেশ টাটকা দুধ নিশ্চয়ই?'
'হ্যাঁ, খুব'
'তুমি খেয়ে দেখেছ?'
'না খাই নি'
'বিনয় ভট্‌চাযের দোকানে শিগ্‌গির যাও নি বুঝি?'
'না'
'এক কাপ চা খেতেও যাও নি?'
'না, শিগগির গিয়েছি মনে পড়ে না।'
'সত্যি যাও নি? বাপরে, এত তো চায়ের ভক্ত ছিলে। কি, বাড়িতে তো চা পাও না, আমি তো ভাবতাম বিনয় ভট্‌চাযের দোকান থেকে চা খেয়ে আস তুমি।'
'না, মাঝে-মাঝে একটা চুরুট কিনতে যাই'
'চুরুট?'
'হ্যাঁ'
'আর-কিছু না?'
মাথা নাড়লাম—'না'
'চুরুট তো তোমাকে খেতে দেখি না আমি'
'মাসের মধ্যে দু-একটা খাই'
'তাই-বা কখন খাও?'
'খাই রাস্তায়—সন্ধ্যার সময়'
'বেশ লাগে?'
'মন্দ কী।'
'কিন্তু দুধ খেও'
'কে? আমি?'
'হ্যাঁ'
'কেন বলো তো?'
কল্যাণী কোনো জবাব দিল না।
একটু চুপ করে বললে, 'আধ গ্লাশ দুধ চার পয়সায় দেবে?'
'তা দিতে পারে, দর কষাকষি করতে হবে।' আরো খানিকক্ষণ ভেবে কল্যাণী, 'তা হলে নিয়ে এসো তো'। অত্যন্ত জড়োসড়োভাবে, যথেষ্ট সময় খরচ করে, আঁচলের গাঁটের থেকে একটা এক আনি বের করলে, দেখলাম, খানিকটা তেলা—
আরো কিছু খুচরো পয়সা বেচারির গাঁটে ছিল, কিন্তু এক আনিটা বদল করবার ভরসা পেলাম না। না হয় চার পয়সার বাকি দুধ বিনয়ের কাছ থেকে আনা যাবে।
তাই আনলাম।
কিন্তু দুধ নিয়ে হাজির হয়ে দেখি, আর-এক সমস্যা; সে কিছুতেই খাবে না, খেতে হবে আমাকে।
বললে, 'তুমি কী বেকুব! তোমাকে দুধ খাবার জন্য চারটে পয়সা দিলাম আমি, হাত-পা রোগা বকের মতো হয়ে যাচ্ছে, কোথায় দোকানে বসে খেয়ে আসবে, না,

সেই দুধ তুমি এতটা পথ বয়ে আনলে আমার জন্য।'

বিক্ষুব্ধ ঝাঁঝে আমার দিকে আপাদমস্তক তাকাতে লাগল সে।

'কই, তুমি তো একবারও বলো নি কল্যাণী?'

'কী বলি নি।'

'যখন পয়সা দিলে, বলো নি তো যে—'

কিন্তু খোঁচা দিয়ে ভুল দেখিয়ে এই নারীটিকে পরাস্ত করে কী লাভ?

বাদলের দুপুরে এক-একটা নিরাশ্রয় দাঁড়কাক আমাদের উঠোনের পেয়ারার ডালে বসে ভিজতে থাকে, তাকে দান করতে হয়, কেউ কোনোদিন তার কাছ থেকে গ্রহণ করবার কথা ভাবতে পারে কি?

'আমি এক কাপ চা খেয়ে এসেছি; আর একটা চুরুট।'

'কে? তুমি? দুধ খেলে না কেন? দুধের জন্যই তো পয়সা দেওয়া। তোমার শরীরের দিকে তাকিয়ে দুঃখ হয়। বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে এলে, সব করলে, তবু আমার কথাটা শুনলে না।'

'দুধ তোমার জুড়িয়ে যাচ্ছে, বক-বক বক-বক বক-বক কথাবার্তা পরে হবে।

—আগে খেয়ে নাও।'

গ্লাশটা তার হাতে দিলাম।

'বাঃ, এই গ্লাশটা কার?'

'বিনয়ের'

'বেশ সুন্দর কাচের গ্লাশ তো'

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি খাও।'

চুপ করে বই পড়ছিলাম।

কল্যাণী, 'তুমি নাকি আবার চা খেয়ে এসেছ, চুরুটও?'

গেলাশটা সে ঠোঁট অব্দি তুললে, 'কই কথার উত্তর দাও না যে?'

'কোন কথা?'

'চা-চুরুট খেয়ে পেট ভরিয়ে আস নি?'

'হ্যাঁ'

'তা যদি না-ভরতে তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে দুধ খেতে হত।'

'তা, তোমার পাল্লায় পড়লে'

'আমি কি আমার জন্য আনিয়েছি, এটা তুমি বুঝলে না?'

তাকিয়ে দেখি দুধ তখনো অভুক্ত।

কাজেই, রামেশ্বরের ছেঁড়া ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—আমি চলে না গেলে এ বেচারির দুধ আর খাওয়া হবে না।

কল্যাণী—'কোথায় যাচ্ছ?'

'রমণীবাবুর বাড়ি'

'কেন?'

'একটা বই নিয়ে গিয়েছিলেন।'

মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে দেখি দুধের গ্লাশ যেমনি, তেমনি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'এখনো খাও নি?'

'নাঃ'

'কেন?'

'ভক্তি হচ্ছে না খেতে'

'কিসের জন্য কল্যাণী? দোকানের দুধ বলে? দাও আমি খেয়ে ফেলি'

হাত বাড়াতেই দুধের গ্লাশটা সরিয়ে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে কল্যাণী, মিনমিন করে হেসে 'ইস্ দোকানের জিনিশ আমি খাই না বুঝি?'

আমার দিকে তাকিয়ে কল্যাণী একটু লজ্জিত হয়ে—'ছি, খেতে চেয়েছিলে—বাধা দিলাম, এই নাও—'

ফিরে চেয়ে দেখলাম সে দুধের দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে আমার দিকে গ্লাশ এগিয়ে দিচ্ছে, হাতভরা তার অনিচ্ছা ও অনগ্রসরের অসাড়তা; মুখখানা হেমন্তের সন্ধ্যার মতো হিম, বেদনাতুর; মৃত সন্তানের মুখের উপর নিবদ্ধ মৃতবৎসা হরিণীর মতো বিহ্বল বিষণ্ণ চোখ।

উটের লোম দিয়ে যে-ব্রাশ তৈরি হয়, যার সঙ্গে রং মাখিয়ে মানুষ ছবি আঁকে, সেই ব্রাশই-বা কোথায়? রংই-বা কোথায়? ছবি আঁকবার শক্তিই-বা কোথায়? [রং-তুলি] নিয়ে একবার যে ছবি এঁকেছিল আজ এই কল্যাণীর ছবি এঁকে যাক্—

'না, খাও'

'কে? আমি খাব?'

আমার স্বরের ভিতর তৃষ্ণা ও আগ্রহের পরিচয় পেয়ে গ্লাশটা সে নিজের দিকে সরিয়ে নিল—

'দুধ কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, কল্যাণী'

'বেশ, গরম করে নিয়ে এলেই হবে?'

'কে গরম করবে?'

'আমিই করে আনব'

'তারপর খাবে কে?'

'কেন? তুমি খেতে চাও নাকি?'

একটা বই তুলে নিয়ে, একটু দূরে সরে যেতেই কল্যাণী গ্লাশটা নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল।

'খাবে, খাও'

'দাও'

'আচ্ছা, একটু গরম করে নিয়ে আসি'

'আনো'

'তা, এই বেশ গরম আছে'

'তবে এই-ই দাও'

'একটু চিনি মিশিয়ে দেব?'

'তা দিতে পারো'

'চিনি হয়তো ওরা দিয়ে দিয়েছে'

'তা দিয়ে থাকবে'

'খাবে?'

'দিলেই খাই'

'কেন? তুমি কি মনে কর একটু দুধের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে বঞ্চনা করব?'

'না, সে কথা কে ভাবে কল্যাণী।'

'তুমি কী পড়ছ?'

'একটা বই'

'দুধটা মিষ্টি'

'ও, খাচ্ছ বুঝি?'

তাকিয়ে দেখলাম সে লজ্জিত হয়ে আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম—'কী হল?'

'ভুলে চুমুক দিয়ে ফেললাম যে'

'বেশ করেছ।'

'এখন কী হবে?'

'কেন?'

'তুমি যে আর খেতে পারবে না।'

'তা, আমার খেতে আপত্তি নেই।'

'ছি, আমার মুখেরটা খাবে?'

'তা আমি খেতে পারি'

'কিন্তু আমি কিছুতেই সে অনাচার হতে দিতে পারি না তো।'

আধ ঘণ্টা পরে তাকিয়ে দেখলাম দুধের শূন্য গ্লাশটা পড়ে আছে, কল্যাণী নেই, ঘুমুচ্ছে হয়তো।

গেলাশটা ধুয়ে নিয়ে ফিরিয়ে দেবার জন্য বিনয়ের দোকানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে কল্যাণীর কথাই ভাবছিলাম। এই কল্যাণী আমার স্ত্রী, তিন বছর আগে আমি বিয়ে করেছি তাকে, কিন্তু এ তিন বছরের ভিতর প্রেমিকের পুলক একদিনও বোধ করেছি? নির্বিকার নিঃসঙ্কোচে আত্মদান অনুভব করেছে কল্যাণী? ইস্‌, গ্লাশটা হাতের থেকে পড়ে ভেঙে গেল। কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে-কুড়োতে কল্যাণীর কথাই ভাবছিলাম আবার।

আমাদের রক্তমাংসের সার্থকতা খাবার সময়, দাঁড়াবার সময়, হাঁটবার-চলবার সময়। আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার সার্থকতা মানুষের সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে কিংবা সন্ধ্যা ও ভোরের আকাশ প্রান্তরের নিরবয়ব, অবাস্তবতার দিকে তাকিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের রক্ত-মাংস বুদ্ধি-কল্পনা আত্মা-প্রেম কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সব জায়গাতেই কি এই রকম?

জানি না।

এই চৌত্রিশ বছরে অনেক চিঠি জমিয়েছি; একটা মস্ত বড় টিনের বাক্সে চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিলাম। চিরদিনেই মনে করে এসেছি যে ভবিষ্যতে কোনো এক দিন এই চিঠিগুলো একে-একে পড়ব।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোনো এক বিস্তৃত প্রান্তরে আমার বাংলো তৈরি করব।

চারদিকে বাবলাগাছের ঘন নিবিড় বেড়া দিয়ে মাঠটাকে রাখব ঘিরে। কিংবা বুনো কাঠ দিয়ে; ছোটখাটো নানা ঝুমকোলতা, কুঞ্জলতা ও অপরাজিতার আলিঙ্গনে আলো-বাতাস কাক-শালিখ ও পাখ-পাখালির সাড়া-শব্দে নিতান্তই বাঙালির ঘরোয়া জিনিশ, পাশে হয়তো মেঘনা, ধানসিঁড়ি, জলসিঁড়ি, কর্ণফুলি, অথবা ইছামতী; মাঠের ভিতর ইতস্তত অশ্বত্থগাছ, বাঁশের জঙ্গল, আম-কাঁঠাল, বেতের বন, কাশ,

কালসোনা ঘাস, ফড়িং, প্রজাপতি, চোত-বোশেখের দুপুর, শরতের রাত, হেমন্তের বিকাল, অপার্থিব বট।

এমনি আবহাওয়ার ভিতর ঘরের বারান্দায় হরিণের ছাল পেতে বসে কিংবা অন্ধকার রাতে আলোর পাশে একটা মাদুর বিছিয়ে নিয়ে একে-একে চিঠিগুলো পড়ব; এইরকম ভেবেছিলাম আমি। নির্মলার চিঠি আছে, মা-র অনেকগুলো চিঠি, দাদার চিঠি, তাছাড়া আরো নানারকম ঘটনাস্রোতের বুক থেকে জড়ো করা ঢের। দু-পাঁচজন নারীর উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ও ক্বচিৎ বিহ্বলতার চিঠি আছে। দু-তিনটি দেশপ্রেমিকের চিঠি আছে, লিখে সাহিত্যে নাম করেছে যারা কিংবা আজও সন্ত্রাস করে চলেছে, তারাও আমাকে তাদের মধ্যে একজন ভেবে চিঠি লিখত। সবই সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছি—জীবনের ভাঁটার সময় একদিন ম্লান আলোর পাশে এগুলো পড়ব বলে।

তাও বিশ বছর ধরে এগুলো জমিয়েছি; পোকা, ইঁদুর ও উইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছি।

মা অনেকবার বলেছেন এই চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতে, এই চিঠি বোঝাই বাক্সটা কল্যাণীর চক্ষুশূল; আমি নিজেও, মাঝে-মাঝে ভেবেছি, মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিশ হচ্ছে তার হৃদয়। সঞ্চয় যদি কিছু করতে হয় তবে সেখানে করা ভালো। টিনের বাক্সের ভিতর কেন? কিন্তু তবুও টিনের বাক্সটা অনেক ঝড় কাটিয়ে টিকে রয়েছে আজও। বাক্সের ভিতর আমার নিজের লেখা কয়েকখানা খাতাও ছিল।

বিনয়কে গেলাশটা ফিরিয়ে দিয়ে এসে বাক্সটা খুললাম।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের ভিতরেই মনে হল, কেরোসিন তেল ও দেশলাই ছাড়া আর উপায় নেই।

আচ্ছা মাধুরীর কি একখানা চিঠিও আস্ত আছে? বিহ্বলভাবে অজস্র চিঠির ছিবড়ের ভিতর খুঁজছিলাম, মাধুরীর চিঠি, মাধুরীর চিঠি। আঙুলে উইয়ের কামড় লাগছে—কাদা মাটি ও গলিত উইয়ের রসে হাত যাচ্ছে ভরে, কিন্তু সেই চোদ্দ পাতা, আঠারো পাতা—এক-একখানা চিঠির একটু যদি থাকে।

অবশ্য আঠারো পাতা ভরে সে আমার প্রতি তার উপেক্ষাই প্রমাণ করত। সে ইস্কুলের কলেজের কথা লিখত, বইয়ের কথা লিখত, তার দিদির ছেলে-মেয়ের কথা লিখত, গরম চা খেতে গিয়ে কী রকম করে তার জিভ পুড়ে গেছে, পিসিমা তার কেমন চমৎকার লেবুর আচার তৈরি করতে পারেন, কাসুন্দি খেতে তার কত ভালো লাগে, কলকাতায় কী রকম গরম পড়েছে, কলেজের বাস কী রকম ঢিকুর ঢিকুর করে চলে, তাদের বাড়িতে রোজ দুটো-একটা করে ইঁদুর মরছে, কে জানে বেড়ালে মারে, না, প্লেগ হবে, তাদের গরুটা আজকাল চার-সের করে দুধ দেয়, রাস্তার ওপারে ডাস্টবিনের থেকে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ আসে, সেইজন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে লেখা হয়েছে, গ্রামোফোনের অনেকগুলো নতুন রেকর্ড কেনা হয়েছে, কলকাতা এবার বৃষ্টিতে তলিয়ে গেল—এই সব।

অনেক চিঠি লিখত মাধুরী, অনেক কথাও লিখত কিন্তু রক্ত-কাঁকরের পথের বুকে যেমন জল পাওয়া যায় না, এই চিঠিগুলোর ভিতরেও তেমনি কোনো দরদ কোনোদিন আবিষ্কার করতে পারি নি। আছে এগুলোর ভিতর একজন সামান্য নারীর অবৈধ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অসংখ্য বানান ভুল। কিন্তু তবুও এই মেয়েটি আমার জীবনকে

করেছিল কী ভীষণ দুরতিক্রম্য। এই নারীটি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল বলেই বৈষ্ণব কবিতা, কিশোরী প্রেম ও অনেক বিদেশী সাহিত্যের অন্ধকার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার কাছে অপরূপ হয়ে আছে। রূপ ও প্রেমের বেদনা, পাপ ও অভূতপূর্বতা বুঝতে পেরেছি।

পড়তে-পড়তে নির্মলার [?] কয়েকটা ছবি চোখে পড়ল। নির্মলা নিজেও অনেকদিন হয় মারা গেছে; কিন্তু বিধাতা তার কয়েকখানা চিঠি অন্তত আমার কাছে রাখলে পারতেন।

অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে। সে দশ বছর আগের কথা। পাঁচ বছর ধরে সে আমাকে চিঠি লিখেছে; কখনো দেরাদুন থেকে, কখনো পাহাড় থেকে, কুমায়ুনের থেকে, লক্ষ্ণৌ থেকে, বিলাসপুরের থেকে, রামেশ্বরের সেতুবন্ধের থেকে, চিংল্লিপট্টমের থেকে, ত্রিচিনপল্লির থেকে অনুরাধাপুরের থেকে—পায়ে হেঁটে-হেঁটে ভারতবর্ষ বেড়াচ্ছে সে; একবার ধর্মপুরের থেকে লিখেছিল যে যক্ষ্মায় ভুগে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

তারপর আর-কোনো চিঠি পাই নি।

অনেক আগে, ধর্মপুর থেকে তার চিঠি পাবার বছর দুই আগে, গোলদিঘিতে একদিন অবিনাশের সাথে দেখা হয়েছিল। সেও এমনি শ্রাবণ মাস—গিরিমাটির মতো অজস্র মেঘে আকাশ ছিল ভরে—কতকগুলো ধুমসো কালো মেঘ পঙ্গপালের মতো ইতস্তত ওড়াউড়ি করছিল; দিনের আলো যাচ্ছিল নিভে; দাঁড়কাকগুলো আকাশের গায়ে-গায়ে ইতস্তত মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঘোলা সরবতের মত মেঘের এক খণ্ডে বরফের দানার মতো সপ্তমীর চাঁদ বিকেল শেষ না-হতেই হাজির—তার নীচে আসন্ন সন্ধ্যার অজস্র কালো বাদুড়ের দল।

হাঁটছিলাম—হঠাৎ দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণের থেকে কে যেন আমাকে ডাকল; আবছায়ার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম একটা মিলিটারি খাকির শার্ট পরে অশ্বত্থ গাছের নীচের বেঞ্চিতে অবিনাশ বসে আছে।

সেদিন সারারাত ভরে মেঘের....কিন্তু মন.....

অনেক রাতে আমরা স্কোয়ারের বেঞ্চি ছেড়ে ফুটপাথে নামলাম। হাঁটতে-হাঁটতে একবার আমহার্স্ট স্ট্রিট, করিম চার্চ লেন—আর-একবার মনুমেন্ট, সেন্ট জনের গির্জা—এমনি করে সারাটা রাত কাটালাম।

কী-ই বা করবার ছিল আর?

জীবন তখন একটা সমস্যার জিনিশ, প্রেমের বেদনা ও জর্জরতার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু বিচ্ছেদ ও প্রণয়ের গন্ধও যে জীবন থেকে একদিন নিঃশেষে কেটে যায়! বঞ্চিত হলেও বেদনা থাকে না আর। উত্তরজীবনে মানুষের দুঃখ যে-অন্নকষ্ট নিয়ে, নারীকে নিয়ে একেবারেই নয়, সে আশ্বাস তখনো পাই নি। তাই সারা রাত অবিনাশ কবিতা আওড়াল, চুরুট টানল, অসংলগ্ন কথা বলল, একবার নক্ষত্রের মতো অমানুষিক দীপ্তির, একবার ছাগলের মতো আকণ্ঠমজ্জিত লালসার পরিচয় দিতে লাগল।

অবাক হয়ে ভাবি, অবিনাশ আজ কোথায়? ধর্মপুরের স্যানোটোরিয়ামে সে আজ আর নেই, হয়তো আমার মতো নির্বিবাদ, নির্জীব গৃহস্থ হয়েছে কিংবা মাটির তলে হাড় পচছে হয়তো তার।

অবিনাশের বড়-বড় চিঠিগুলো একবার পড়েই রেখে দিতাম, কোনো এক দূর

ভবিষ্যতে এগুলো সরস নবীন জিনিশের মতো আবার আগ্রহে খুলে পড়ব বলে; চিংলিপট্টম ও মাদুরার কয়েকটা দিন কয়েকটা চিঠিতে খুব বিশদভাবে গাঁথা ছিল; অনুরাধাপুরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনখানা চিঠি ছিল।

বারান্দায় হরিণের ছাল পেতে, কিংবা অন্ধকার রাতে প্রদীপের আলোর কাছে মাদুর বিছিয়ে এ সব চিঠি কোনোদিনও পড়তে পারব না, আমি আর। চিঠিগুলো উইয়ের পেটের ভেতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তান-সন্ততির কাজে লাগছে।

কিন্তু একটা পচা হোগলার বেড়া দিয়েও তো এই কাজ হত, কিংবা গর্ভস্রাবের রক্তমাখানো রাবিশ ন্যাকড়া দিয়ে? আমার এই বিশ বছরের সঞ্চয়ের উপর হাত দেবার কী দরকার ছিল?

কিন্তু কাকে আমি প্রশ্ন করি? এই অন্ধ পোকাগুলোকে? আমার অবসন্ন হৃদয়কে? জীবনের দিন-রাত্রির নিঃশব্দ সঞ্চারকে?

যে-খাতাগুলোতে নতুন কতকগুলো কবিতা লিখে রেখেছিলাম—তাও নষ্ট হয়ে গেছে।

এ কবিতাগুলো কাউকে দেখাই নি। অনেকক্ষণ সময় কেটে যায়। অবাক হয়ে ভাবি জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিশ হচ্ছে নিজেকে স্থির রাখা। ভাবতে-ভাবতে অনেক মুহূর্ত কেটে যায়, এক সময় নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করি এই ভেবে যে আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরি যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন এমন অনেক অনেক চিন্তা ও কল্পনার সম্ভার ধোঁয়ায় মিশে গেছে যার তুলনায় আমার এ কবিতাগুলো কিছুই নয়।

শেষ পর্যন্ত শেক্সপিয়রের সমস্ত কাব্যও তো একদিন বরফের নীচে ধসে যাবে।

পৃথিবীতে একটি মানুষও থাকবে না।

কিন্তু তবুও থেকে-থেকে মনে হয় আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরির সমস্ত লুপ্ত ঐশ্বর্যের চেয়েও আমার কবিতাগুলোর ইঙ্গিত ও মূল্য ঢের চমৎকার ছিল, শেক্সপিয়র যা দিতে পারে নি—তাই তো দিয়েছিলাম আমি।

মেজকাকা এসে বললেন, 'উইয়ে খেয়ে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ'

'সার্টিফিকেট বুঝি?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ'

'কার সার্টিফিকেট ছিল?'

'বর্ধমানের মহারাজার'

'হুঁ, তা হলে চাকরি পেলে না যে বড়?'

চুপ করে ছিলাম।

মেজকাকা—'সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন বটে আমাকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই। আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সে আজ প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগের কথা। সেই সার্টিফিকেট নিয়ে আমি কে-এস শেঠ-এর কাছে যাই। আবগারি ডিপার্টমেন্টে চাকরি আদায় করে নেই।'

'তা শাস্ত্রীমশাই শুনে কী বললেন, হয়তো অপেক্ষা করেছিলেন? সাব ইনস্‌পেক্টর হয়ে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ ফাল হয়ে বেরোলাম ইনস্পেক্টর।'

গলা খাঁকরে মেজকাকা—'ব্রাহ্ম সমাজের সাধনাশ্রমের সঙ্গে খুব যোগ [?] ছিল এক সময় আমার—'

'ছিল বুঝি?'

'ভেবেছিলাম জীবনটা ওইখানেই কাটিয়ে দি, কিন্তু', শাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মানুষের জীবনের কত রূপান্তর হয়, ভাবছিলাম এই সমাজের বেদিতে চড়ি-চড়ি বুঝি, কিন্তু বছর দুয়ের মধ্যেই আবগারির মোটা তলব।'

'শক্তি যেখানে যায়, সেখানেই কাজে লাগে।'

'তা বইকি, তোমার বাবারই তো শুধু কিছু হল না। চিরটা জীবন ইস্কুল মাস্টারি করে কাটালেন; শক্তি আমাদের কারো চাইতে কম ছিল কি তাঁর?'

গলা খাঁকরে মেজকাকা—'এই তো তিনদিন হল তোমাদের এখানে এসেছি, পরশুই আবার কলকাতায় চলে যাব।'

'পরশুই যাবেন?'

'জরুর, যতবার এখানে আসি, দেখি, কী দুরবস্থার ভিতরেই তোমরা আছ। বাহাত্তর বছর বয়সে দাদা কাদা-বৃষ্টি ভেঙে এখনো হেঁটে এক মাইল দূরের ইস্কুলে যান, তোমার মা চাকরানীর মতো খাটে—তোমার চাকরি নেই—বৌমার কষ্ট; নিজেকেও ধিক্কার দি এই ভেবে যে তোমাদের কোনোদিন একটি পয়সা সাহায্য করতে পারলাম না। যতদিন সার্ভিসে ছিলাম মেরে-কেটে কিছু সাহায্য করলেও করতে পারতাম। সেই বড় ভুল হয়ে গেছে, কিছু দেওয়া-থোওয়া উচিত ছিল দাদাকে তখন। কিন্তু এখন পেনশন খাচ্ছি, কোনো উপায় নেই তো।'

'আপনার কত পেনশন মেজকাকা?'

'পেনশন আর-কী?'

দেশলাইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম।

মেজকাকা—'আমাদের খোঁজখবর তোমরা কিছুই রাখো না দেখছি।'

ঈষৎ হেসে কাকার দিকে তাকালাম।

'কত পেনশন তাও জিজ্ঞেস করলে? জানো না কী নিদারুণ টানাটানির ভেতর আছি।'

বলে খাকির হাফ প্যান্টের ভিতর দু হাত চালিয়ে দিয়ে, 'এক জোড়া জুতো কিনতে পারছি না।'

'কেন?'

'পায়ে লাগে। দাদা যখন কলেজে পড়তেন তখনো, এখনো, নিউ কাট [?] কিন্তু আমার অক্সফোর্ড না হলে চলে না', একটা হাত তুলে বললেন।

'জুতোর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোল কী রকম হওয়া চাই জানো?'

'কী রকম?'

'ম্যাক্সিমাম ওয়েট সোল', বলে, বিস্ফারিত পরিতৃপ্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন কাকা।

বললাম—'বেশ।'

খুব অস্বস্তির সঙ্গে—'মেজকাকা, ক-দিন টেকে?'

'সে অনেক দিন, সঙ্গে কতকগুলো চীনে বাজারের জুতো রাখতে হয়। আমি যখন যে স্থলে বেরুই এই জুতো নিয়ে বেরুই। এই তো, যে-জুতোজোড়া পরেছি এ তো অক্সফোর্ড নয়, চিনেম্যানের তৈরি।'

'খুব চরিতার্থতায় দিন কাটছে আপনার।'

'আমার?' ঈষৎ ভ্রূকুটি করে মেজকাকা বললেন, 'কেটে যাচ্ছে এক রকম।

'অদৃষ্টের দোষ দেই না। কাউকেই গালিগালাজ করবার প্রবৃত্তি হয় না।'

'কেন দেবেন? সবাই আপনাকে দুহাত ভরে দিয়েছেন।'

'না, দুহাত ভরে দেন নি অবিশ্যি। তবে নেমকের চামচের এক চামচে দিয়েছেন বটে।'

হাসছিলাম।

মেজকাকা—'যে যা-দিয়েছেন, সে কৃতজ্ঞতা সব সময় স্বীকার করো। তোমরা তো এখানে সকাল বেলা মুড়ি খাও। যে-চালের ভাত খাও আমাদের ওখানে চাকর খানশামাও তা খায় না।'

'আপনার জন্য তো বাবা কয়েক সের দাদখানি চাল এনে রেখেছেন।'

'তা এনেছেন বটে; আমাকে দাদখানিই দেওয়া হয়, না হলে আমার অম্বল হয়। বউঠানও খুব রেঁধে-বেড়ে খাওয়াচ্ছেন আমাকে। কিন্তু এ হল আমার জন্য তোমাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তোমরা নিজেরা বারোমাস যা-খাও তা দেখলে আমাদের ছক্কুর অব্দি চক্ষুস্থির হত।'

'ছক্কু কে?'

'আমাদের বয়; বিহারে বাড়ি, ছাপরা জেলায়, সেখানেও সে তোমাদের চেয়ে ভালো খায়।'

একটু চুপ থেকে—'সাধনাশ্রমে কেমন খাওয়া হত?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কাকা—'মুড়ি যে আমি না খাই তা নয়, মাঝে-মাঝে খেতে ভালোও লাগে—কিন্তু এই যে সকালবেলা উঠে তোমরা ডাস্ট দিয়ে চা আর মুড়ি নিয়ে বোসো, দেখে আমার বড় দুঃখ করে। আমার ওখানে ভালো দার্জিলিং চা কিংবা লিপটনের কফি, রোল, মাখন, ডিম এই তো ব্যবস্থা—' একটু চুপ থেকে, 'তারপর নটার সময় আসে', তাকিয়ে দেখলাম, চোখ পরিতৃপ্তি ও আত্মমর্যাদায় ভরে উঠেছে, বললেন, 'তারপর এগারোটার সময় সবচেয়ে টাটকা মাছ-মাংস, ডাল-তরকারি, ভাজ্জি, চাটনি। দাদার মতো মিছিমিছি জীবনটাকে বঞ্চিত করে কী লাভ।'

'না, কোনো লাভ নেই।'

'একটা কষ্ট। খেয়ে-খেয়ে আমার গাউট হয়েছে'

একটু চুপ থেকে, 'বৌমাকে তুমি একটু বলো তো—'

'কী?'

'এই রাত্রের দিকে আমার পায়ে একটু লিনিমেন্ট ঘষে দেয়'

'আচ্ছা।'

'কলকাতায় দিত ছক্কু মালিশ করে। কিন্তু এখানে তো তোমাদের কোনো চাকর-বাকর নেই?'

'না, চাকর আর রাখা হয় নি।'

'ভালোই করেছ! চাকর পুষতে আমার মাসে নিট পঞ্চাশটি টাকা খরচ হয়ে যায়। অথচ নেমকহারামের ধাড়ি সব, ও-পাপ রাখতে হয় না, তাছাড়া দাদার যা ইনকাম, চাকর-বাকর রেখে মুখে রক্ত উঠে বুড়ো বয়সে মরবে এ-মানুষটা।'

'আমিও দিতে পারি আপনার পায়ে মালিশ করে।'

'আচ্ছা, তুমি কেন দেবে? বউমা থাকতে—সেটা কি ভালো দেখায়? বউমার যদি কোনো আপত্তি থাকে—'

'না, আপত্তি কিছু নেই।'

'হয়তো লজ্জা করতে পারে—নিজের শ্বশুরকে যেমনটি দেখে আমাকে তেমনটি নাও মনে করতে পারে হয়তো।'

'কেন মনে করবে না? আপনি বাবার সহোদর ভাই।'

'আহা, এদের মনের মধ্যে কোথায় কী যে খোঁচ আমরা কি তা বুঝতে পারি?' গম্ভীর করে, 'নিজের স্ত্রীকেও কি ছাই আমি ভালো করে চিনি?'

'আমিই তাহলে মালিশ করে দেব মেজকাকা।'

'তাই দিও। বউমার নাম যে মুখে এনেছিলাম—বলো তো তোমার বাবার কাছে গিয়ে খৎ দিয়ে আসি।'

'গাউট হয়েছে আপনার কত দিন থেকে?'

'ডিম-মাংসের পরিণাম আর কী? তবে বাড়াবাড়ি হয়েছে দু-তিন বছর ধরে।'

'মাংস-ডিম খান এখনো?'

'খুব কম খাই। তবুও ভগবানের আশীর্বাদ বলতে হবে এপেন্ডিসাইটিস হয় নি, স্টোন হয় নি, গলস্টোন হয় নি, ব্লাডপ্রেসার হয় নি, গাউটের উপর দিয়ে আপদ গেছে সব।'

'শুনলাম, সেজকাকার নাকি ব্লাড প্রেসার হয়েছে?'

'কার? রমেশের? তা তুমি আজ শুনলে? গত বছর তো মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

'জানো না? বাপের ভায়েদেরও খবর রাখো না?' একটা হাত তুলে মেজকাকা—'তোমাদেরই বা বলব কী? দাদাই কি খোঁজখবর রাখেন আমাদের?

কোলের থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে মেজকাকা—'বিধাতার কৃপায় আমি তিনশো-চারশো টাকা পেনশান পাচ্ছি। কাঁচা টাকায় অনেক ঝাল মিটে যায় কিন্তু তবুও আমাদের মনেপ্রাণে কি কোনো বেদনা থাকতে পারে না? যাক্, ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন, বিচারও করবেন তিনিই। বারোশো টাকা মাইনে পেয়ে ডিম-মাংস, হ্যাম, বেকন, কোকোজ্যামের পিণ্ডি চটকে জীবন কাটিয়ে দিল রমেশ। রেস খেলে, বছর-বছর একটা ব্যবসা, দিন-রাত সিগারেট আর ইংরেজি বই, ব্লাডপ্রেসারের কী দোষ?

'পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়ে এই সব বই পড়েন সেজকাকা?'

একটু আশ্চর্য হয়ে মেজকাকার দিকে তাকালাম।

'ওপেন হাইম, এডগার ওয়ালেস এই সব। অবসর পেলেই দিন-রাত এই সব নিয়ে পড়ে থাকে।'

'ওঃ এইগুলো?'

'এইগুলো অত্যন্ত ম্লেচ্ছ বই।'

'সময় কাটে মন্দ না।'

'চণ্ডাল দিয়ে এই সব বই পোড়াতে হয়।'

'কেন?'

'মানুষকে অন্তঃসারশূন্য করে ছাড়ে,' ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে মেজকাকা, 'সব সময় একটা নিষ্ঠাহীন চঞ্চলতা। রমেশের হয়েছেও তাই। মানুষের জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে আলোচনা করবার মতো না-আছে রুচি, না-আছে শক্তি—ভগবানকে নিয়ে রোজ দু দণ্ড বসবার মতো অবসর সে খুঁজে পায় না। একখানা ভালো বই হাতে দিলে হাঁপিয়ে ওঠে। পা ছড়িয়ে দিনরাত ক্রাইম নভেল আর সেক্স নভেল নিয়ে।'

'ক্রাইম নভেল অবশ্য আমি পড়তে পারি না।'

'শয়তান ছাড়া কেউ পারে না।'

'কিন্তু সেক্স নভেল পড়েছি ঢের।'

'আর পোড়ো না; তার চেয়ে বরং হকিং পড়ো'

'হকিং?'

'হ্যাঁ আর হাচিংসনের। অবিশ্যি এ সব বই কোনোদিন পড়ব না আমি; পড়লে না-হয় রাস্কিন পড়ব আর-একবার, কিংবা টলস্টয় অথবা—।'

মেজকাকাকে বললাম, 'নভেল পড়ে সেজকাকা ইংরেজি লিখতে শিখেছে বেশ।'

'হুম্, সাহেবদের সঙ্গে দুটো ইংরেজি বলতে পারে না।'

'পারে না?'

'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে।'

'তা হলে এত উন্নতি হল কী করে? সামান্য পোস্ট থেকে একেবারে গ্রেড?'

'আমড়াগাছি। খোশামুদি। তা ছাড়া আবার কী? পায়ে তেল মেখে-মেখে। আহা পকেটে ওর সব সময়েই তেল। রমেশের জন্য তেল জোগাড় করতে গিয়ে বি-ও-সি সাবাড় হয়ে গেল।'

হাসছিলাম।

মেজকাকা—'অত আমড়াগাছি যদি আমাকে দিয়ে করাতেন ভগবান, তা হলে সাঁ করে কমিশনার হয়ে যেতাম। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে হত না আর।'

গলার আওয়াজের ভিতর যেমন বিষ, তেমন ঈর্ষা। তেমনি ক্ষোভ ও যন্ত্রণা।

ছটফট করতে-করতে মেজকাকা—'বারোশো তলব মারলেই যদি মানুষ ভালো ইংরেজি বলতে পারত তা হলে সুরেন বাঁড়ুয্যে আনন্দমোহন বোসকে অত কষ্ট করে ইংরেজি শিখতে হত না। একটা দারোগার কাজ নিলেই ল্যাটা চুকে যেত। টেন্স-এর জ্ঞান নেই।'

'কার?'

'রমেশের। একটা থার্ড ক্লাস-এর ছেলেও তো বোঝে যে যদি পাস্ট টেন্স...'

কিন্তু চুপ করে গেলেন মেজকাকা। গ্রামারের অনাবশ্যক আলোচনার কোনো দরকার বোধ করলেন না।

গলা খাঁকরে, 'আই-সি-এস-এর কাছে মেয়ের বিয়ে দিয়েই দেমাক বেড়েছে রমেশের। তোমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করে? একখানা চিঠি লিখে শুধোয়? একটা

পয়সা পাঠায়? দাদা চিরটাকাল ভেক ধরেই গেলেন—যেন নামাবলি গায়ে বৈরেগি ঠাকুর; রক্ত নেই আঁচ নেই, যেন ঠাণ্ডা শালগ্রামটি। তা না হলে রমেশের এত বাড় বাড়ে? বারোশো টাকা মাইনে পায়, ছশো টাকা দাদাকে পাঠাতে পারে না?'

'আমার মেয়ে বি-এ পাশ করে টিচারি করছে, বিয়ে করছে না। মদ-গরু-খাওয়া সিভিলিয়ানদের সঙ্গে বিয়ে দেব তাই বলে? রমেশটা তো দিল।'

সন্ধ্যার সময় মেজকাকার পায় লিনিমেন্ট মালিশ করে দিচ্ছিলাম। বললেন, 'মালতীর জন্য একটা ছেলে দেখে দিতে পার? নিতান্ত সারকেল অফিসার, সাব ডেপুটি যেন না হয়। করে খেতে পারে যেন, অন্তত ডেপুটি অ্যাসিসটেন্ট।' খানিকক্ষণ অশোভন নিস্তব্ধতার পর মেজকাকার একটা ব্যথিত দীর্ঘনিশ্বাস।

'মালতী অবিশ্যি নিতান্তই শাদাসিধে মেয়ে। চেহারায় চরিত্রেও।'

'তাহলে এদের একজনকেই বিয়ে করুক না কেন।'

'তা হয়তো করবে না।'

'কেন?'

'একটু স্বদেশীর অভিমান আছে কিনা আমার মেয়ের। মাঝে-মাঝে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়।'

'সে তো বেশ ভালো কথা।'

'কিন্তু বর পেলে বিয়ে করতে পারে। ধরো, বিলেত-ফিরেত আই-সি-এস যদি ওকে বিয়ে করতে চায়। একজন সাব-ডেপুটির জন্য মালতী তার স্বদেশীকে তো স্যাকরিফাইস করতে পারে না; কিন্তু স্বদেশীর জন্য সিভিলিয়নকে স্যাকরিফাইস করা বাড়াবাড়ি। এক সুভাষ বোস করতে গিয়েছিল। হত্যা দিয়ে পড়েছে গিয়ে তাই। এ-সব ভগবানের দাড়ি ধরে টানা-হেঁচড়া কি আমাদের মতো মানুষের সাজে রে ভাই? তা আমাদের এক রকম ঠিকই আছে সম্বন্ধ।'

'কার সঙ্গে?'

'অঘোর মজুমদারের ছেলে বিলেত গেছে সিভিলিয়ান হবার জন্য। ফিরে এসে মালতীকে বিয়ে করবে। মালতীও কোনো আপত্তি করবে না। স্বদেশী করে ভাওয়ালি যাবার সাধ হয় নি তো।'

দেখতে-দেখতে এই মাংসপিণ্ড ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগে মেজকাকাকে অবিশ্যি জেগে উঠতে হল।

মেজকাকা আমাদের রান্নাঘরে গিয়ে কোনোদিনও খান নি—রান্নাঘরে মা কী করে রাঁধে, বা, বাবা ও আমরা কী করে খাই, সে সব ইতিহাস তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তিনি জানতে চান না, জানবার ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই। বিশেষত এই বর্ষাকালে, এই কাদামাটির দেশে পাড়াগাঁয়ে এসে পিছল পথে হাঁটতে তিনি রাজি নন। পায়ে কাদা লেগে যেতে পারে, অন্তত ভেলভেটের চটিজুতো নষ্ট হয়ে যাবে; ছাতার আড়ে বগলের ফতুয়া যাবে ভিজে; টর্চ আছে বটে কিন্তু তবুও রাত করে বাইরে নামলে সাপখোপের সম্ভাবনাও নিদারুণ।

বিকেল বেলা আলো ফুরুতে না-ফুরুতেই তিনি বেড়িয়ে এসে দক্ষিণ দিকের ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেন।

এসে পিসিমাকে বলেন—'আট আনা পয়সা গাড়ি ভাড়া নিলে। এখানকার

গাড়োয়ানেরা কান মলে পয়সা আদায় করে নেয়।'

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এলাম নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে। কাঁহাতক ঘরে বসে থাকা যায়?'

'তা বেশ, ঝাউয়ের বাতাস কেমন লাগল?'

'এদেশে শয়তান আর উল্লুক থাকে বাতাসে', একটু থেমে, 'বাতাস আলমোড়া পাহাড়ে, পাইনের বনে।'

অনেকে আমরা স্তম্ভিত হয়ে মেজকাকার দিকে তাকাই।

'গত এপ্রিলে গিয়েছিলাম—'

'কোথায়? আলমোড়ায়?'

'আলমোড়া, মুসুরি, দেরাদুন।'

এ বাড়ির কোনোদিন কেউ এ সব দেখে নি আর। দেখবেও না কোনোদিন। বাবা একটু বিস্মিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক বিরাট শাদা মেঘখণ্ডের সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে দূরত্বের সৌন্দর্য ও বিস্ময়কে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন।

'প্রায় সাড়ে বারোশো টাকা খসে পড়ল—'

বাবা চমকে উঠে তাকালেন মেজকাকার দিকে।

'তা কুমায়ুনের পাহাড়ে-পাহাড়ে হোটেলে-হোটেলে থাকব, টাকা খরচ হবে না?'

পিসিমা ফোড়ন দিয়ে, 'টাকা তো মেজদা নিজেই উপার্জন করেন, কারু কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় না তো'। মেজকাকা আত্মপ্রসাদের অহঙ্কারে পিসিমার দিকে একবার তাকান, আমাদের সকলের দিকে একবার।

বললেন—'নিয়েছি সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ করে।'

'কেন ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করে গেলেন না মেজদা?' পিসিমা বললেন।

'যাঃ যাঃ! আমি কি রমেশটার মতো বেল্লিক যে ঘুঘু সিভিলিয়ানরা যা করতে ভয় পায় আমি তাই করে বসব।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে নিয়ে মেজকাকা—'মালতী গেল, মালতীর মা গেলেন, বিজয় গেল, একটা বেয়ারাকেও সঙ্গে নিতে হল—'

'আহা, যদি পাশ পেতেন মেজকাকা, আপনার এত টাকা খসল!'

'দেখো, তোমরা এই দরিদ্রতার ভিতর কায়ক্লেশে থেকে-থেকে বড় প্রবঞ্চিত হয়েছ, মানুষের আত্মাকেই ফেলেছ হারিয়ে; তোমরা ভাব টাকাই সব; কিন্তু সৌন্দর্য ও ভগবানের জন্য আমাদের তেমন পিপাসা থাকলে ডাঙা দিয়ে তিনি যে আমাদের নৌকা চালিয়ে নিতে পারেন তা তোমরা জানো?'

বাবা এই পর্যন্তও বৈঠকে ছিলেন; এবার আস্তে চোখ বুজে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন; তাকিয়ে দেখলাম একটা টুলে বসে ইস্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছেন নিবিষ্ট একান্ত মনে, যেন কোনো বাধা, কোনো পরাজয়, কোনো দীনতার কুয়াশা কোনোদিনও ছিল না জীবনে।

মেজকাকা—'কুমায়ুনে গিয়ে ভগবানের সত্যকে আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে আসতে পেরেছি।'

মা বললেন, 'কুমায়ুনে কেন, এখানে বসে পারা যায় না? যেমন কুমায়ুনে তেমন এখানে বসেও পারা যায়।'

'সব সময়েই জীবনের জীর্ণতার ছোট নজরের কথা বলো না বউঠান।'

মেজকাকা—'তোমাদের ভিতরে এলে ভগবানের ভাব নিয়ে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না বউঠান।'

'কেন?'

'না, যেখানে জীবন মানে জীবন্মৃত অবস্থা, অর্থের দুর্গতি যেখানে মানুষকে দিয়েছে সঙ্কুচিত করে, সেখানে সৌন্দর্যের কথাই বা কী ভাবব, আনন্দের, বিধাতার স্পর্শই বা পাব কী করে? তিনি তো আনন্দের শুধু নয়, তিনি তো বেদনা—বললেন রবি ঠাকুর কিন্তু সে বেদনার ভেতরেও একটা রূপ আছে বউঠান, তোমাদের ব্যথা তো শুধু কুৎসিত'—মা অধোমুখে বসে রইলেন।

'সৌন্দর্য ও ভগবানকে দেখলেন মেজকাকা?'

'হ্যাঁ'

'কোত্থেকে?'

'কুমায়ুনেই'

'হোটেলের জানলায় বসে?'

মেজকাকা বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'হোটেলের মেনুই বা কী ছিল? কী আন্দাজ পঞ্চরং চলত?' কে যেন আস্তে বললে।

'[ছেলেমেয়েরা] গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ গিয়েছিল কয়েকজন।'

'বড্ড ঝালাপালা করে তোলে নি?'

'না, শান্তশিষ্টই তো ছিল'

'পরমাত্মা ও পরমেশ্বর তাদেরও বঞ্চিত করেন নি?'

'না, কেনই-বা করবেন? তাদের টাকা আছে বলে? সুচের ছ্যাদা দিয়ে উট খ্রিস্টিনি কথা, ও-সব সেকেলে ঢুকতে পারে, কিন্তু ধনী স্বর্গে যেতে পারে না সে-কথা আমি মানি না। টাকা থাকলে স্ত্রী সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন করা যায়, ভালো জায়গায় যেতে পারি, ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে থাকা যায়, পরিপাটি খাওয়া-পরা হয়, ঘুম হয় চৌকোশ, মনে শান্তি থাকে, আমাদের জীবনের এ-রকম সৎ সচ্ছল ব্যবস্থার ভিতরেই ভগবান আমাদের হৃদয়ে নামবার ভরসা পান।'

'হৃদয়টা ভেলভেটের কুশনের মতো না হলে তিনি নামেন না বুঝি?'

শুনে মেজকাকার বৈঠকি অন্তরঙ্গতা এক-আধ মিনিট থেমে রইল।

আমার প্রতি বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ শুধু মেজকাকাই হন নি, পিসিমাও হয়েছেন, মা পর্যন্ত।

তাই তো।

রাত নটার সময় ঘুমের থেকে উঠে মেজকাকা, 'বউঠান, বৃষ্টিতে ভিজে খাবার নিয়ে এসেছ দেখছি।'

উঠে বসে একটা হাই তুলে, 'এই অন্ধকার রাত-বিরেতে ঝড়-বাদলে কী করে যে তোমরা চলাফেরা কর বুঝি না, একটা লণ্ঠন নাও।'

'লণ্ঠন? ও বড্ড ঝামেলা ঠাকুরপো'

'চোখ জ্বলে বুঝি? একটা কুপি অব্দি চাই না?'

'কুপি মাঝে-মাঝে ব্যবহার করি বটে ঠাকুরপো'

'আমাকে ঠাকুরপো ডেকো. না—'

'ডাকব না?'

'বরং সুরেশবাবু ডেকো।'

মেজকাকা মাথা তুলে, 'কিংবা তাতে যদি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাটা জড়িয়ে গেছে মনে করো, তা হলে সুরেশদা'

সকলেই চুপচাপ।

মেজকাকা, চশমা চোখে আঁটতে-আঁটতে, 'তোমার শাড়িও দেখছি ভিজে গেছে বউঠান। একটা ছাতাটাতা ব্যবহার কর না কেন? বাঃ পোলাও রেঁধেছ আজ?'

পোলাও মেজকাকার জন্যই রাঁধা হয়েছিল, ছোট এক ডেকচি আন্দাজ।

'ইলিশ মাছ ভাজাও তো গোটা দশেক দিয়েছ দেখছি—বেশ বেশ।'

খেতে-খেতে, 'আচ্ছা এই তেপয়টা তোমরা কোথায় পেলে—যেটার ওপর থালা রেখে খাচ্ছি?'

'কেন? অসুবিধা হচ্ছে?'

'না, সে জন্য না, এমন ছবি-ফুল-কাটা তেপয় তো পাড়াগাঁয় দেশে দেখা যায় না বউঠান।'

'উনি কোত্থেকে এনেছিলেন।'

'দাদা কি খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ, দাদার খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি—'

পিসিমা বললেন, 'দাদা খেয়েছেন ওই রান্নাঘরে গিয়ে।'

'কেন, কেন, এ-রকম ব্যবস্থা কেন বউঠান? আমি খাব টেবিলে বসে, আর তিনি জল-ঝড়ে ভিজে—তেপয়টা কি কাঠের, বড় বউঠান?'

'দেখ তো খোকা, সেগুনের বোধ করি।'

বললাম, 'হয়তো মেহগিনির।'

মেজকাকা চোখ পাজলে হেসে—'পাগল না ছাগল, হবে বড় জোর জারুলের। দাদা তো কিনেছেন—না হয় কেরোসিন কাঁঠাল কাঠের।'

মা একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে জানলার দিকে তাকালেন। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

মেজকাকা, 'আমাদের কলকাতার বাড়ির আসবাবপত্র সমস্ত ওক কাঠের কিংবা মেহগিনির। দেখে আসবে গিয়ে বড়বউ একবার।'

পিসিমা—'মেজদার বাড়ি, কিসে আর কিসে, বাঘে আর রামছাগলে, কী আর, ও যে ইন্দ্রের বৈঠকখানা।'

মেজকাকা চশমার ভিতর দিয়ে বিস্ফারিত চোখে আমাদের সকলের দিকে এক-একবার তাকালেন।

খেতে খেতে, 'তোমরা যে ভরন-কাঁসার থালায় করে ভাত দাও, আমাদের ওখানে তো সে রেওয়াজ নেই, আমরা খাই ডিশে, ড্রেসডেন চায়নার ফুলকাটা ডিশ দেখিস নি? আমাদের চাকর-বাকরও সেখানে থালায় খেতে চায় না। সব্বায়ের জন্য ডিশ। পোলাওটা কেমন কড়কড়ে হয়েছে, ঘি দিতে কার্পণ্য করেছ বউঠান।'

পিসিমার দিকে তাকিয়ে মেজকাকা, 'জানলে, পোলাও রাঁধে তোমাদের মেজদিদি—ঘি, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম, জাফরান কত কী যে দেয়। যেমন পোলাও, তেমনি ছানার পায়েস, তেমনি মাংস—সুরেন খাস্তগিরের মেয়ে তো আর যে-সে জীব নয় বাবা।'

'কিন্তু মেজদিদি তো ইদানীং খাটেই শুয়ে থাকেন।'

'হ্যাঁ ইদানীং থাকেন বটে—'

'প্রায় দশ-বারো বছর ধরে আমি তো তাকে খাটে শুয়ে-শুয়ে পান জর্দা—'

বাধা দিয়ে মেজকাকা—'সেই ভালো রে; বড়লোকের বউ, উঠবার কী দরকার বল্? আট-দশটা বাবুর্চি খানশামা বরকন্দাজ রয়েছে, গিন্নিরই যদি নিজের হাতে নেড়ে কাজ করতে হল তো এ অনামুখোগুলোকে রাখা কেন?'

মা-র দিকে তাকিয়ে মেজকাকা, 'তুমি আজ পোলাও রেঁধে বসলে বউঠান, কড়কড়ে পোলাও। আমি ভেবেছিলাম ঢেঁকির শাক একটু কাসুন্দি দিয়ে খাব।'

মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে, 'কাল খাবেন।'

'কাল সকালে?'

'বেশ, তাই হবে।'

'কাল ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে?'

'বাজারে আনতে দেব।'

'না, গঙ্গার ইলিশের মতো স্বাদ তো এতে নেই।'

'যা বর্ষা— এত বৃষ্টিতে এদেশের ইলিশের ঝাঁঝ ধুয়ে জল হয়ে যায়। ভালো মাছ পাবেন বোশেখ-জ্যৈষ্ঠতে।'

'ভালো হোক, মন্দ হোক, ইলিশই যেন আসে। আর খুব বড় দেখে চিংড়ি, গলদা, আমার জন্য মাছের ডিমের বড়া করো, মুর্গির ছোট ডিম ওমলেটের মতো করে ভেজো। কুমড়ো ফুল পাওয়া যায়? ব্যাসন দিয়ে ভেজো তো, বড়ি দিয়ে একটা পালং শাকের তরকারি রেঁধো তো; তোমাদের গেরস্ত ঘরে আমচুর আছে না বউঠান?'

'আছে।'

'থাকবারই কথা; আমচুরের টক মন্দ লাগে না। যারা বাগিয়ে রাঁধতে পারে তাদের হাতে। আমাদের বাবুর্চিটা শিখেছে—মালতী শিখিয়েছে। মালতী একজন পাকা গিন্নি, বুঝলে।'

'তা হবেই তো, বড়লোকের মেয়ের হাঁটতে-কাশতেও রূপ খুলে যায়।'

'তবে, এসব ধরণের রান্না সে রাঁধে না, কাটলেট, কাস্টার্ড, পুডিং।'

মা—'কাস্টার্ড, পুডিং কী?'

মেজকাকা দাঁত বার করে হেসে, 'সে আছে এক রকম মাকাল ফল। যাক্ তুমি এখন এঁটো পাত কুড়োও বড়বউ। দাঁড়িয়ে থাকলে তো তোমাদেরই রাত বাড়বে।' এঁটো কুড়িয়ে থালা নিয়ে মা চলে যাচ্ছিলেন। মেজকাকা খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে, 'আবার অন্ধকারের মধ্যে ডুব মারবে বুঝি বউঠান?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'কোথায় চললে?'

'ঘাটে।'

'থালা বাসন মাজতে?'

'হ্যাঁ'

'এই অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে?'

'এ কি আজ নতুন, ঠাকুরপো।'

'তোমাদের কর্মের ভোগ ভোগো গিয়ে। আশা করি আসছে জন্মে তোমাদের মেজবউয়ের মতো খোঁচকপাল নিয়ে পৃথিবীতে আসবে।'

'খোঁচকপালে নয়নখান চিরকাল'—বলে হাসতে-হাসতে মা অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়লেন। আমিও চলে যাব ভাবছিলাম; মেজকাকা র‍্যাগটা টেনে নিয়ে গায়ে-পায়ে ভালো করে জড়িয়ে, বালিশে ঠেস দিয়ে, 'এই অন্ধকারের ভিতর সিদ্ধ ব্রাহ্মণরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন বুঝলি।'

'কোথায় বেড়াচ্ছেন?'

'আঁদাড়ে-বাঁদাড়ে বিলে-জঙ্গলে, বড়বউ যেখানে বাসন ধুতে গেল সেই ঘাটের সিঁড়িতে।'

পিসিমা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে, 'তার মানে?'

'ও কীরে ভয় পেয়ে গেলি?'

'তুমি ভূতের কথা বলছ?'

'ব্রাহ্মণ মানে বুঝি ভূত? আচ্ছা হাবা'

'তবে কী মেজদা?'

'না রে বাবা আমাকে জড়াতে আসিস নি; মেয়েলোক আর পেত্নীর কাণ্ডে ঢের ঘেন্না আমার। ওই চেয়ারটায় গিয়ে বোস। ব্রাহ্মণের মানে বলে দিচ্ছি।'

পিসিমা গিয়ে বসলেন।

মেজকাকা—'রাতের বেলা নামটা নেব?'

'ওঃ বুঝেছি, থাক, নাম নিয়ে দরকার নেই।'

'কিংবা রাতের বেলা 'লতা' বললেই হয়। লতার ভিতর ব্রাহ্মণও আছে জানিস।'

পিসিমা ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'থাক মেজদা, এসব থাক এখন।'

'গোখরো সাপ জাতে ব্রাহ্মণ, কালনাগিনী ব্রাহ্মণী।'

আমার ঘুম পাচ্ছিল। ঘাটের সিঁড়িতে অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে মা এত বছর ধরে তো অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে আসছেন। গভীর রাতে ঘরের ভিতর একবার নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চার শুনি। সুপুরি কাটার শব্দ, গুনগুন করে খানিকটা গান; বুঝি মা সারাদিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরেছেন; এমনি করে চৌত্রিশ বছর দেখলাম; একদিন যদি এই স্নিগ্ধ আশ্বাস ও উপলব্ধির পথে অন্ধকার বাধা এসে আঘাত দেয়, তা দিতে পারে; সৃষ্টির নিয়মই তো আঘাত দেওয়া। বেদনা ও অক্ষমতার কী গভীর সমুদ্র চারিদিকে; উপহাসের কী অপরিসীম ধূসর পাণ্ডুর দিনবলয়। এমনি বাদলের অমাবস্যার রাতে (সকলেই তো আর নৈনিতালের উজ্জ্বল হোটেলে ভগবান ও সৌন্দর্যের সন্ধানে যেতে পারে না,) কত চাষি ধানের খেতে ফিরছে, পাটের চারার ভিতর ঘুরছে; কত বধূ খাল-বিলের কাছে বসে।

পরদিন সকালবেলা বাবা, 'এই তো তোমার কাকা এখানে রয়েছেন। ইনি থাকতে-থাকতে এঁকে চাকরি-বাকরির কথা বলো না!'

চুপ করে ছিলাম।

বাবা—'তুমিই বলো, সেটাই ভালো হবে; জানো তো এ সব বিষয় নিয়ে আমি কোনোদিন কথাবার্তা বলি না কারু সঙ্গে।'

দক্ষিণের ঘরে গেলাম; কাকা চা খাচ্ছিলেন।

কাগজওয়ালা রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল—একটা 'এ্যাডভান্স' রেখে কাকাকে, 'পড়বেন?' হাত বাড়িয়ে কাগজ তুলে নিয়ে—'বেশ, পড়তে আমার আপত্তি নেই; খবর না পেয়ে কত দিন মনে হচ্ছিল [অন্ধকারে] পড়ে আছি। তোমরা এ-রকম জেলখানায় কী করে থাক, বলো তো?'

একটু হেসে, 'আমি ফ্রি রিডিং রুম-এর থেকে নিয়ে পড়ে আসি।'

'আর তোমার বাবা?'

'তিনি কাগজপত্র বড় একটা পড়েন না।'

'মনে-মনে ভাবেন বুঝি কাগজের ভিতর বলাৎকারের গল্প ছাড়া আর-কিছু নেই? চশমাটা, এটাচিকেসে, দেখতে পারছি না, এটা কী কাগজ রাখলে তুমি?'

'এ্যাডভান্স'

'আনন্দবাজার বিক্রি হয় না এখানে?'

'হয়'

'তাই তো রাখলে হত, কিংবা স্টেটস্‌ম্যান, বাসি দুধে চা করা হয়েছে বুঝি?'

'কই না তো।'

'তা হবে, বাসি দুধেই করে দিয়েছেন বোধ করি। বউঠান তো ঠাকুরপোর জন্য টাটকা দুধ-দুধ বলে খুব দহরম-মহরম করছিল।'

মা রান্না ঘর থেকে, 'টাটকা দুধে করা হয়েছে।'

মেজকাকা—'বেশ, আমি রাজা হয়ে গেছি।'

পিসিমা—'হবে; এটুকুর জন্য বউঠান কি আর বাড়িয়ে কথা বলবে? তবে তোমাকে বলি কি মেজদা, এরা দুধ জাল দিতে জানে না। আঁচ পাকতে দেয় না, কাঁচা আঁচে চড়িয়ে সমস্ত দুধ ধোঁয়ায় নষ্ট করে ফেলে।'

'মরি, চায়ের পেয়ালাটারই-বা বাহার কত।'

'দাদা কিনেছিলেন; মোক্তারের পছন্দ।'

কাগজটা তুলে নিলাম।

মেজকাকা—'তা পড়বে? তুমিই পড়ে—'

—'আপনি পড়বেন?'

—'না, খেতে-খেতে পড়তে পারি না আমি।'

দু-চার মিনিট নেড়েচেড়ে কাগজটা রেখে দিয়ে বললাম, 'বাবা বলছিলেন—'

'কী বলছিলেন?'

'আমার জন্য চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা কোথাও করে দিতে পারেন?'

একটু চুপ থেকে মেজকাকা, 'দাদা আমাকে নিজে এসে বললেই পারতেন—'

—'উনি এসব বিষয়ে কাউকে বলেন না বড় একটা—'

—'তাঁবেদার পাঠিয়ে দিলেন তোমাকে; ছেলের দায় যে বাপেরই দায়—তা জানো, আমি আর রমেশ, কক্ষনো ছেলেদের পাঠিয়ে দেই না। মুরুব্বিদের কাছে গিয়ে নিজেই তাঁবেদারি করি। এই তো সংসারের নিয়ম।'

চায়ে এক চুমুক দিয়ে, 'দাদা চিরটা কাল ফাঁকি দিয়েই গেলেন।'

পিসিমা—'সে যাক্; সে কেঁচো খুড়ে কী-আর লাভ হবে মেজদা? আপনাকে যখন এসে ধরেছে হেম, তখন একটা ব্যবস্থা দিন।'

'তোমরা মনে কর আমি একেবারে লাটসাহেব; চাকরি আমার পকেটে।'

পিসিমা গলা খাটো করে—'আজকাল চাকরি-বাকরির যা হা-পিত্যেশ, কপালে অনেক পুণ্যি না থাকলে কেউ পায় না।'

মেজকাকা—'মানুষের চাকরি জুটিয়ে দেয় শ্বশুর কিংবা মামা। তোমার শ্বশুরকে খুঁজেছিলে?'

পিসিমা—'ওঁর শ্বশুর তো নেই।'

—'নেই? কী হল তার?'

—'অনেকদিন হল মারা গেছেন।'

—'তবে এমন জায়গায় বিয়ে করতে গেল কেন?'

—'সে ভুল হয়ে গেছে, শোধরাবার উপায় নেই তো এখন আর।'

মেজকাকা—'বেঁচে থাকতে তোমার শ্বশুরমশাই করতেন কী?'

—'কোনো একটা স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।'

—'ম্যানেজার না, নায়েব?'

—'ম্যানেজার।'

—'তা সেখানে গিয়ে নায়েবি করো না তুমি।'

পিসিমা—'হেম নায়েবি করবে? তা পোষায় না; সে ভুঁড়ি কোথায়? তার চেয়ে মাস্টারি করলে মানায়।'

—'সেখানকার নায়েব এখন কে?'

—'জানি না।'

—'ম্যানেজারই-বা কে?'

—'কী একজন ব্যারিস্টার।'

—'তোমার শ্বশুর কি ব্যারিস্টার ছিলেন?'

—'না।'

—'তবে?'

—'বোধকরি বি-এল পাশ করেছিলেন কিংবা—'

—ফেরেব্বাজ নিয়েই জমিদারি চালিয়ে নিয়েছে তো?'

খানিকটা গলা খাঁকরে—'আর ভুইঞা, তোমার, মামা তিনি করেন কী?'

—'তিনি পোস্ট অফিসে—'

—'চিঠি সর্ট করেন বুঝি?'

—'রেজিস্ট্রেশন ক্লার্ক বোধ হয়।'

—'যাক, তবুও ভালো।'

—'ছোটখাটো জমিদার যেমন আছে, তেমনি আমার শালা ছোটখাটো কাজ করে—'

—'শালা কত টাকা পায়?'

—'পঁচিশ।'

—'এই সব আঁস্তাকুড়ের মধ্যে বিয়ে করলে তুমি?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'অবিশ্যি চাকরির উমেদারির জন্য আমার কাছে এসেছ, দাদা দিয়েছেন পাঠিয়ে—তা অনেক বড়-বড় ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ

আছে বইকি—'

—'তা হলে—'

—'এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার, মিনিস্টার।'

—'তবে তো আপনি চেষ্টা করলেই পারেন।'

—'না, বেঙ্গলে কিছু হবে না।'

—'কেন?'

—'বড় ছেলেটাকে ইউ-পিতে পুলিশে ঢুকিয়ে দিয়েছি। মেজটা বেহারে আবগারি ইন্সপেক্টর। বিজয়কে নিয়েই একটু মুশকিলে পড়েছি। হারামজাদাটা ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারত যদি, এক এস-এস-আই কি টি-আই. করে দেব আর কী। আমার আলাপ-পরিচয় সব আপে।'

—'বেশ আপেই হোক।'

—'সে বাঙালির হয় না, আদবকায়দা জানে পশ্চিমি মুসলমান, বুঝলে? এক-একজন আমাকে নিয়ে কী যে করে উঠবে বুঝতে পারে না। সে আমার পা ধুয়ে জল খেলে যেন কৃতার্থ হয়।'

একটু চুপ থেকে—'কলকাতায় অনেক ডিপার্টমেন্টেও আমার খাতির; সুরেন দাশগুপ্তকে চেনো?'

—'কোন সুরেন দাশগুপ্ত?

—'আবার কোন সুরেন দাশগুপ্ত—বাংলাদেশে কটা সুরেন দাশগুপ্ত থাকে। তেলের কারবার করে লাখ টাকা করে ফেলেছে।'

—'আমি ভেবেছিলাম সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল।'

—'দূর দূর। সাত ছেলে। এক ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি দেবার জন্য। জুটিয়ে দিয়েছি; এই তো ছ-মাস আগে।'

—'আমাকেও দিন না।'

—'ভেকান্সি নেই আর?'

পিসিমা—'সুরেন দাশগুপ্তের ছেলেকে না দিয়ে ও-কাজটা হেমকে দিলে হত মন্দ না।'

—'আহা, সে ছেলে এসে যে আমাকে বাবা ডাকল।'

একটু চুপ থেকে—'বেশ ছেলে। অত বড় তেলের কারবারের মালিক হল বাপ, অথচ ছেলের একটুও ভড়ং নেই। শাদাসিধে। গান্ধী ক্যাপ মাথায় দেয়। মালতীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম—দিব্যি ঝাড়াঝাপ্টা।'

বললাম—'অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে'

—'আলাপ তো আমার সব ডিপার্টমেন্টেই আছে—'

—'তা হলে কলকাতায় গিয়ে এই সম্পর্কে আপনার সঙ্গে দেখা করব—'

—'কাকার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে, তাও আবার অনুমতির দরকার হয়?'

—'না, এই সম্পর্কে?'

—'এই ডিমটা পচা না কি রে?'

—'কই? না তো'।

—'কেন, ছোট ডিম।'

—'কেমন হাঁস-হাঁস মনে হচ্ছে।'

—'না, না, কাল আবদুল্লার কাছ থেকে রাখল বউঠান।'

বললাম—'ডিমটা ভালোই, তা তোমার [? আপনার সঙ্গে] চাকরির সম্পর্কে কলকাতায় গিয়ে দেখা করব?'

'ছ-মাস আগে যদি দেখা করতে একটা কিছু করা যেতে পারত।'

—'আবার সুযোগ আসবে।'

—'তোমার বাবার যেমন এসেছে।'

—'তদবির করতে দোষ কী?'

—'তুমি গেলে না কেন?'

—'যাওয়া হয়ে ওঠে নি; বিশ বছর আগের কথা, তখন রুচি প্রস্তুতি ছিল অন্য রকম।'

—'কাজ শিখতে পারতে কিংবা প্লামবার অথবা ওয়াটার ট্যাঙ্ক-এর কাজ। এর কত রকম ডিপার্টমেন্ট আছে।'

—'আবগারিরও তো ডিপার্টমেন্ট আছে। সেও মন্দ পুরস্কার নয়। অন্তত সাধনাশ্রমের থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তো।'

—'আমি ভাবছি আবার সাধনাশ্রমেই ঢুকব। এইবার বেদিতে উঠব গিয়ে। সমাজের বন্ধু-বান্ধবরাও তাই বলছেন।'

—'তুমি না শুনেছিলাম ম্যানেজারি নেবে?'

—'কই? না।'

—'পেলে না?'

—'তোমরা আমার সম্বন্ধে কত অভূতপূর্ব কথাই শোনো, সাহেবের সেক্রেটারি হবার জন্য তদবির করছি। মাদ্রাজে চেষ্টা করছি। কলকাতার ইনসিওরেন্সে বড় চাকরি নিয়েছি।'

—'তোমার সম্বন্ধে কোনো গুজবে আমরা বিশ্বাস করি না মেজদা। সংসারেব লোকেদের চিনি না কি? মানুষকে ঈর্ষা করে তার সম্বন্ধে মিছিমিছি কত কুচ্ছা রটিয়ে বেড়ায়।'

—'অবিশ্যি যা পেনশন পাচ্ছি আমি, তাতে আমার চলে না। চাকরি একটা পেলে ভালো হয়। আমাকে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু কাজে লাগালেন না। একজনকে নিলেন। ইনসিওরেন্সের মামাবাড়ির খবর জানি রে কিন্তু আমড়াগাছি করতে পারি না বলেই তো আজও পেলাম না। তা, এই পুজোর পর একটা পাবার আশা আছে। একটা বড় কোম্পানিতেই ৫০০ করে মাইনে দেবে।'

পিসিমা, একটু চুপ থেকে, 'হেমকেও একটা কিছু জুটিয়ে দাও না।'

—'ওর হবে ওর বাবার মতো।'

—'কী রকম?'

—'থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়।'

—'তা তোমরা একটু চেষ্টা করে—'

—'বেশ তো, ইনসিওরেন্সে একটি এজেন্সি নিক না; নেবে এজেন্সি?'

চুপ করে ছিলাম।

মেজকাকা—'কত ছেলে থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস অব্দি পড়ে ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর তুমি এম-এ পাশ করে নিতে ভয় পাও?'

—'ভয় না মেজকাকা।'

—'তবে? ধরো, বছরে ৫ লাখ টাকার কেস দেবে। আমরণ আওতায় থাকবে।'

মা এসে পড়েছিলেন; বললেন, 'তাই তো; এই-ই কর না।'

লেগ পুলিং এর মানে কী মা জানেন না, মেজকাকার এ পরামর্শের অর্থ কী করে বুঝবেন তিনি আর।

বললাম, 'শুনলাম, কর্পোরেশনের চিফের সঙ্গে তোমার [? আপনার] খুব আলাপ।

মেজকাকা একটা ধমক দিয়ে—'আবার বাজে কথা বলে।'

—'কর্পোরেশনে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন না।'

—'কর্পোরেশন আমাকে বলেছিলেন কয়েকটা বস্তি ইন্সপেক্টরি খালি আছে শুনেছিলাম। বিজয়ের প্রাইভেট মাস্টারটা না খেতে পেয়ে মরছে না কি, তারই জন্য একটা জুটিয়ে দেব ভাবছিলাম।'

—'বেশ তারই একটা দাও না আমাকে—'

—'হ্যাঁ, সে সব কাজ আর বসে থাকে কিনা। কলকাতায় একটা চামার মরলেও দুশো গ্রাজুয়েট দরখাস্ত নিয়ে ছুটে আসে।'

—'কী করা যায় তাহলে?'

গোঁফে হাত বুলিয়ে 'ও-সব দুরাশা ছাড়ো। তবুও যদি জেল-ফেরৎ হতে, বলেকয়ে কর্পোরেশনে একটা ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যেমন তুমি তেমন তোমার বাবা, বায়ুভূত নিরালম্ব জীব। ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, আর কী, পরকালে কপাল খুলবে।'

কল্যাণী ভাবে কলকাতায় যেতে দেরি করে ফেলছি আমি। কিন্তু দেরি আর কী? দশ দিন আগে গেলেও যা, পিছে গেলেও তাই। কেউ আমার জন্য চাকরি হাতে করে বসে নেই। ফ্রি রিডিং রুমে রোজ গিয়ে খবরের কাগজ পড়ে আসি। প্রায় পাঁচ-ছখানা কাগজ পাওয়া যায়। নানা রকম চাকরি খালি রয়েছে বটে—রোজই খালি থাকে, অ্যাকাউন্টট্যান্ট, কম্পাউন্ডার, নার্স বাজার সরকার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, স্টেনোগ্রাফার, খানশামা, আয়া ইত্যাদি।

কলকাতায় গিয়েও কাগজপত্রে এই রকম দেখব।

আরো নানা জিনিশ দেখেছি, নানা জায়গায় গিয়েছি, অনেকের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু গত ছ-সাত বছরের মধ্যে এক-আধটা ট্যুইশান পেয়েছি। আর-কিছুই পাই নি। পাবই-বা কী করে? আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্রতা তো আমার নেই, না আছে বিরাট উদ্যমের অপরিমেয়তা।

মরিস বা অস্টিনের মতো কোনোদিন আমি মোটর তৈরি করতে পারব? গড়তে পারব? প্রফুল্ল রায় বা নলিনীরঞ্জন সরকারের মতো বেঙ্গল কেমিক্যাল কিংবা হিন্দুস্থান-এর মতো গড়ে তুলতে পারব? পরিমল গোস্বামীর মতো অক্সফোর্ড থেকে ফিরে জুতো ব্রাশ করতে পারব?

কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব, আড়ম্বরের ভিতর কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুশ্ছেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার

সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধূলির শূন্যতায়। যে-উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটর কার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যাবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেড মাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে [সেই] আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম নেই আমার।

আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের অকুতোভয় স্বাভাবিকতা ও অমিততেজা সাংসারিকতা যদি থাকত তা হলে গত ছ-সাত বছরের মধ্যে কোনো-না-কোনো কাজ আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পেতাম; হয়তো কোনো ইস্কুলে পঁচিশ টাকার মাস্টারি নিতাম. কোনো মেসের সরকার হয়ে যেতাম হয়তো, লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একদিনে হয়তো প্রদীপ জ্বালিয়ে ফেলতে পারতাম, দর্জির কাজ শিখে ফেলতাম কিংবা স্টেনোগ্রাফার হয়ে যেতাম, নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতায় ক্যানভাস করতাম হয়তো, কিংবা প্রাণপণে শেয়ার বিক্রি করে চলতাম, হয়তো মুদির দোকানের মালিক হয়ে বসতাম, কিংবা দু-তিন গ্রুপে এম-এ নিয়ে ফেলতাম, হয়তো নিদারুণ একনিষ্ঠতার সঙ্গে জেলে পচতাম, কিংবা ভ্রূক্ষেপহীন অক্লান্তিতে পথে-পথে জুতো সেলাই করে চলতাম।

আলুর আড়ৎ না-খুলে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছি বলে মনের ভিতর কোনো বেদনা থাকত না।

যদি আমি বিবাহ না করতাম, সন্তান না হত আমার, যদি একা থাকতাম আমি—তা হলেও শিল্পসৃষ্টি ভালোবেসে, সংসারে বিফল হয়ে, মনের ভিতর কোনো নিরবচ্ছিন্ন বেদনা থাকত না। হয়তো খুব লঘু ভাবে থাকত। কিন্তু কল্যাণী ও খুকির ভার এমন একজনের উপর পড়েছে, যে, না-পারে ঐকান্তিক ভাবে শেয়ার ক্যানভাস করে বেড়াতে, না-পারে ঘোলের শরবতের দোকান খুলে লক্ষ্মীকে অধিকার করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাতে।

সমস্ত কারুতান্ত্রিকই কি সংসারের স্ত্রীর প্রতি এমন বিরাটভাবে উদাসীন।

তা ঠিক নয়; শিল্পযাত্রীও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ হিশেবেই রক্তমাংসের সুখসুবিধা সুব্যবস্থা চায় বইকি, কিন্তু তার জীবনের মধ্যে প্রেরণার ভিতর নিরবয়বকে উপলব্ধি করে আনন্দ, ও অবয়বসম্পৃক্ত নিষ্ফলতা, আবহমানকাল থেকে এই মধুর মারাত্মক বীজ রয়ে গেছে।

একখানা গল্পের বইয়ের সাংসারিক দাম যে তেমন কিছু নয়, একখানা কবিতার বইয়ের দাম যে আরো ঢের কম তা তাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সংসার; কিন্তু তবুও সমস্ত কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্দান করবার মতো স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে অর্জন করতে পারে না। এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট। চণ্ডীদাস একজন, ভিলোঁ আর-একজন, হাইনে একজন, আর-একজন ভারতচন্দ্র। শিল্পের সাহিত্যের আর্টের ইতিহাসে এমন আরো অনেক নাম রয়ে গেছে যারা না-খেতে পেয়ে মরেছে, কিংবা যক্ষ্মায়, কিংবা লাঞ্ছিত হয়ে, কিংবা দুর্দিনের তিমিরে স্বল্পতায়।

কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের যক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিয়ে যেতে চায় নি, যেতে পারে নি, কেউ কোনোদিনও পারে নি, কোনোদিনও পারবে না।

চারদিকে ছায়া জমে গেছে; বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের গভীর অন্ধকার। নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি আরম্ভ হল। বেশ লাগে আমার এই বৃষ্টি, খড়ের উপর সমসম শব্দ হয়, ধুলোমাটির নরম সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে, কেমন একটু শীত-শীত করে, সুগন্ধি কেয়া-কদমের মতো দেহ কাঁটা দিয়ে উঠে। হৃদয় শিহরিত হয়ে ওঠে অবচেতনে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি শুধু মৌসুমির কাজলঢালা ছায়া। কিশোরবেলায় যে-কালোমেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহুদিন যাকে হারিয়েছি—আজ, সেই যেন, পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশে দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশে সেই যেন দিগবালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণা মণি, পূর্ব আকাশে আকাশ ঘিরে তারই নিটোল কাল মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কালো দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো রূপ তার—প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মতো অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোনো পল্লীর দিনগুলো সমর্পণ করে কোনো দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।

সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝ-গড়নের মানুষ—শাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মতো দেখতে, বহুদিন হয় তিনিও এ পৃথিবীতে নেই আর। কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ; বছর পনেরো আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবুফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা চুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল, বঁইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তার পর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝপথে গেল থেমে, তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক-গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর তাকে আর আমি দেখি নি।

অনেকদিন পরে আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে, চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা—।

খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ।

ঘরের ভিতর বাবা এসে ঢুকেছেন।
—'খোকা'।
—'আমাকে ডাকছ বাবা?'
—'শুয়ে আছিস যে?'
—'এমনিই, তুমি কখন ইস্কুল থেকে এলে?'
—'অনেকক্ষণ'
—'সাড়াশব্দ পাই নি তো।'
—'বারান্দায় বসে ছেলেদের এক্সসাইজ খাতা দেখছিলাম। তোর মা কোথায়?'
—'রান্নাঘরেই তো'
—'তা হবে; দেখলাম এক থালা লুচি ভেজে সুরেশকে দিল; বিকেলে তুই খাস নি?'
—'না। তুমি?'
—'আমি ওই ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, একটু গুড় দিয়ে খেলাম। খাবি নাকি?'
—'আছে আরো?'
—'ঢের আছে—'
বাবা ছোলা-গুড় আনবার জন্য উঠে যাচ্ছিলেন।
বাধা দিয়ে—'আচ্ছা আমিই নিয়ে আসব এখন, তুমি বোসো।'
—'আচ্ছা বেশ'
একটু হাই তুলে, 'বৃষ্টি পড়ছে যে রে, টের পাস নি?'
—'হ্যাঁ পেয়েছি?'
—'তা হলে ঝাঁপি খুলে রেখেছিস কেন?'
—'কী আর হবে?'
—'জানলার জলের ছাট এসে টেবিলের বইগুলো ভিজে যাচ্ছে যে।'
—'যাক, এমন কী আর বই?'
—'কেন, কোনো ভালো বই নেই?'
মাথা নেড়ে—'না।'
বাবা বললেন—'খানিকটা খুচরো চা এনেছি'
—'মেজকাকার জন্য?'
—'না সুরেশ কি আর এই ছ-আনা পাউন্ডের চা খাবে?'
—'ছ-আনা বুঝি?'
—'হ্যাঁ; চা খাবি? তা খাওয়াই ভালো এই বৃষ্টি বাদলের দিনে ঠাণ্ডা লাগে, একটু গরম চা বেশ কাজ করে; সর্দি-কাশি নষ্ট হয়, মনের ভিতর একটু আশা-ভরসাও পাওয়া যায়, তোমার মাকে দিও, করে দেবে।'
—'তুমি খাবে না?'
—'চা খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'
—'নেই অবিশ্যি, কিন্তু—'
—'খেলে ঘুম হবে না যে রে?'
চায়ের মোড়কটা জীর্ণ-বিবর্ণ শাদা খদ্দরের কোটের পকেটের থেকে বের করে বাবা টেবিলের ওপর রাখলেন।

বললেন—'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি। কবে যাবে?'
—'একদিন গেলেই হয়।'
—'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভালো।'
—'এই সাত বছর ধরে কত বারই তো এলাম-গেলাম, বাবা।'
—'কিন্তু এবার তো গত সাত বছরের মতো হবে না।'
—'হবে না?' একটু হেসে, 'কী করে তুমি জানলে ,বাবা?'
—'আমার বিশ্বাস, তোমার মারও বিশ্বাস...'
একটু বিদ্রূপ করে হেসে বললাম, 'কী যেন বলছিলাম...'
বাবাকে আহত হতে দেখে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।
—'তোমার মেজকাকার সঙ্গে কথা হয়েছিল?'
—'হ্যাঁ'
—'চাকরি-বাকরির কথা?'
—'হ্যাঁ হয়েছিল।'
—'কী বললেন?'
—'বললেন, তুমি আর তোমার বাবা ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, পরকালে হয়তো কপাল খুলে যাবে।' দু-এক মুহূর্ত বাবা শ্রীহীন, জীর্ণ, ক্ষীণমুখে বসে রইলেন।
তার পরেই হো-হো করে হেসে—'ও, তা এই বুঝি বললে সুরেশ?'
—'হ্যাঁ'
—'মন্দ বলে নি। কিন্তু পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি।'
—'আমি তো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।'
—'পারলে না?'
—'মৃত্যুর পর কী আর থাকে?'
—'থাকে বইকি; সমস্তই থাকে; আরো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদের—'
—'উপনিষদ যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেন নি তো; রক্তমাংসের শরীরে ইহলোকে বসে যে-ধারণা তাদের ভালো লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন; তাদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ দেখি না।'
—'একদিন হয়তো দেখবে।'
—'আশীর্বাদ করো, দেখতে পারি যেন।'
—'নিজের মনের আন্তরিক অনুসন্ধানে যা সত্য বোধহয় সেই টেকে। বিশ্বাস করো, এই আশীর্বাদ করি।'
—'তা হলে হয়তো চিরজীবন অবিশ্বাসী হয়েই থাকব।'
—'থেকো।'
—'ভাবতে গেলে তোমার দুঃখ করে না বাবা?'
—'কী দুঃখ? একে-একে যে দুই হয় এ-কথা যদি আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, আমার বুদ্ধি-বিচার কল্পনা সমস্তই যদি সাব্যস্ত করে যে তিন হয়—তা হলে এই অন্ধতার অভিশাপ বুকে নিয়েই জীবনের পথে চলতে হবে; এ অভিশাপ মোচন করবার শক্তি আমার নেই। কোনো মানুষের নেই—বিধাতা যদি দয়া করে

আলো দেন তবেই তা ঘুচতে পারে।' শাদা গোঁফ জোড়ায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাবা বললেন—'কিন্তু এটা মনে কোরো না হেম, যে একে-একে তিন হয়, দুই হয় না, এই ভুল ধারণা নিয়ে তুমি জীবন চালাচ্ছ। হয়তো আমার এ ভগবানে বিশ্বাস, পরলোকে ঐকান্তিক আস্থা, সেই সব ভুল; জীবন-মৃত্যুতে আমিই ধোঁয়ার ধাঁধা নিয়ে কাটালাম।' বলে শাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে হাসতে লাগলেন আবার।

বললেন, 'যাক্ দু-তিন বছরের মধ্যেই বুঝতে পারব সব।'

চোখ তুলে তাকালাম বাবার দিকে।

—'ভগবান ও শান্তির দিকেই যাচ্ছি, এই ভেবে মরব।'

—'কিন্তু এও তো হতে পারে মরে জেগে উঠব না আর।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে পঁচিশ টাকার ইস্কুল মাস্টারি নিও না।'

—'কেন?'

—'হেডমাস্টার হয়তো সামান্য বি-এ পাশ, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসে ইংরেজি পড়াচ্ছেন, আর তোমাকে দেওয়া হবে ভূগোল আর অঙ্ক পড়াতে। এ সব অবিচার চোখ বুজে ক্ষমা করে দেবার মতো কোনো প্রয়োজন দেখি না আমি।'

চুপ করে ছিলাম।

—'হ্যারিসন রোডের মেসে যদি থাকো তা হলে উল্টাডিঙ্গি, ঢাকুরিয়া বা চেৎলা-ফেৎলায় কোনো টিউশন নিতে যেও না।'

—'নেব না?'

—'না'

—'কেন?'

—'এ সম্বন্ধে আমার মতামত খুব ভালো করেই জানো, হয়তো কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকা দেবে তোমাকে, কিংবা আরো কমই দেবে হয়তো, জীবনে টাকার মুখ তুমিও কম দেখেছ, সে ট্রেন ভাড়া দিতে গিয়ে তোমার অন্তঃকরণ খেঁকিয়ে উঠবে একেবারে। এ বড় দীনতার কথা, মানুষ এতে বড় খাটো হয়, বৃষ্টিবাদলের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাবে সেই উল্টাডিঙ্গি, পায়ে হেঁটে ফিরবে আবার; শরীরের দিক দিয়ে এর ভেতর যত না কষ্ট, আত্মার দিক দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি অপচয়; কেন এ অপচয় করবে তুমি?'

একটু চুপ থেকে হেসে—'তা না-হলে কী করব?'

—'তা তুমি জান, আমার সন্তান হয়ে যখন জন্মেছ তখন অনেক বেদনা বইতে হবে তোমাকে, কিন্তু প্রাণ যাতে চিমসে হয়ে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, এমন কোনো জিনিশ করো না তুমি; বেদনা ও সঙ্কীর্ণতা এক জিনিশ নয়। যে-কোনো কাজে বা চিন্তায় জীবনের প্রসার নষ্ট হয়, তার থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নিও। বরং বাড়িতেই চলে আসবে আবার; কী আর করবে? পনেরো টাকার টিউশনের জন্য, টিউশনের টাকার প্রতিটি কানাকড়িও বাঁচাবার জন্য হ্যারিসন রোড থেকে চেতলায় হেঁটে যাওয়া-আসা জীবনের এত বড় শকুন কোনোদিন সাজতে যেও না তুমি।'

হাসছিলাম।

বাবা বললেন—'শকুন; কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে দশ টাকা-পনেরো টাকার টিউশন-এর জন্য যারা চেতলা-উল্টোডাঙ্গা পাড়ি দেয় তাদের দলে ভর্তি না হলে কলকাতায়

যুদ্ধ যে আজকাল চলে না, বাবা কি তা জানেন? দশ টাকা না হোক, বিশ টাকা পেলে?'

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে চা খাও না?'

—'খাই'

—'দোকান থেকে?'

—'হ্যাঁ'

—'বউমার ঘরে একটা স্পিরিটের স্টোভ পড়ে আছে, খুকি হবার সময় কেনা হয়েছিল, সেইটে নিয়ে নেও।'

—'আচ্ছা'

—'এক বোতল স্পিরিট কিনে নেবে—খানিকটা খুচরো চা নিজে তৈরি করে খাবে।'

—'তা খাওয়া যায়।'

—'আর খানিকটা বাতাসা, চা-র সঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে কী করো?'

—'যদি টিউশন থাকে তো ছেলে পড়াতে যাই।'

—'আর যদি না-থাকে?'

—'তা হলে ফুটপথে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে, ওল্ড বুক শপের দু-চারখানা বই নেড়ে দেখি, এক-একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আবার হাঁটি, চায়ের দোকানের খবরের কাগজ নিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকি।'

—'বাঃ, এ সব কি মানুষের ভালো লাগে?'

—'না, আগে ভালো লাগত না একদম, কিন্তু কয়েক বছর ধরে তালিম হয়ে গেছে।'

—'কিন্তু তবুও এ তো সত্যিকারের জীবন নয়।'

—'তা হয়তো নয়—আমার কি ইচ্ছে করে জানো?'

বাবা তাকালেন আমার দিকে।

বললাম—'মস্ত বড় একটা মাঠের মধ্যে কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি; পাশে মেঘনা কিংবা কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী। পেটের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না, দিনরাত লিখি আর পড়ি। দিগন্তবিস্তৃত সোনালি খড়ের মাঠের কিনারে বেড়াই, লাল আকাশ ভেঙে সন্ধ্যার দাঁড়কাকগুলোকে ঘরে ফিরে চলে যেতে দেখি।'

বাবা চুপ করে ছিলেন।

বললাম—'কিন্তু এ হয়তো শখ হল, পলায়ন হল, জীবন হল না, জীবন হয়তো ভিড়ের মধ্যে মিশে যা করতে ইচ্ছা করে না, ভাবতে ভালো লাগে না, সেই অপ্রেমের কাজ ও চিন্তার জন্য সহানুভূতি সাহায্যের চেষ্টা।'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

বাবা এ-সব কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

বললেন—'কলকাতায় তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই?'

—'বছরের পর বছর ক্রমেই কমে যাচ্ছে।'

—'কেন?'

—'মতিগতির পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে হয়তো—'

বাবা একটু চুপ থেকে—'তারা হয়তো সাংসারিক সফলতা লাভ করছে।'

'হ্যাঁ, কেউ করেছে, কেউ চেষ্টায় আছে।'

—'যাদের সঙ্গে থাকতে, কলেজে পড়তে, তারা আজ ট্রামে করে সেক্রেটারিয়েটে যায় আর তুমি ঘোরো ফুটপথে?'

—'অনেকটা তাই'

—'অবিশ্যি এতে ব্যথা পাবারই তো কথা—'

—'না, সেক্রেটারিয়েটে আর এমন-কী জিনিশ, সেখানে ঢুকতে না পেরে খুব বঞ্চিত হলাম এ-কথা অবিশ্যি মনে করি না।'

—'নিজের মনকে হয়তো সান্ত্বনা দাও এই ভেবে যে এর চেয়ে কংগ্রেস ঢের বড় জিনিশ। সেখানে সকলের অবাধ প্রবেশ; হয়তো কোনো এক ভবিষ্যতে সেখানে সে নেতা হয়ে বসবে।'

—'না, অতদূর ভাবি না।'

—'খানিকটা ভাবো নিশ্চয়ই; ভাবাই স্বাভাবিক, জীবনের আরাম ও বিলাসের জিনিশগুলো যাদের হাত থেকে ফসকে গেছে, অবশেষে তারা ত্যাগ ও মহিমার অকৃত্রিম ভক্ত হয়ে ওঠে, না-হলে দাঁড়াবে কোথায়, বলো? ঐশ্বর্য যাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করে, ঐকান্তিক অশ্রু দিয়ে ত্যাগকে পূজা করবার শক্তি তার যেমন হয়, আর কারু তেমন হয় না।'

—'কই, কংগ্রেসে আমি যাই নি তো।'

—'যাবার দরকার করে না তো; অনেকদিন থেকেই তোমার হৃদয়ে দেশপ্রেমের আসন পেতে রেখেছ হয়তো; সে আসন সব সময়ই চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু এক-এক সময় পড়ে, যখন কলেজের বন্ধু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে মোটর চালিয়ে ছুটছে আর তুমি পথের বেকার; যখন ছেলেবেলার খেলার সাথি তার মেমসাহেবকে নিয়ে বক্সে বসেছে আর তুমি চার আনার সিটে মাথা গুঁজে আছ।'

একটু চুপ থেকে—'দেশ, কংগ্রেস, দেশবন্ধু, বিরাট আত্মত্যাগ, অপরিমেয়, স্বদেশ প্রেম—এই সবের কথা তখন মানুষের চিত্তকে সজীব করে গেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন,—'পৃথিবীতে টিকে থাকবার নিজের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আত্মার কাছে মর্যাদা পেয়ে টিকে থাকবার এই রকম সব বিধিব্যবস্থা আছে, এ-সব না-থাকলে জীবনের নিঃসম্বলতা বড় ভয়াবহভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠত। শুধু কথা ভাবা, শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা করা। কিন্তু তবুও এ-সবের ঢের মূল্য আছে।' একটু চুপ থেকে বাবা—'বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে অবিশ্যি মানুষ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় আর-এক ভাবে—জীবনের সচ্চরিত পথ ও ভগবান কিংবা ভবিতব্যতা ও মৃত্যুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার আসে নি। এখনো দেশের মাটি, কংগ্রেস, কবিতা ও সাহিত্যের মর্যাদা, সাহিত্য স্বপ্ন, অবাস্তববাদ এই সব মোহকে আশ্রয় করেই ফুটপথে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জোর পাচ্ছ।'

—'না, মৃত্যুর চিন্তাও মাঝে-মাঝে করি।'

—'করো?'

—'মাঝে-মাঝে মনে হয় বয়স চৌত্রিশ হয়েছে বটে—সত্তর হয় নি, কিন্তু তবুও সবই যেন সমাপ্ত হয়ে গেছে; কেমন একটা গভীর অবসাদ পেয়ে বসে, সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের বিছানার থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, সব দেখেছি,

জেনেছি, বুঝেছি, সব লিখেছি, তখন ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকার বেড়ে চলুক, কোনোদিনও যেন এই অন্ধকার শেষ হয় না, ঘুম কোনোদিনও ফুরোয় না যেন আর।'

—'আর কী-রকম চিন্তা করো?'

চুপ করে ছিলাম।

—'এই সৃষ্টিটাকে একটা পাখির খাঁচার মতো তৈরি করে নিতে পারা যায়, তখন মানুষের অবস্থা বড় ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমার অনেক সময় মনে হয় জীবনটা কলে ধরা ইঁদুরের মতো। যেন চারদিকে শিক আর শিকল শুধু—না আছে রূপ না আছে ফুর্তি—'

বাবা বিশেষ গ্রাহ্য না করে বললেন—'দুপুরবেলা কী করো? মেসে থাকো?'

—'আগে থাকতাম না, আগে বড় নির্বোধ ছিলাম।'

—'কী রকম?'

—'মেসের বিছানায় একা-একা শুয়ে থাকতে বড় খারাপ লাগত।'

—'একা-একা?'

—'হ্যাঁ। সবাই অফিসে চলে যায়; অফিসারদের মেস, সকলেই কোথাও-না কোথাও কাজ করে—জীবনের জবাবদিহি দেয়, জীবনের কাছ থেকে পুরস্কার পায়। এই সব অনেক দিন ভেবে-ভেবে বিছানায় আর শুয়ে থাকতে পারি না আমি। মনে হত বেরিয়ে গেলে আমিও হয়তো সৃষ্টির কাছে নিজের জীবনের কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ বের করে নিতে পারব।'

—'কিন্তু আজকাল বেরোও না বুঝি আর?'

—'নাঃ', একটু হেসে বললাম, 'অবাক হয়ে ভাবি, জীবনের চার-পাঁচটা বছর ধরে সমস্তটা দুপুর কলকাতা শহরের কত জায়গায় টো-টো করে বেড়িয়েছি। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ইন্সিওরেন্স অফিসগুলো। এক-একটা জায়গায় পনেরো-বিশ বার করেও গিয়েছি। নিজের জবাবদিহি দেবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এমনই প্রবল, এমনই রুচি তার যে সে মনে করে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের একজন কেরানি হলেও জবাবদিহি দেওয়া হয়, কিন্তু দুটো কবিতার বই বের করলে হয় না। এই চার বছর যদি আমি এক মনে শিল্পসৃষ্টি করতাম, তা হলে অনেকগুলো মূল্যবান রচনা বের করতে পারতাম।'

—'যাক, চার বছর ঘুরেছ ভালোই করেছ; না-যদি ঘুরতে তা হলে হয়তো মনে করতে কতকগুলো অসার কবিতা লিখে রাজত্ব তো নষ্ট করলাম, রাজকন্যাও গেল।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন—'আমাদের মন এই রকমই কেমন যেন রহস্যের জিনিশ।'

একটু চুপ থেকে—'আজকাল দুপুরবেলা মেসে কী করো?'

—'খবরের কাগজ পড়ি।'

—'খবরের কাগজ আর কতক্ষণ পড়া যায়?'

—'বোর্ডাররা প্রায় চার-পাঁচখানা খবরের কাগজ রাখে।'

—'পড়বার ভার দিয়ে যায় তোমার উপর?'

—'পড়তে মন্দ লাগে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত—'

—'এই তো রচনার কথা বলছিলে, কিন্তু লেখোটেখো না কেন?'

—'লিখতে চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে।'

—'তারপর?'

—'পেরে উঠি না—'

—'কেন? দুপুরবেলা মেস তো বেশ নিরিবিলি।'

—'কবিতা লেখার ওপর আগেকার সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

—'কেন?'

—'মানুষের জীবন নানারকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আস্তে-আস্তে স্থূল হয়ে পড়ে যেন—অবসাদ আসে, সমাপ্তির গন্ধ পাওয়া যায় যেন...,' একটু চুপ থেকে—'নবপর্যায়ের কবিতা লিখবার আগে এই স্থূলতা ও অবসাদটাকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করে এর [অংশ] হওয়া দরকার। তাই এই কাগজ পড়ে, যা হয়েছে যা হয় নি সেই কথা ভেবে-ভেবে, জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি।'

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

—'তা হলে নব পর্যায়ের কবিতা লিখবে তো?'

—'হ্যাঁ লিখব বইকি?'

—'হ্যাঁ, লিখো, একটা কিছুতে বিশ্বাস রেখো,' বাবা বললেন, 'লাইব্রেরি থেকে বই এনে দুপুরবেলাটা পড়ো।'

—'আচ্ছা'

—'খবরের কাগজ বিশেষ পড়তে যেও না, এই রকম হতাশ পরিশ্রমের কাজ মানুষের জীবনে আর দ্বিতীয়টি নেই।'

বললেন—'লাইব্রেরি থেকে কী বই এনে পড়বে, সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার অধিকার আজ আমার নেই; যে-বই রুচিতে ধরে তাই পড়ো। কিন্তু লাইব্রেরিটা যেন উঁচু জাতের হয়, যেমনটি ধরো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি।' একটু চুপ থেকে—'এতদিন ধরে তুমি যা শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছ, তোমার যা শক্তি ও বিচার আছে, তাতে এ-সব লাইব্রেরির থেকে বই এনে পড়বার অধিকার পেলে নিজের চিন্তা বা কল্পনার অপব্যবহার করবে না তুমি—এই আমি আশা করি', —বলে উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকালেন।

আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে তারপর বলতে লাগলেন—'আমাদের সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেসে একা ঘরে তুমি দুপুরবেলাটা কাটাবে—যাদের কোনো কাজকর্ম নেই, জীবনে কোনো নিকট সফলতা নেই হয়তো, যারা অনেকদিন ধরে সংসারের কাছে বিড়ম্বিত হয়ে আসছে, যাদের হৃদয় শেষ পর্যন্ত বাস্তবিক স্থূল নয় কিন্তু সত্যিই খুব কুণ্ঠিত, নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চিত করবার শক্তি যাদের ঢের কম, আত্মপীড়িত করবার শক্তি খুব বেশি—এই দুপুরবেলার সময়টা তাদের কাছে কত যে যন্ত্রণার জিনিশ হতে পারে আমি তা খুব গভীরভাবেই বুঝি।'

কিছুক্ষণ থেমে থেকে শেষে বললেন, 'কিন্তু তবুও কয়েকটা কাজ করতে তোমাকে নিষেধ করছি আমি, তুমি করতে যেও না। চাকরি-বাকরি না পেয়ে অলস হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে মিছিমিছি নিজেকে নির্যাতিত করতে যেও না, তোমার চেয়ে অনেক কম শক্তি নিয়ে অজস্র লোক সংসারের কাছ থেকে ঢের বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে, কলকাতায় অহরহই এই জিনিশ দেখবে তুমি দুঃখ পেতে যেও না, কারু প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, ট্রাম-বাস-লরি মোটর ব্যস্ত-সমস্ত নিরবচ্ছিন্ন ভিড়ের সমাবেশ

নিয়ে কলকাতা শহরের কাজের চাকা দিনরাত ঘুরে চলেছে বলে নিজের মনের স্থৈর্য নষ্ট করে বোসো না, উত্তেজিত হয়ে সময়ে-অসময়ে ফুটপথে ঘুরে মরো না; কাজকর্মহীন লোকের পক্ষে কলকাতা থাকা একটা বিড়ম্বনা। ফ্যাকরা হচ্ছে এই যে চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্কে তারা মুহূর্তে-মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে ঠিকরে বেরোয়; নিজের প্রকৃত পথ ভুলে যায়, আগুনের মুখে দেওয়ালি পোকার মতো জীবনের যথার্থ সম্ভাবনাগুলোকে বারংবার অন্ধভাবে নষ্ট করে ফেলে। নিজের শক্তি ও রুচির পরিমাপ খুব গভীর ভাবে বিচার করে ঠিক করে নিও। নিজেকে যে-পথের উপযুক্ত মনে করো বস্তুনিষ্ঠ হয়ে সেই পথেই চলো। জীবনে আশা, আশাভঙ্গ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরিণামের হিশেবে অবঞ্চিত থেকে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়ো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বাবাকে আমি বললাম—'দেখেছ বাবা, কী রকম বৃষ্টি পড়ছে!'

—'হ্যাঁ'

—'দেশের এই বর্ষাকে জীবনের সত্তর বছর বসেই তো দেখলে।'

—'দেখলাম।'

—'পাড়াগাঁয়ের এই বৃষ্টি আমার খুব ভালো লাগে, বিশেষত এমনি রাতের বেলা।'

—'বেশ জিনিশ?'

মনে-মনে ভাবলাম, এই রাত আর বর্ষা যদি চিরকাল থাকত। এই বাঁশের জঙ্গলের বাতাস, ঘরের পাশের লেবু পাতার থেকে ছুপ-ছুপ জলের শব্দ, মাঠে-মাঠে ব্যাঙের কোলাহল, জাম, তেঁতুল ও কাঁঠালের ঠাণ্ডা ডালপালার অবিরাম শব্দ, কোনো তিমিরচারিণীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে প্রেতজীবনের প্রতিধ্বনির মতো দু-তিনটি দাঁড়কাকের অবশ বিহ্বল কলরব।

—'তুমি শুয়ে পড়েছ বাবা?'

—'না'

—'কী করছ?'

—'না, একটু আলো জ্বালিয়ে পড়ছি।'

—'রাতের বেলা পড়ো না, তোমার তো ক্যাটারেক্ট।'

বাবা একটু হেসে, 'তেমন সিরিয়াস ক্যাটারেক্ট তো নয়। ভগবান শিগ্‌গির অন্ধ করবেন বলে মনে হয় না।' একটু চুপ থেকে—'এই রাতের আলোতে চোখে তেমন খোঁচা লাগে না তো?' আরো খানিকক্ষণ চুপ থেকে, 'অবশ্য নীল চশমাটা পরেছি, চোখে বেশ আরাম লাগে।'

নীল চশমাটা অবিশ্যি সামান্য একটা এক টাকা দামের বাজারের জিনিশ।

কয়েক মিনিট পরে বই বুজিয়ে, বাতি নিবিয়ে, বাবা—জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে—'আহা, অনেক বিরহের পরে যেন এই মাঠঘাট, আম-কাঁঠালের জঙ্গল, এই করুণার সমুদ্রকে পেয়েছে।'

অঝোর শ্রাবণের দিকে তাকিয়ে জানলার পাশে খালি গায়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাবা, চিমসে রোগা চেহারা—জরাজীর্ণ চোয়াল, গাল, হাত-পা, ত্বক।

'জানলার কাছে দাঁড়িয়েছ, ঠাণ্ডা লাগবে তো তোমার।'

বললেন—'জানলা বন্ধ করে দেব?'

—'আমিই দিচ্ছি।'

নিজেই বন্ধ করলেন।

চেয়ারে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, পরে ধীরে-ধীরে বললেন—'এত বুড়ো বয়সেও স্ত্রী যে আমার বেঁচে আছে, রোজগারের জন্য বিদেশে-বিদেশে ঘুরতে হয় না যে আমাকে, এমনি নিরিবিলি শান্ত শ্রাবণের রাতে দেশের বাড়িতে নিজের বিছানায় যে শুয়ে থাকতে পারি—অনেকবার আমার জীবনের এই সব সমস্যার কথা ভেবেছি আমি; কিন্তু তবুও যতটা শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া উচিত ছিল তা পাই নি।'

দুজনেই চুপ করে ছিলাম।

—'দেশের বাড়িতে একাদিক্রমে সত্তর বছর কাটানো বড় কঠিন জিনিশ, একটু চুপ থেকে, 'যাক, কাটিয়ে দিয়েছি।'

বললেন—'তোমার মাও কাটিয়ে দিয়েছেন। বিধাতা যদি এসে বলেন, 'জীবনের পুনরাভিনয় করতে, বলি না, থাক, এখন ভবিষ্যতে আমাদের জন্য যা সঞ্চিত আছে তাই দাও।'

তেঁতুল গাছের ডালপালার ভিতর কয়েকটা বক বকবক করে ডেকে উঠল।

বাবা বললেন—'তোমার মা এখনো আসেন নি?'

—'না'

—'রান্নাঘরে আছেন?'

—'দক্ষিণের ঘরে মেজকাকার সঙ্গে গল্প করছেন বোধ করি'

—'বউমা কোথায়?'

—'খুকিকে নিয়ে ঘুমিয়েছেন দেখে এসেছি।'

—'তোমার ঘর আজ যে বড় অন্ধকার করে রেখে দিয়েছ, আলো জ্বালো নি যে?'

—'জ্বালি নি, এমনি।'

—'রোজই তো আলো জ্বেলে পড়াশোনা করো।'

—'আলোটা মেজকাকার জন্য নিয়ে গেছেন।'

—'কে?'

—'পিসিমা।'

—'কেন?'

—'মেজকাকার ও-ঘরের আলোর চিমনি ফেটে গেছে।'

—'ওঃ, তা হলে আমাকে আগে বলো নি কেন?'

—'আলোর দরকার বোধ করি নি আজ আর।'

—'লাগলে আমার দেরাজ থেকে মোমবাতি নিয়ে এসো।'

—'তা আনব।'

—'তোমার এদিকের জানলা খুলে রেখেছ দেখছি—'

—'দেখো, কেমন লেবুগাছের পাতা জানলার ভিতর দিয়ে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে, লেবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছ, বাবা?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ, অন্ধকারে কেমন একটু হালকা গন্ধ।'

একটা নিশ্বাস ফেলে—'এমনি পাড়াগাঁর এই সব রাত তোমার খুব ভালো লাগে

বুঝি?'

মনে-মনে ভাবছিলাম, অলস নিষ্কর্মা লোক, সংসারের পথ থেকে যে ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে, এ রাতগুলো তার পক্ষে কী যে পরম সুন্দর আশ্রয়ের জিনিশ। জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা যায়। যা পাওয়ার জন্য সারা জীবন মিছিমিছি পথে ঘুরেছি, হাতের কাছে কুড়িয়ে পাই—বেঁচে থেকে, বিছানায় শুয়ে, গড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন বিড়ম্বনাহীন রহস্যের আস্বাদ ভোগ করি—কী যে অপরূপ।

হেসে বললাম—'যতই বয়স বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভালো লাগছে আমার; চারদিকে এই আম-কাঁঠাল-লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ নিস্তব্ধতা, বিশেষ করে, এই আষাঢ়-শ্রাবণের রাতে, এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'

—'তা আমি বুঝি—'

বাবা—'এখনই-বা কলকাতা যাবার এত কী তাড়া তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'কিছুকাল থাকো এখানে, ভাদ্রমাসে যেও, কিংবা পুজোর পরে।'

মাথা নেড়ে—'না—অনেক দিন দেশে থাকলাম তো, কল্যাণীকে বলেছিলাম চার-পাঁচ দিন থাকব, প্রায় পাঁচ মাস কাবার করে দিলাম। এখন তার মুখের দিকে তাকাতেই ভয় করে। বেচারি আমার ভালোর জন্যই আমার উপর রাগ করে।'

—'ভাবে যে কোনোরকমে তোমাকে কলকাতায় পাঠালেই হল?'

—'হ্যাঁ। তারপর চাকরি আমাকে খুঁজে নেবেই।'

—'বহুদিন কলকাতা দেখি না, কে কোথায় বলতে পারো?'

—'না তো'

—আর বনলতার বাবা সেই কেদারবাবু—আচ্ছা এমন বন্ধু কি মানুষের এক জীবনের তপস্যায় জোটে? চল্লিশটা বছর পাশাপাশি আমরা কাটালাম। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাটির মতো মন, কত ক্ষণে-অক্ষণে আমার কাছে এসে বসেছেন। এমনি বৃষ্টির রাতেও কত গভীর রাত পর্যন্ত মুখোমুখি বসে আমরা আলাপ করেছি কিংবা চুপচাপ বসে রয়েছি।'

একটু চুপ থেকে—'আর বনলতা?' আমার দিকে তাকিয়ে, 'মনে হয় তার কথা তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'না। ভুলেই গেছ হয়তো।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বললেন, 'কিন্তু।' কিন্তু, এই বলেই চুপ করলেন, কথাটা বাবা আর শেষ করলেন না।

বললেন—'খুকি দুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিল?'

—'কী জানি?'

—'ওর মা-র আবার এদিকে দৃষ্টি নেই একটুও।'

—'দুধ না-খেলে কেঁদেই উঠবে।'

—'সে তো অনেক রাতে।'

—'মেয়ে কাঁদলে ওর মা বড্ড বিরক্ত হয়—মাঝে-মাঝে পাখার ডাঁট দিয়েও মারে। আমিই গিয়ে দুধ খাইয়ে আসব।'

—'অত রাতে গরম করে খাওয়াবে তো?'

—'হ্যাঁ, তা বইকি, দুধ গরম করে নিতে হবে।'

—'তাই করো; স্পিরিট ফুরিয়ে যায় নি?'

—'গেলে, কাগজ জ্বালিয়ে নেব।'

—'কেমন, গায়ে লাগে না যেন কিছু মেয়েটার; কেমন চিমটে বিড়ালের মতো চেহারা; মনে হয় যেন একটা শুকনো পাতা হাঁটছে, বাতাসের এক ফুঁয়ে যাবে উড়ে; আড়াই বছর বয়স হল, অথচ দেখে মনে হয় যেন এক বছরও পেরোয় নি। খেতে পায়? না, খেতে পায় না? না কিছু গুরুতর অদৃশ্য অসুখ? তুমি বললে—রাতে মাঝে-মাঝে টেম্পারেচার রাইজ করে?'

—'হ্যাঁ'

—'তা, কালমেঘটা খাওয়াচ্ছ?'

—'খাচ্ছে।'

—'তুমিই খাইয়ে দিও, বউমার উপর নির্ভর কোরো না, তা হলে হয়তো গাফিলতি হবে।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে—'মথুর ডাক্তার বললেন খাওয়াতে, আমি এনেছি একটা—'

—'আনলে বুঝি?'

—'ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় নিয়ে এলাম, কালমেঘটা ফুরুলে দিও এটা।'

—'আচ্ছা'

—'বউমা সন্ধের থেকে ঘুমুচ্ছে? খেয়েছিল?'

—'বিকেলে খেয়েছে।'

—'কী খেল?'

—'জলের মধ্যে খানিকটা তেঁতুল গুড় গুলে, দু-তিন হাতা পান্তা।' বলে হাসতে লাগলাম।

—'এই শুধু? আর-কিছু না?'

—'না'

—'রোজ এই রকমই করে,'

—'হ্যাঁ এই রকম।'

বাবা গম্ভীর মুখে—'অসুখ করেছে না কি?'

—'না'

—'তবে?'

—'এই রকমই ওর রুচি কিংবা আমার উপর হয়তো মান।' বাবা একটু চুপ থেকে—'বাঁচবার ইচ্ছে নেই?'

—'কী জানি।'

দু-চার দিন কেটে গেছে—কিন্তু তবুও কলকাতায় যাওয়ার কোনো চাড় নেই। কল্যাণী তেঁতুলের জল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু-চারটে মরিচ পুড়িয়ে নেয়, কোনোদিন উপবাস দেয়। কিন্তু তবুও এই সুখ ছেড়ে সহসা যাওয়া হয়ে ওঠে না। খুকি দুপুর রাতে রোজ কেঁদে ওঠে।

মা, বাবা, কল্যাণী কেউই কোনো সাড়াশব্দ করে না। তারপর কান্না বাড়তে থাকে,

পাখার ডাঁট দিয়ে পিটুনি শুরু হয়—তবুও নড়তে ইচ্ছা করে না বড় একটা।

বাবা বললেন—'খোকা, জেগে আছিস?'

—'আছি'

—'খুকি কাঁদছে—'

—'শুনেছি।'

—'মার খাচ্ছে মেয়েটা, আহা-হা।'

পাখার আরো কয়েক ঘা পড়ে।

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে গিয়ে—'তুমি যে একেবারে অমানুষ হয়ে গেলে, কল্যাণী।'

কল্যাণী খেঁকিয়ে উঠে—'আমি পরের মেয়ে, আমাকে গাল দিও না বলে রাখছি।'

খুকি থেমে যায়।

আমাকে দেখে বিছানার উপর উঠে বসে। আমি বলি, 'বোস, দুধ গরম করেছি।'

কল্যাণী—'রাত-দুপুরে বড় বাপ-মা তুলে গাল। অমানুষ। তোমাদের ওই ঘরে মানুষ কটা শুনি? ফের গাল দিয়েছ তো তোমার মেয়ের গলা টিপে আমি জলে ফেলে দিয়ে আসব।'

পাশের ঘর থেকে মা 'ছি ছি' করতে থাকেন; হয়তো কেঁদে ওঠেন, কিংবা নানা রকম কথা বলেন বধূমাতাকে।

বাবা বলেন—'তোমাদের সকলের মাথা খারাপ হল না কি?'

ঘরের মধ্যে শোরগোল—বিষ, ঝাল, মৃদু গুঞ্জন, নালিশ, ফোঁপানি, অশ্রু, অভিমানের জের অনেকক্ষণ চলতে থাকে।

খুকি খাটের এক কিনারে পা ঝুলিয়ে পাথরের মতো চুপচাপ বসে থাকে; বয়স আড়াই বছর, দেখায়, এক বছরের মতো; বিচার-কল্পনার শক্তি হয়তো চল্লিশ বছরের গৃহিণীর মতো; জীবনের আস্বাদ সত্তর বছরের মানুষের মত; এর ভবিষ্যৎ কী, আমি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারি না কিছু।

কাগজ জ্বালাবার দরকার হয় না, বাবা স্পিরিটের বোতল কিনে এনে দিয়েছেন। অসতর্কতায় অনেক স্পিরিট মাটিতে পড়ে যায়, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে স্পিরিট ঢেলে দেই, কাঠ ঘষে আগুন জ্বালাই, দুধ গরম করি, খুকি অবাক হয়ে একবার আগুনের দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশি গরম করবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তবুও মনের ভুলে অনেক গরম হয়ে যায়, উপযুক্ত মতন ঠাণ্ডা করে নিতে সময় লাগে, মেয়েটি যাদুমন্ত্রে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসে থাকে: বেতফলের মতো চোখ দুটো প্যাট-প্যাট করতে থাকে; হাত-পা, মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। এ সংসারের নানারকম সমস্যার কারণ যে সে, তা সে খুব ভালো করেই বুঝতে পারে।

দুধের বোতলের প্রয়োজন হয় না, ঝিনুকের দরকার নেই, বাটি সে নিজের হাতে তুলে নেয়, কিন্তু অসাড় দুর্বল হাত এই সামান্য বোঝাটুকুতেই কাঁপতে থাকে।

বাটিটা আমি ধরি—ধীরে-ধীরে চুমুক দিয়ে খায় সে। ধুতির খুট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেই তার।

একটু জল চায়—এনে দেই।

দেখি, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। ধীরে-ধীরে মুছিয়ে দেই। তার পর, আমার

সঙ্গে আমার বিছানায় চলে আসে সে।

মশারি তুলে ফেলি, পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকি, এতক্ষণে, আরামে, রুগ্ণ অবিশ্বাসী মুখে, খানিকটা ভরসা আসে তার। কৃতজ্ঞতার আলোকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর একটু হাসে।

হাসি মুহূর্তের মধ্যেই নিভে যায়, চোখ কেমন অসাড় ব্যথিত হয়ে আসে। বুঝি, বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে সে। হাত বুলিয়ে দেখি হ্যাঁ, ভিজিয়েই দিয়েছে সে অনেকখানি জায়গা। বলি—'বেশ করেছ, ভয় পাচ্ছিস কেন?' কিন্তু তবুও মুখ-চোখের বিবর্ণতা কাটে না।

—'বিছানা ভিজিয়ে দিলে মা তোমাকে মারে?'

কোনো উত্তর দেয় না।

—'পাখার ডাঁট দিয়ে পেটায়?'

নিশ্চুপ, নিঃসাড়; সলতের মতো হাত দুখানা তুলে নেই, সমস্ত গায়ে-পিঠে হাত বুলাই, মিঠাইয়ের দোকানের খানিকটা বাসি পরিত্যক্ত ময়দার মতো যেন, কারা যেন পিষতে-পিষতে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। হাত-পা-আঙুল কালিয়ে গেছে; কপাল-চুল ঘামে ভিজে গিয়েছে। দাঁড়কাকের ঘাড়ের ভিজে রোমের মতো কতকগুলো কালো পাতলা চুল।

ভিজে ইজেরটা খুলে ফেলে দি। বলি—'খুকি, মারব তোমাকে?'

চুপ করে থাকে।

—'পাখা দিয়ে লাগাই এক ঘা?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করে।

—'তবে আমার বিছানা ভিজিয়ে দিলে কেন? মারি?' পাখার ডাঁট তুলে ধরি। শিশুর হৃদয়ে কোনো ভাব খেলা করে বিদীর্ণ মুখে বড় একটা ফুটে ওঠে না। পাখার ডাঁটের দিকে একবার তাকায়, আমার মুখের দিকে একবার তাকায়, কপাল ও ভুরুর সরলতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঠোঁট নড়ে, বেতফলের মতো চোখ তুলে চালের বাতার দিকে নিগূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকে।

—'মা-র কাছে নিয়ে যাব?'

সহসা কোনো উত্তর দেয় না।

—'মা-র কাছে যাবি?'

—'না।'

—'এইখানে থাকবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে একটু সরে শোও।'

খানিকটা সরে যায়।

—'বালিশ লাগবে না?'

মাথা নেড়ে 'না' বলে।

—'ভিজের উপর শুলি যে—'

কিন্তু ভিজে জায়গায় শুতে কোনো আপত্তি নেই বেচারির, কোনোরকমে শান্তিতে, নিস্তব্ধতায় রাতটা কাটিয়ে দিতে চায় হয়তো, হয়তো ভবিষ্যতে জীবনটাও এই রকম ভাবেই কাটাতে চাইবে সে, ভবিষ্যৎও কী যে নিগূঢ়?

একে পৃথিবীতে আনবার জবাবদিহি কাকে বহন করতে হবে—আমাকে না বিধাতাকে?

হ্যাঁ, বেছে ভিজে জায়গাটায় গিয়ে শুয়েছে, হয়তো নিজের কৃতকার্যের ফল নিজেই বহন করতে চাইছে; হয়তো আমাকে অযথা অসুবিধায় ফেলবার কোনো ইচ্ছে নেই, হয়তো এই রকম ভয় ও দীনতাই এর রক্ত-মাংসে দিয়েছেন বিধাতাও, হয়তো....

'বিছানা ঠিক করে দিচ্ছি? ওঠ্ তো—'

বলামাত্র বিনা দ্বিধায় উঠে বসে।

পাঁজাকোলা করে ধরে তাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেই। ভিজে চাদরটা মুড়ে তুলে নিয়ে, তোশকটা উলটে দিলাম। তারপর আলনার থেকে আমার গায়ের খদ্দরের চাদরটা এনে পাতি।

শোলার পুতুলের মতো অন্ধকারের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, আবার তুলে উঠিয়ে দিলাম। বললাম, 'কেমন রে এখন শুতে বেশ আরাম, না?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ'

তেমন বিশেষ কোনো সজীবতা নেই মুখে।

কেমন কাতর ভাবে পা চুলকুচ্ছিল।

—'পায়ে হল কী তোর?'

—'পিঁপড়ে।'

—'পিঁপড়ে কোত্থেকে এল আবার?'

—'মাটিতে।'

দেশলাই জ্বালিয়ে দেখলাম কতকগুলো বিষ-পিঁপড়ে বেচারির গায়ের নানা জায়গায় কামড়াচ্ছে।

—'এত কামড় খেলি? তবুও আগে বলতে পারলি না? কামড়ে যে লাল করে দিয়েছে রে?'

বাবা বললেন, 'কীসে কামড়েছে রে খোকা?'

—'কিছু নয়, পিঁপড়ে।'

—'পিঁপড়ে? আর-কিছু নয় তো?'

পিঁপড়ে ছাড়াতে-ছাড়াতে—'না।'

মা—'মাকড়সা নয় তো রে, মাকড়সা?'

—'না গো না।'

—'দেখিস ভালো করে, মাকড়সার কামড়ে বড্ড বিষ।'

তাকিয়ে দেখি, কল্যাণী নিঃশব্দে বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের। চোখের নিদ্রাল্পতা হঠাৎ যেন গেছে কেটে, খানিকটা ভয়জড়িত কণ্ঠে বললে—'কী হল আবার?'

—'বসো'

—'খুকির কিছু হয়েছে নাকি?'

—'এই পিঁপড়ের কামড় খেয়েছে আর কী?'

—'ঠিক দেখেছ তো, পিঁপড়ে?'

—'হ্যাঁ'

—'পিঁপড়ে? আর-কিছু নয়?'

—'না'

—'কই? দেখি—?'

দেশলাইটা জ্বেলে আবার দেখলাম।

—'এঃ, লাল-লাল চাকা-চাকা দাগ পড়ে গেছে যে একেবারে।'

—'নরম মাংস কিনা।'

গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে—'এ যে অনেক কামড়। কোত্থেকে কামড়াল? আঃ, তোমার দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল দেখছি।'

আবার জ্বালালাম।

—'এ পিঁপড়ে? না বিছে?'

—'না, বিছে নয়—'

—'ভালো করে দেখেছ তো? বর্ষাকালে কত কী যে থাকে, আহা বেচারি, কিসে কামড়েছে তোমাকে মা?'

—'তা, ওকে তুমি নিয়ে যাও তাহলে এখন—'

—'কেন দু-দণ্ড রাখতে নিয়ে এতই অসহ্য হয়ে উঠল?'

—'না, তা নয়—'

—'তা বইকি। তুমি মনে করো, মেয়ের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।' দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল।

—'নিভিয়ে দিলে?'

—'না, নেভাই নি—'

—'তবে?'

—'এমনি গেল নিভে।'

—'বাতাসে?'

—'না, ছোট্ট একটা কাঠি কতক্ষণ আর জ্বলবে?'

—'মশারি গুটিয়ে রেখেছ?'

—'বড্ড গরম।'

—'তাই বলে মশারি গুটাতে হয়, খোলা বিছানা পেয়ে রাজ্যের যত পোকা-মাকড় এসে ঢুকবে।'

মশারি সে ফেলে দিতে গেল।

—'আমিই ঠিক করে নেব, কল্যাণী।'

—'তোমার লণ্ঠন কোথায়? নিভিয়ে ফেলেছ?'

—'না—'

—'ঘরে লণ্ঠন রাখো না কেন তা হলে?'

—'বাবার দেরাজে মোম আছে, নিয়ে এসো না লক্ষ্মীটি।'

—'আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। পা নাড়তে ইচ্ছা করে না আর—সত্যি বলছি।'

বিছানার এক কিনারে পাথরের মতো বসে রইল কল্যাণী।

—'তা হলে তোমার ঘরের লণ্ঠনটা দিয়ে যাও।'

—'আর, আমি অন্ধকার ঘরে থাকব? আমার বেলায় এই রকমই তোমার ব্যবস্থা।'

বিছানার আর-এক প্রান্তে বসে চুপ করে ছিলাম।

কল্যাণী—'তা কি আমি আজ থেকে জানি? অনেকদিন থেকেই জানি। এ রকম জানলে—'

মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সে।

আমি চুপ করে বসে ছিলাম। চটি জুতোর শব্দে চমক ভাঙল।

তাকিয়ে দেখি বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতির খুট গায়ে, খুটের ভিতর থেকে একটা মোম বের করে বললেন, 'এই নাও। খুকি কি ঘুমিয়েছে?'

—'ঘুমুচ্ছে বোধ করি।'

—'হ্যাঁ ঘুমোক। মশারিটা ফেলে দিও। ফেলবার আগে মোম জ্বালিয়ে ভালো করে বিছানাটা একবার দেখে নিও।'

কল্যাণীর পিঠে আস্তে-আস্তে দু-তিন বার হাত বুলিয়ে চলে গেলেন তিনি।

কল্যাণী চাপা গলায়—'এ কী ভয়ানক অন্যায় তোমার বাবার।'

—'কী রকম?'

—'আমি এখানে আছি। অথচ তিনি এ ঘরে ঢুকলেন।'

—'সহজ ভাবেই ঢুকেছেন।'

কল্যাণী মাথা নেড়ে—'আমার নিজের বাবা হলে এ-রকম অবস্থায় কিছুতেই ঢুকতেন না।'

—'খুকিকে বড্ড ভালোবাসেন কি-না বাবা।'

—'তা হোক—তাই বলে এত রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর ঘরে একজন পুরুষমানুষ হয়ে ঢুকবেন তিনি?'

কল্যাণী চোখ কপালে তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

—'সত্তর বছরের বুড়ো মানুষের পক্ষে এ জিনিশ এমন কিছু অশোভন নয়।'

—'তুমি তাই মনে করো। রুচি-শোভনতার এর চেয়ে ভালো নমুনা তো কোনোদিন দাও নি।'

—'ছি, আস্তে। শুনলে কী মনে করবেন তাঁরা।'

—'আমার বাবা হলে—হোক না মেয়ে-জামাই, তাদের ঘরের ত্রিসীমানায়ও আসত না এত রাত্রে।'

একটু চুপ থেকে, 'আমার বাপের বাড়ির রুচি-সংযম তোমরা সে-সবের কল্পনাই বা করবে কী করে। অবাক হয়ে ভাবি, কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি।' বাবা তার বিছানার থেকে গলা খাঁকরে—'আমার মনে হয় তোমার ঘরে বাতাসা কিংবা গুড়ের টুকরো পড়েছিল হেম।'

—'তা হবে।'

—'হ্যাঁ, তার গন্ধে-গন্ধে বিষ-পিঁপড়ে এসে জমেছে।'

—'তাই মনে হয়।'

মা বললেন—'বর্ষাকালে অনেক সময় পোকা-ফড়িং মরে থাকে, দেখিস নি খোকা?'

—'হ্যাঁ দেখেছি।'

—'সেই জন্য এত পিঁপড়ে হয়।'

—'তা ঠিক। কাল ঘরটা ভালো করে ঝাড় দিয়ে ফেলতে হবে।'

—'হ্যাঁ খুব ভালো করে।'

বাবা—'ও, ওই যে বাতি নিয়ে পড়ি না আমরা রাত্রে, তখন লণ্ঠনের চার পাশে অনেক পোকা মরে থাকে, সেইজন্যই এত পিঁপড়ে জমে বুঝি?'

মা—'হ্যাঁ, বিশেষত এই বর্ষার সময় অন্য কোথাও খাবার পায় না কি-না।'

দুজনেই নিস্তব্ধ।

কল্যাণী হাই তুলে—'বাবা, হাত-পা অবশ হয়ে আসছে ঘুমে। সাপে খেল, না ব্যাঙে খেল দেখতে এলাম। অলক্ষুণে মেয়ে, ওকে কারা কাটবে? সারাটা জীবন মানুষের হাড় চিবিয়ে কে খাবে তবে আর?'

ঘুমের চোখে বিড় বিড় করতে-করতে চলে গেল কল্যাণী। মিনিট তিন-চারের মধ্যে সব চুপচাপ।

বিছানায় খুকির পাশে শুয়ে বললাম—'ব্যথা না কি রে?'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

পিঠের কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

—'চুলকে দেব?'

মাথা নেড়ে—'চুককে দাও।'

আস্তে-আস্তে হাত বুলতে লাগলাম।

—'কিসে কামড়েছে তোমাকে খুকু?'

—'পিঁপড়ে'

—'কেন কামড়াল?'

মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উত্তর দেবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু বাক্য জুগিয়ে ওঠে না।

'পিঁপড়ে কোথায় আছে খুকু?'

—'মাটিতে।'

—'সেখানে কেন গিয়েছিলে তুমি?'

এক পা তুলে চুলকুতে-চুলকুতে বিজ্ঞমুখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'তোমার নাম কী?'

—'কুকুলানি'

—'রানীও আবার?' চোখ দিয়ে বিরস ব্যথিত মন্তব্য কেটে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

—'কে রেখেছে নাম?'

—'দাদু'

—'লানি নয়, রানী'

—'লানি'

—'নারে, রানী'

—'লানি'

ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন রাত্রে ঝড়-জল, ভয়ানক।

বিকেল থেকেই শুরু হয়েছে, রাত দশটার সময় বাবা এসে বললেন—'খেয়েছিস খোকা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার মেজকাকা খেয়েছেন?'

—'খেয়েছেন।'

—'তার খাবার সময় আমি যেতে পারি নি। খাতা দেখছিলাম। ঢের খাতা, কাল হয়তো ইনস্পেকশন হবে স্কুলে।'

—'ইনস্পেকটর আসবেন বুঝি?'

—'আসবার তো কথা; সন্ধ্যার থেকেই ছেলেদের খাতা-পত্র নিয়ে বিব্রত ছিলাম তাই।'

একটু চুপ থেকে—'যা দুর্যোগ আজ। স্কুলের থেকে এসে দক্ষিণের ঘরে আর যেতে পারি নি তাই। তা তুমি তোমার মেজকাকার খাবার সময় ঘরে ছিলে তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'তত্ত্বাবধান করেছিলে?'

—'করেছিলাম। পিসিমা আসেন, আমার না-থাকলেও চলে।'

—'তবুও থেকো।'

—'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

—'তিনি তো ঘরে বসেই খেলেন?'

—'হ্যাঁ ঘরেই খান—'

—'টেবিলে?'

—'হ্যাঁ—'

—'কে এনে দিল?'

—'মা।'

—'কী খেলেন?'

—'মেজকাকা আজ খিচুড়ি খেতে চেয়েছিলেন।'

—'হ্যাঁ, এমনি বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে খিচুড়িই তো খায় মানুষে।'

—'তুমি কী খেলে?'

—'আমি দুটো ভাতই খেলাম।'

—'কী দিয়ে?'

—'এই পুঁইচচ্চড়ি না কী করেছিল আর কাঁচা মুগের ডাল।'

—'রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে এলে?'

—'হ্যাঁ, ছাতা আছে; ব্যাস। এত ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তোমার মা কত দিক টানবেন? সুরেশকে খিচুড়ির সাথে ঘি দিয়েছিল তো?'

—'হ্যাঁ। মা-র সে-সব ঠিক আছে।'

—'আর, আলু ভাজা বুঝি?'

—'ইলিশ মাছ ভাজা'

—'বেশ গরম-গরম ছিল তো?'

—'খাবার সময় ভেজে দেওয়া হয়েছে, পিসিমার স্টোভে।'

—'বেশ, তা সুরেশ খানিকটা খেতে পারল তো? আমাদের সংসারের রান্না চল্লিশ বছর ধরে সে বড় একটা খায় না—কী দিয়ে রান্না হয় কলকাতায়, পাকা মুসলমান বাবুর্চি রান্না করে দেয়—তাই বড় সঙ্কোচ হয় তাকে খাওয়াতে।'

—'ও, ছোটকাকা প্রায় ছোট এক ডেকচি আন্দাজ খিচুড়ি খেয়ে ফেলেছেন।'

—'খেলেন?'

—'হ্যাঁ। খুব তৃপ্তির সঙ্গে, ইলিশ মাছ ভাজা, ফুল ভাজা, ডিমের ওমলেট, পেঁপের টক, ছানার পায়েস।'

বাবা একটু হেসে—'যাক্, আজকের রাতের যজ্ঞ শেষ হয়েছে তাহলে তোমার মা-র।'

—'হ্যাঁ'

—'সুরেশের হজম হয় তো?'

—'হজমের জন্য মেজকাকার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।'

—'কী?'

একটু চুপ থেকে, 'খাওয়ার পর কী যেন খান।'

—'আহা, তা সোডা ওয়াটার এনে দিলেই হত সুরেশকে।'

—'আমি বলেছিলাম, সোডা ওয়াটারের কথা, মেজকাকার বিশ্বাস, কলকাতা ছাড়া আর-কোথাও ভালো সোডা ওয়াটার পাওয়া যায় না।'

বাবা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'বউমা আজও কি সন্ধের থেকে ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ'

—'খেয়েছে তো?'

—'বিকেলেই খেয়েছে—'

—'কী যেন?'

—'পান্তা ভাত, মরিচ পোড়া, আর সেই তেঁতুল গুড়ের ঝোল।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে, 'বউ কি আমাদের চোখের সামনে হত্যা দিয়ে মরতে চায়?'

—'না মরবে না'।

—'মরবে না? এই খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? আমার কী যে কষ্ট হয় হেম।'

—'মানুষের প্রাণ ঢের শক্ত। কলকাতায় কত লোক ফুটপাতের এঁটো কুড়িয়ে খায়।'

—'কিন্তু তাদের যে বাঁচবার আগ্রহ। তারই জোরে বেঁচে থাকে ওরা। এই মেয়েটি যে'—বাবা বললেন—'তোমাকে ভালোবাসে না?'

—'জীবনের প্রতিই কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে যেন।'

—'তুমিই বীতশ্রদ্ধ হয়েছ নাকি?'

—'জীবনের ওপর?'

—'বউয়ের ওপর?'

—'নাঃ, বড় কষ্ট হয় ওর জন্য আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন—'দেখো, কলকাতায় গিয়ে কোনোরকম একটা চাকরি জোগাড় করতে পারো নাকি। না-হলে এই নারীটিকে বাঁচানো বড্ড শক্ত হবে।'

একটু চুপ করে থেকে—'খুকিকে আজ ন-টার সময় দুধ খাইয়ে দিয়েছি।'

—'এখন শোবে?'

—'কে আমি? হ্যাঁ, এই শুয়ে পড়ি আর-কী—'

—'কিছু পড়বে-টড়বে না বুঝি আর?'

—'নাঃ, আর পড়ে কী হবে?'
—'তা, খুকিকে তোমার কাছে নিয়েই শোও। ওর মাকে একটু সুস্থিরে ঘুমোতে দাও।'
—'যাই, নিয়ে আসি।'
—'তোমার মা কোথায়?'
—'দক্ষিণের ঘরে।'
—'কী করছেন?'
—'মেজকাকার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।'
—'খেয়েছেন?'
—'বোধ করি খেয়েছেন—'
—'ফিরবেনই-বা কখন?'
—'এই বারোটা সাড়ে-বারোটা—'
—'কেন? এত রাত হবে কেন?'
—'মেজকাকা অনেক রাত অবধি গল্প করতে ভালোবাসেন।'
—'তা পিসিমাই তো আছে।'
—'মাকেও চাই।'

কল্যাণী—'কে?'
—'তুমি জেগে আছো?'
—'বাপরে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—'
আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে, 'না-বলে-কয়ে অন্ধকারের মধ্যে, এই রকম ঢুকতে হয় না কি?'
—'ভেবেছিলাম তুমি ঘুমুচ্ছ—'
—'ঘুমুচ্ছিলামই তো—'
—'এসে তো দেখছি চোখ চেয়ে জেগে রয়েছ—'
—'তোমার পায়ের শব্দে তো জেগে গেলাম।'
—'আচ্ছা, এরপর পা টিপে-টিপে আসব।'
—'না, ঘরে বাতি নিবে গেলে তুমি আর আসতে পারবে না।'
—'সন্ধের থেকেই তো বাতি নিবিয়ে শুয়ে থাকো।'
—'এই আমার খুশি, তুমি এসো না।'
—'সারারাত এত ঘুমুতে কষ্ট হয় না?'
—'বকবক কোরো না, কাজে যাও এখন—'
—'কী খেয়েছিলে আজ?'
বালিশে মুখ গুঁজে দাঁত কপাটি হয়ে পড়ে রইল কল্যাণী। দেখলাম, কাঁদছে।
—'একী, কী হল তোমার আবার?'
—'থাক, আমার খোঁজ নিয়ে দরকার নেই।'
বিছানার পাশে বসতেই, কেঁদে ফুলতে-ফুলতে—'তুমি ওঠো।'
—'একেবারে ঘামিয়ে গেছ যে—'
—'তবুও কথা বলবে? কথা বলতে বলি নি তোমাকে—'

—'সন্ধ্যার থেকেই কি জেগে আছ?'
—'আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দেবে?'
—'কেন মেজকাকারা তো দক্ষিণের ঘরে খুব হইচই করছেন, শুনছ না?'
—'করুক। তাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'
—'কই, মেজকাকার খাওয়ার পাশে একদিনও তো তুমি দাঁড়ালে না, কল্যাণী।'
—'আমার দাঁড়ানোর কী প্রয়োজন?'
—'তিনি বললেন বউমাকে তো বড় একটা দেখা যায় না।'
—'আচ্ছা,' ঠোঁট উলটে কল্যাণী—'হয়েছে।'
—'আমি বলেছি, তপস্যা না করলে বউমাকে দেখা যায় না।'
—'তোমার পায়ে পড়ি, কথা শুনতে ভালো লাগে না এখন আমার।'
—'আচ্ছা, কথা কইব না আর।'
—'বসে রইলে যে?'
—'চুপচাপই তো বসেছিলাম। তুমি কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'
—'তুমি এখন যাও।'
—'কোথায়?'
—'তোমার ঘরে।'
—'গিয়ে কী করব?'
—'যা খুশি তাই করো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।'
ধীরে-ধীরে তার কপাল থেকে হাত খানা সরিয়ে দিল আমার।
বললাম—'তোমার কপাল তো খুব গরম।'
কোনো উত্তর দিল না।
—'আচ্ছা, বুকটা একটু দেখতে দেবে?'
আবার ঠোঁট কামড়ে কান্না।
অনেকক্ষণ কান্নার পর বললে—'মাথার থেকে হাতটা সরিয়ে নেবে?'
ধীরে-ধীরে চুলের থেকে হাত তুলে নিলাম।
—'এখনো বসে আছো?'
কোনো উত্তর দিলাম না।
মৃদু, অবরুদ্ধ কণ্ঠে—'আচ্ছা এইবার যাও, অনেকক্ষণ তো বসলে।'
ধীরে-ধীরে কল্যাণীর বাঁ হাতটা তুলে নিলাম।
—'কবরেজের মতো নাড়ী না দেখলে চলবে না তোমার?'
—'তোমাকে ঢের জ্বালালাম কল্যাণী।'
ঘাড় হেঁট করে চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে রইলাম—কল্যাণীর হাতের ভিতরকার নাড়ীর শব্দ। অন্ধকারে কাশের শব্দ।
—'উঠলে?'
—'হ্যাঁ'
—'বুক দেখতে চেয়েছিলে না?'
মাথা হেঁট করে—'থাক্।'
—'কেন? দেখো, তুমি আমার স্বামী, দেখবেই-বা না কেন?'
হাত ধরে বিছানার পাশে আমাকে বসালে ধীরে-ধীরে—'আমি চলে যেতে বললেই

কি চলে যেতে হয়?'

একটু চুপ থেকে—'কথা বলছ না যে?'

আমার গালে একটা টোকা দিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল কল্যাণী।

বললে—মজের সেফটিফিন কটা খুলে—তার পর, 'নাও, বুক নিয়ে কত পরীক্ষা করতে পার দেখো।'

সেফটিপিন খুলে দাঁত কামড়ে—'নাও তোমার বুক।'

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

কল্যাণী, 'কেমন দেখলে? খুব গরম?'

একটু হেসে—'যা দেখলাম তা তোমাকে বলব কেন কল্যাণী?'

—'ভালো কথা; দেখা তো হল, এখন সেফটিপিনটা আটকে দি?'

—'দাও।'

—'তোমার মাথাটা আমার বুকের ওপর একটু রাখবে?'

—'মিছিমিছি কী আর দরকার?'

—'কিন্তু আমার যদি ভালো লাগে?'

—'আচ্ছা বেশ।'

কল্যাণী মাথাটা সরিয়ে দিয়ে, 'না না থাক্।'

—'কেন?'

—'না আমার আর প্রবৃত্তি নেই।'

তাড়াতাড়ি সেফটিপিন দিয়ে শেমিজ আটকে ফেলে বললে—'তেঁতুল আর মরিচপোড়া দিয়ে ভাত খাই বটে—কিন্তু অনেকগুলো ভাত খাই। খিদেও আছে—মরব না, ভয় নেই। তুমি এখন ঘরে গিয়ে সুস্থিরে ঘুমোতে পার।'

নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি দেখে, কল্যাণী, 'আচ্ছা বেশ, কাল থেকে না হয় পান্তা তেঁতুল আর খাব না।'

—'কী খাবে?'

—'যা খাওয়াবে তাই খাব।'

—'পোলাও, মাংস খাওয়াবার শক্তি তো আমার নেই।'

—'চাইও না; কোনোদিন আমাকে মাংস খেতে দেখেছ?'

—'মাংস পেলে তো খাবে।'

—'এ তিন বছরে অন্তত সাত-আট বার এ বাড়িতে মাংস আনা হয়েছে', কল্যাণী একটু হেসে, 'এমন কোনো ঠাকুর-বাবুর্চি পাবে না তুমি কোনো দেশে, এমন কোনো মশলা পাবে না তুমি পৃথিবীতে যার রান্নার গুণে মাংস আমার কাছে তৃপ্তির জিনিশ হয়ে উঠবে কোনোদিন।'

—'ভালো তো, কিন্তু যাক্ সে কথা, কিন্তু আমরা যা খাই তাই খাবে কাল থেকে।'

—'আচ্ছা।'

—'একলা খাবে না।'

—'না।'

—'আর একটু দুধ খাবে।'

—'দুজনে খাব নিশ্চয়ই।'

একটু চুপ থেকে কল্যাণী, 'কিন্তু মাঝে-মাঝে পান্তা আর তেঁতুল খাব।'

—'কেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে।'

—'হয়তো এর উত্তর আমিই জানি।'

—'কেউ জানে না—কারু জানার সাধ্য নেই।'

একটু চুপ করে থেকে কল্যাণী—'তুমি যদি রাজপুত্র হতে আর আমি যদি তোমার রাজপ্রাসাদে থাকতাম, তা হলেও এই পান্তা আর মরিচ খাওয়া ও অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কান্না ঘুচত না আমার।'

—'কী যেন ভাবছিলাম।'

কল্যাণী—'মা এসেছেন?'

—'না'

—'কোথায়?'

—'দক্ষিণের ঘরে'

—'মেজকাকাদের সঙ্গে গল্প করছেন এখনো?'

—'হ্যাঁ'

—'রাত তো কম হয় নি।'

—'না, কম হয় নি।'

—'বাবা শুয়ে পড়েছেন?'

—'হ্যাঁ অনেকক্ষণ।'

—'ঘুমিয়েছেন?'

—'তা বলতে পারব না—হয়তো ঘুমোন নি।'

—'কী করে বুঝলে?'

—'ঘুমোলে একটু মৃদু নাকডাকার শব্দ পেতাম। খানিক আগে গলা খাঁকরানির শব্দ পেলাম?'

—'আমার মনে হয় বাবা বড্ড একা।'

—'কী রকম?'

—'সারা দিনরাতের মধ্যে মা তার সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না?'

মাথা হেঁট করে চুপ করেছিলাম।

কল্যাণী—'এই তিন বছর ধরেই তো দেখছি আমি, মা বরং পিসিমার সঙ্গে গল্প করবেন, বরং পাড়ায় যাবেন, বরং রাত জেগে কাকাদের সঙ্গে গল্প করবেন, তবুও বাবার সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবেন না।'

'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'এই জন্য বাবার মনে কেমন একটা ব্যথা আছে—তুমি যখন কলকাতায় চলে যাও। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবার ইস্কুল যায় বন্ধ হয়ে, সারা দিন-রাত কী ভয়াবহ একাকী ভাবে তিনি যে কাটান, তা আমি তোমাকে বলে শেষ করতে পারব না। খাঁচার পাখিও এর চেয়েও ঢের আনন্দে থাকে।'

—'আমাদের সকলের জীবনই তো এক একটা খাঁচা।'

—'তা বলতে পার।'

কল্যাণী বিমর্ষভাবে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইল।

—'যাক্, মা তবুও তোমার মতো তেঁতুলের অম্বল দিয়ে পান্তা খান না, কিংবা

কপালে একটা বোনা দিয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে যখন-তখন কাঁদেন না।'

একটু চুপ থেকে—'আমাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে থাকলেও অন্ধকারে নিজের কোঠায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে? তাই তো বললে—কেন, কী, ব্যাপার কী কল্যাণী?'

একটু চুপ থেকে, 'এই নারী—যাক শুনতে চেও না বড় কষ্ট পাবে তা হলে।'

—'আমাকে ভালোবাস না এই তো কথা; কিংবা অন্য কাউকে ভালবাসো।'

কল্যাণী মুখে-কপালে কাপড় টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুল—কপালের যতটুকু দেখা যাচ্ছিল জরাজীর্ণ মানুষের মতো কুঁচকে রয়েছে।

ধীরে-ধীরে খুকিকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেলাম আমি।

বিছানায় আমার পাশে শুইয়ে মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম চোখ চেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

—'তুই জেগে আছিস যে রে'

—'বিত্তি'

—'হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম, কেমন লাগে?'

—'বাবা।'

—'কী মা?'

—'মিছছি কোথায়?'

—'মিছরি?'

—'মিছছি খাব।'

—'এখন খায় না মা।'

—'বোতলে আছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'খাব।'

—'কাল সকালে খেও।'

—'মিছছি খাব।'

—'সকালবেলা দেব কাল।'

—'বাবা।'

—'কী মা?'

—'মিছছি খাব।'

একটু চুপ থেকে—'মিছরি খেলে পিঁপড়ে কামড়ায়।'

জীবনী শক্তি ঢের কম; পিঁপড়ের কথা শুনে নিস্তব্ধ হল।

মাথায় হাত বুলতে-বুলতে—'তোমার নাম কী খুকু?'

মনের অবসাদে সহসা কোনো জবাব দিল না।

—'কী নাম তোমার?'

অন্ধকারের ভিতর দু-তিনটে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে—'আমাল নাম?'

—'হ্যাঁ'

—'কুকুলানি'

এমন নিরপরাধ, এমন মিষ্টি অথচ এমন মর্মস্পর্শী।

অন্ধকারের ভিতর আমার চোখের জল দেখল না মেয়েটি। ধীরে-ধীরে বললাম—'খুকুরানী'

—'কী?'
—'তুমি কাকে ভালোবাস?'
—'দাদুকে।'
—'আর কাকে?'
—'ঠাকুনকে।'
—'আর কাকে?'
একটু চুপ থেকে—'বাবাকে।'
—'বাবা কোথায়?'
অন্ধকারের ভিতর কচি-কচি হাত আমার চোখ-নাকের উপর বুলিয়ে দিয়ে 'এই যে বাবা?'
—'মাকে ভালোবাস না?'
—'দাদুকে ভালোবাসি'
—'মাকে?'
—'দাদুকে ভালোবাসি'
—'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'
—'না—নিয়ে যাবে না।'
শীর্ণকণ্ঠে উত্তেজনার আওয়াজ বেজে উঠল, 'নিয়ে যাবে না শেয়ালে।'
সন্ত্রস্ত হয়ে বললে—'বাবা—'
—'কী?'
—'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে না?'
—'না।'
—'মাকে ভালোবাসি যে আমি।'
—'বেশ।'
—'রামুকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'
—'রামু কে?'
উদ্ধত হয়ে—'নিয়ে যাবে শিয়ালে রামুকে।'
একটু ভেবে—'নন্দুকে নিয়ে যাবে।'
আর একটু ভেবে—'বুলুকে নিয়ে যাবে।'
শিশুর মনের এই অন্ধকার স্রোত ফিরিয়ে দেবার জন্য—'না, কাউকে নিয়ে যাবে না রে।'
—'নেবে না?'
—'না, শেয়াল নেই।'
—'নেই?'
নিস্তব্ধভাবে জিনিশটা উপলব্ধি করতে লাগল সে।
গায় হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ গরম।
বললাম—'তোমার জুতো কই খুকুরানী?'
—'নেই।'
—'বাবা কিনে দেয় নি?
—'না,'

—'খালি পায় মাটিতে হাঁটো?'
—'হ্যাঁ।'
—'ঠাণ্ডা লাগে যে?'
—'আমার বোতল ভেঙে গেছে।'
—'কিসের বোতল?'
—'দুধের। দাদু কিনে দেবে আবাল।'
—'জুতো কে কিনে দেবে?'
—'দাদু।'
—'তাই তো, দাদু তোমার জীবনের বড় মূল্যবান জিনিশ, যখন বড় হয়ে উঠবে তুমি, না থাকবে দাদু, না থাকবে ঠাকুমা, তখন কী করবে তুমি?'

মেয়েটি প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিক যেন বুঝেছে, খানিক বোঝে নি। ভবিতব্যতার অন্ধকারে ঘেরা এই পৃথিবীর পথে চলতে চলতে এক-একটা ইঁদুরের ছানার অবস্থা মাঝে-মাঝে যে-রকম হয়—তেমনি হয়েছে এই মেয়েটির।

—'খুকু একটা ছড়া শুনবে?'
—'ছড়া কী?'
—'কবিতা।'
—'কোপাতা কী?'
—'শোনো।'
—'খুকুরানী-খুকুরানী অন্ধকার রাতে'
—'বাবা'
—'কী মা?'
—'আবার বলো—'
—'আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে বলো—খুকুরানী-খুকুরানী, বলো'
—'কুকুলানি—কুকুলানি'
—'অন্ধকার রাতে'
—'অন্ধকার লাতে'
—'অনেক কথা বলেছিস—এখন ঘুমো।'
—'জল খাব বাবা।'
একটু জল গড়িয়ে এনে দিলাম।
গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম উষ্ণতা আরো বেড়েছে যেন।
—'খুকু'
—'উঁ?'
—'ব্যথা করে?'
—'বেথা কোলে।'
—'কোথায়?'
—'বাতাস দাও।'
বাতাস দিতে-দিতে—'খুকুরানী।'
—'উঁ'
—'আমি কলকাতায় চলে যাব যে—'

আমার গলা জড়িয়ে ধরে—'না।'

—'তুমি দাদুর কাছে থাকবে—'

—'না দাদুকে শেয়ালে খেয়ে ফেলেছে।'

একটু হেসে—'তা হলে ঠাকুরমার কাছে থাকবি।'

—'উঁহু না—ঠাকুনকে শেয়ালে নিয়ে গেছে যে।'

—'মা-র কাছে থাকবি।'

উৎপীড়িত হয়ে—'না, থাকব না।'

—'মিছরি দেবে যে মা, দেবে, লবেনচুশ দেবে, বিস্কুট দেবে।'

লুব্ধ চোখ অন্ধকারের ভিতর ঘুরতে লাগল।

—'আমি কলকাতায় চলে গেলে মা তোমাকে মিছরি দেবে, লজেন পাবি, বিস্কুট পাবি।'

—'বিসকুট।'

—'থাকবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কার কাছে?'

—'মা-র কাছে।'

—'আমি কলকাতায় চলে যাব যে।'

—'হ্যাঁ তুমি চলে যাবে।'

—'আর আসব না?'

মাথা নেড়ে বললে—'না আর আসবে না।'

দেখলাম মুখের ভিতর কোনো ভাব পরিবর্তন নেই।

কলকাতায় যাওয়া যে কী, যাওয়া-আসারই বা কী মানে, তা বুঝবার মতো বোধ এখনো হয় নি।

—'আর আসব না যে খুকি।'

—'না—'

—'কলকাতায় চলে যাব, আর আসব না—'

মাথা নেড়ে—'না আসবে না। দাদু আছে, ঠাকুন আছে, মা আছে, ভুলু আছে, রবি আছে, খোকন আছে।'

—'আর বাবা?'

'রবি, ভুলু, খোকন, মিনু আছে, খেলা করবে।'

আজকের জন্য এর এই রকম, ভবিষ্যতে এমনি কোনো ভবিতব্যতার বেদনায় কিংবা সফলতার শান্তিতে হারিয়ে যাবে তুমি—কোলাহলে-কোলাহলে দূরের থেকে দূরে তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলব, আমাকে হারিয়ে ফেলবে তুমি—হয়তো পলক ফেলতেই দেখব, জীবনে তুমি অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে, পরের ঘরে চলে গেছ, দূরের বন্ধু হয়েছ, বছরের পর বছর ঘুরে গেলেও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। তাগিদও বোধ করো না, তুমিও না, আমিও না। আজও তুমি রবির কথাই বলো, খুকুরানী।

ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল।

খুকি ঘুমিয়ে গেছে, মশারির চালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনছে।

আরো অনেক গভীর রাতে খুকির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, হয়তো কোনো মেয়েদেরই স্কুলে মাস্টারি করবে কিংবা বিধবাশ্রমে যাবে, কিংবা অবলাশ্রমে, হয়তো কোনো নারী কল্যাণ সমিতির সাহায্যের জন্য দরকার হবে। কিংবা হিন্দু মিশনের। অথবা পৃথিবীর সমস্ত সাহায্য, সহানুভূতি ও কৃপার অগোচরে জীবনের অন্ধকার সমুদ্রের পরিহাস ও অট্টহাসির ভিতর হাহাকার করে ফিরবে।

পরের দিন রাতে বিছানায় আমার পাশে খুকিকে শুইয়ে দিয়ে—

—'আমি রেলগাড়িতে চড়ে কলকাতায় যাব।'

—'নেলগালি?'

—'হ্যাঁ'

—'নেলগালি কী বাবা?'

—'কোনোদিন দেখিস নি?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'এখান থেকে সন্ধ্যার সময় নৌকায় চড়ে তারপর ইস্টিমারে উঠতে হয়, তারপর কাল সকালে রেলগাড়িতে চড়তে হয়।'

খুকি চুপ করে ছিল।

বললাম—'রেলগাড়িতে চড়ে যাবি?'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

—'ভুলুর কাছে।'

—'ভুলুর কাছে যেতে রেলগাড়ি লাগে না রে।'

—'বাবা আমাল ইজেল ছিলে গেছে।'

—'ছিঁড়ে গেছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, আমি নতুন ইজের করে দেব।'

—'দাদু বোতল কিনে এনে দেবে।'

—'বোতল?'

—'হ্যাঁ।'

—'ইজেল কিনে আনবে।'

—'ইজেরও আনবে দাদু?'

—'বিস্কুট আনবে, লজেন আনবে, পুতুল আনবে।'

—'বাবা আনবে না?'

মাথা নেড়ে 'না দাদু।'

এর পিতা এর জীবনের রক্তমাংসের জন্য দায়ী শুধু, অন্য সমস্ত দাদু।

—'খুকুরানী?'

—'উঁ?'

—'আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে?'

—'হ্যাঁ'

—'মেসে গিয়ে থাকতে হবে।'

আগ্রহের সঙ্গে—'আমি যাব তোমাল সঙ্গে বাবা।'

—'মেসের চৌবাচ্চার সামনে দাঁড়িয়ে স্নান করবি, বারান্দায় দৌড়বি, রাস্তায় ছেলেরা এসে যে-ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সেই দলে মিশে যাবি, আমার কোলে বসে থাকবি, পাথর কাঁকর ভরা ভাত আর গোরুর মাসকলাই, ঠাণ্ডা ট্যাড়সের তরকারি আর ছিবড়ের মতো মাছ; যাবি রে?'

—'যাব।'

—'বেশ, আর আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাব তখন তুই কী করবি?'

চুপচাপ।

—'একটা কাঁথা দিয়ে ঢেকে আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেব তোমাকে; না?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

—'খুব লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমুবে।'

—'হ্যাঁ'

—'মেসের বাবুদের ঝালাপালা করবে না তো?'

চুপ করেছিল; বললাম, 'বলো। করব না'

—'কলব না'

—'তারা যদি কান মলে দেয়, কাঁদবে না।'

—'না।'

—'তাদের মুখের পানের ছিবড়ে যদি তোমাকে খেতে দেয়, খাবে?'

—'হ্যাঁ খাব।'

—'মেসের বাবুরা বড় দুষ্টু যে রে খুকি, বিড়ির আঁস দিয়ে তোমার পিঠে ফোশকা ফেলে দেবে, চুরুটের ছাই দেবে তোমার চোখে-নাকে ঝেড়ে, দিন-রাত চুল টেনে-টেনে পাখির বাচ্চার মতো মাংস বের করে দেবে তোমার মাথায়। ফড়িঙের মতো করে দেবে যে রে।'

অবোধ ভাবে শুনছিল মেয়েটি।

ধীরে-ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে—'না, রে, মেসে গিয়ে কাজ নেই।'

একটু চুপ থেকে, 'আমারও আর ইচ্ছে করে না যেতে। তোমাকে নিয়ে খড়ের ঘরে সারাটা জীবন যদি কাটাতে পারতাম খুকুরানী।'

আজ রাতে বৃষ্টি নেই।

কদমগাছে একটা পেঁচা বসে ডাকছিল।

মেয়েটি—'ওই কে ডাকে বাবা—'

—'লক্ষ্মী পেঁচা'

—'কেন ডাকে? কাঁদে?'

—'না কাঁদে না'।

—'কী কলে?'

—'বেড়াতে বেরিয়েছে।'

—'বেলাতে?'

—'হ্যাঁ, আজ বৃষ্টি নেই কিনা।'

—'কোথায় বেলাতে?'

—'এই গাছে-গাছে, মাঠে-মাঠে।'

চুপ করে ভাবছিল।

খানিকক্ষণ পরে—'আমি মাঠে যাব।'

—'কাল সকালে যেও'

—'ভুলুর সঙ্গে খেলা কলব না?'

—'হ্যাঁ।'

—'নন্দু আসবে, রবি আসবে...'

তেঁতুল গাছের ভিতর থেকে বক ডেকে উঠল, ঘরের পাশের মস্তবড় পেয়ারা গাছের নিবিড় ডালপালার উপর গোটা দুই বাদুড় ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঝাড়া খেয়ে খানিকটা শিশির না বৃষ্টি পড়ার শব্দ—খুকুর চোখে ঘুম নেই, পৃথিবীর সমস্ত গন্ধ, রস, স্মৃতি ও শব্দের দিকে হৃদয় রয়েছে যেন জেগে—আজ ওর বেশি জ্বর নেই।

খুকু পাশ ফিরে শুল একবার—পঁচিশ বছরের পুরোনো কাঁঠালের খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে।

ধীরে-ধীরে শিরদাঁড়ায় আঙুল বুলুচ্ছিলাম—একটা টিকটিকির মতো মেরুদণ্ডে যেন—শুকনো বাঁশপাতার মতো চিমসে শরীর। মা আছে, বাবা আছে, দাদু আছে, ঠাকুরমা আছে তবুও যেন মনে হয়, ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশ রুগ্‌ণ একটা বিড়ালের ছানার মতো, ক্ষমাহীন পৃথিবীর পথে-বিপথে, এঁটো ও ঝাঁটা খেয়ে বেড়াবার জন্য এর জন্ম ও জীবন। মেসে যখন থাকি—দুপুর বেলা সমস্ত মেস নির্জন—বিছানায় বসে বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখি, দু-একটা চড়ুই নিঃশব্দে লাফিয়ে-লাফিয়ে সমস্ত বারান্দা ঘুরে দু-এক টুকরো খুদের সন্ধানে ফিরছে; এর ভিতর বেদনার তো কিছু নেই; কিন্তু তবুও মনে আঘাত লাগে যেন কেমন, আমার মেয়েটির কথা মনে হয়, চড়াইয়ের ছোট্ট নিঃসহায় মুখ, করুণ ঠ্যাং, অসম্পূর্ণ অকৃতকার্য দৃষ্টি ঘুরেফিরে একটি আড়াই বছরের শিশুর রূপ মনে জাগায়।

খুকি যখন দেশের বাড়িতে জন্মেছিল, তখনো আমি কলকাতার মেসে ছিলাম। দিনের পর দিন ভয়ে, সন্দেহে, বিক্ষুব্ধতায়, পৃথিবীতে এই শিশুটির আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম।

কে জানে, সে হয়তো মৃত হয়ে জন্মাবে; কিংবা তার জীবনের বিনিময়ে জননীকে মৃত্যুর দায় দিতে হবে? কে জানে, অন্ধ হয়ে জন্মাবে, হয়তো এই শিশু? কিংবা অঙ্গহীন হয়ে? হয়তো মূকবধির হবে? কিংবা অত্যন্ত অজ্ঞান জড়ের মন নিয়ে পৃথিবীতে আজন্মকাল নিজেকে পরিহাস করে চলে যাবে? হয়তো, মৃত হয়ে জন্মালেই ভালো।

পিতার হৃদয়ের এই রকম অনেক বিবর্ণ হতাশ অমঙ্গল চিন্তার মধ্যে এর জন্ম। গর্ভে যখন ছিল এই মেয়েটি এর মায়ের হৃদয় তখন বর্ণহীন রূপহীন শাদা করবীর একটা শাখার মতো, হেমন্তের সন্ধ্যার কুয়াশা ওদিকে তাকিয়ে আছে। গর্ভজাত শিশুর জীবন সম্বন্ধে আশা খুব কম ছিল ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম সন্তান প্রসবের পর একটা টেলিগ্রাম আসবে, আসতও, কিন্তু মেয়ে হয়েছে বলে বাড়ির লোকেরা টেলিগ্রাম করলে না আর। বিলম্ব করে, অবহেলা করে একখানা পোস্টকার্ড লিখে সংবাদটা জানাল আমাকে। টিকটিকির মতো মেরুদণ্ডসার এই মেয়েটি বিধাতা ও মানুষের এতই উপেক্ষার জিনিশ? সুস্থ, সুগোল, সুন্দর শিশুকেই শুধু সম্ভব করতে হবে—আদর

করতে হবে? যে-সন্তান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সকলের মনে সন্দিগ্ধতা সৃষ্টি করে, জননীর মন দেয় নিরাশায় ভরে—অন্ধ চোখ নিয়ে যে পৃথিবীতে নেমেছে, কিংবা কথা কইবার শক্তি যে সঙ্গে করে আনতে পারে নি, কিংবা শুনবার, বুঝবার, গ্রহণ করবার শক্তিকে যে কোনো দূরান্তের পথে রেখে এসেছে, কিংবা যার দেহের নির্জীবতা কাদাখোঁচার ছায়ার মতো, চড়াইয়ের মতো, হেমন্তের বিকেলে শুকনো পাতার রাশের ভিতর বালি-হাঁসের বিবর্ণ ডিমের মতো, পৃথিবীর হৃদয় যেন তাদের সম্বন্ধে নিজেকে সময়ে-অসময়ে অবারিত ভাবে ব্যয় করতে কেন এমন কুণ্ঠিত হয়? আনন্দ-উৎসবই কি জীবনের সবচেয়ে বড় কথা? সহানুভূতি—

তাকিয়ে দেখলাম খুকু জেগে আছে।

—'কী ভাবছিস রে'

কোনো উত্তর দিল না।

—'খাবি কিছু?'

—'হ্যাঁ খাব।'

—'কী খাবি?'

—'আমি গুল খাব বাবা।'

—'গুড়?'

আকাঙ্ক্ষা খুব সাধারণ। এর চেয়ে ভালো জিনিশের কল্পনা এর জগতে নেই।

—'চকোলেট খাবি রে?'

চুপ করে রইল। চকোলেট কী জানে না অবিশ্যি—

—'টফি?'

এবারও নিস্তব্ধ; ভাবলে, ঠাট্টা করছি।

—'কী খাবি রে?'

কোথার থেকে একটা গঙ্গাফড়িং, তেলাপোকা, চামচিকা, ফড়ফড় করে উড়ে এল—ঘরের ভিতর ক্লান্তিহীন ভাবে ঘুরতে লাগল।

চামচিকাটার দিকে তাকিয়ে চোখ ধীরে-ধীরে ভারী হয়ে এল মেয়েটির; ঘুমিয়ে পড়ছিল, একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিলাম।

—'গুড় খাবি না রে?'

—'কই?' উঠে বসে হাত পেতে বললে।

ধীরে-ধীরে আস্তে-আস্তে শুইয়ে দিয়ে মাথায় আস্তে-আস্তে হাত বুলুতে লাগলাম—'গুড় কাল সকালে খাবে; কেমন?'

—'আচ্ছা।'

—'নলেন গুড় না?'

—'হ্যাঁ।'

অন্যমনস্ক হয়ে অবাস্তব কথা ভাবছিলাম, কিছুক্ষণ পর ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ঘুমিয়ে যাচ্ছে।

আরো দু-তিন দিন কেটে গেছে।

সকাল বেলা, বাবা ইস্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছিলেন। ছোট্ট-ছোট্ট টেবিলে বই, ডিকশনারি খাতাপত্র, দোয়াতকালির স্তূপ—

মা এসে বললেন, 'একটা ছোকরা চাকর রেখেছি।'
—'রেখেছ?'
—'হ্যাঁ'
—'কী নাম চাকরটার?'
—'হরিচরণ।'
—'তুমিই রাখলে?'
—'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবার সময় ছিল না।'
—'কবে রেখেছ?'
—'আজ সকালেই।'
—'কত মাইনে?'
—'পাঁচ টাকা। রাখতে হয়েছে সুরেশবাবুর জন্য। চাকর ছাড়া ওর বড় কষ্ট।'
দেখতে-দেখতে পিসিমা এসে দাঁড়ালেন।
বললেন—'মেজদার জন্য চাকর না রেখে দিলে চলে না তো দাদা।'
বাবা—'আমিও তাই ভাবছিলাম'।
—'এই তো কাল পায়খানায় যাবেন—আমরা কেউ ওই দিকে ছিলাম না, কে ঘটিতে জল দেবে, প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল।'
—'দশ মিনিট? তাই তো চাকর থাকলে এ-রকম বিপত্তি তো হত না?'
—'গাউটটা বেড়েছে কিনা, কলকাতায়ও যেতে পারেন না, পায়ে মালিশ করে দেবার লোকেরও নিতান্ত দরকার।'
বাবা—'তা সুরেশ আমাকে আগে বললেই পারত; এসেছে তো দশ দিন, চাকর ছাড়া এত দিন তা হলে খুব কষ্টেই কাটাল।'
পিসিমা—'তা যা হবার তো হয়ে গেছে।'
—'তোমার টানাটানির সংসার দেখে মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারে নি হয় তো।'
—'আমার কিন্তু বরাবর মনে হচ্ছিল একটা চাকর ছাড়া বর্ষার মধ্যে ওর হবে কী করে?'
পিসিমা—'মনে হলেই তো শুধু হয় না, ব্যবস্থা করতে হয়।'
—'তা ঠিক; যাক্, তুমি না হয় আমার হয়ে বেশ ভাল ব্যবস্থাই করেছ।'
—'এর মাইনে কিন্তু পাঁচ টাকা।'
—'শুনেছি।'
—'একটা কথা কিন্তু দাদা।'
—'বলো।'
—মেজদা হয়তো টাকাটা আপনাকে দিতে চাইবে কিন্তু আপনি নেবেন না।'
—'ওঃ, সে কথা কি তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে।'
—'তাহলে মেজদাকে আমি একটা কথা গিয়ে বলব?'
—'কী কথা?'
—'বলব যে দাদাকে টাকা নিয়ে সাধতে যাবেন না। তাহলে দাদা বিরক্ত হবেন।'
—'আমি জানি সুরেশ আমাকে টাকা নিয়ে সাধতে আসবে না।'
—'কী রকম?'

—'সে জানে সে তার দাদার বাড়িতে আছে।'

—'কই? দু-ভায়ে বনিবনা কোথায়?'

—'কেন? কী রকম?'

—'তার খাবার সময় তুমি গিয়ে দাঁড়াও?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'সকালবেলা তো আমি ইস্কুলে চলে যাই।'

—'বেশ, রাতের বেলা?'

—আমি খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ি এই আমার চল্লিশ বছরের অভ্যাস—সুরেশের খাবার সময় তদারকের জন্য খোকাকে পাঠিয়ে দি তাই—খোকার মা তো আছেনই—তা তুমি যদি মনে করো আমি না যাওয়াতে সুরেশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তা হলে আজ থেকে আমি গিয়ে বসব।'

—'বসবার দরকার নেই।'

—'দরকার নেই?'

—'একটু বসে পায়চারি করে চলে আসলেই হবে, আপনি ওখানে গিয়ে বসলে মেজদার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে।'

—'কেন?'

—'অন্তত কথাবার্তার ধারা বদলে যাবে, আধ্যাত্মিক হয়ে উঠবে।'

—'সেটা তোমরা চাও না অবিশ্যি।'

—'না।'

—'আচ্ছা, তা হলে গিয়ে দু-চার মিনিট পায়চারি করা যাবে।'

—'হ্যাঁ, দু-এক মিনিট থেকে, আপনি আপনার ঘরে চলে গেলে, কেউ আপনার পথ আটকাতে যাবে না, লৌকিকতাও বজায় থাকবে।'

—'বেশ কথা, বেশ কথা।'

—'হরিচরণ কিন্তু একান্তই মেজদার,'

—'তা ছাড়া আবার কার? সুরেশের জন্যই তো রাখা।'

—'না, সেই কথাটাই সব সময় যেন আপনাদের খেয়ালে থাকে। সেই জন্যই বলছিলাম।'

মা—'বউমা হয়তো মাঝে-মাঝে কিছু ফরমাস দিতে পারে।'

—'তা যেন না দেয়।'

একটু কেশে পিসিমা—'রান্নাঘরের কোনো কাজ হরিচরণ করতে পারবে না।'

বাবা—'না, রান্নাঘরের জন্য তাকে তো রাখা নয়।'

—'বাজারে হেম যেমন যাচ্ছিল তেমনি যাবে। আপনারা ওকে জল তুলে বা কাপড় কেচে দিতে বলতে পারবেন না। এ-সব বউমা আর বউঠান যেমন করছিল তেমনই করবে। সন্ধ্যার সময় বাতিও বউমাই জ্বালবে।'

বাবা হেসে, 'কারু কোনো আপত্তি নেই।'

—'হরিচরণ মেজদার হাত-পা টিপে দেবে, কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে দেবে। বিছানা পাতবে, ঘর ঝাঁট দেবে, জিনিশপত্র সাজাবে-গোছাবে, পাইখানার জল দেবে, পাকা চুল বেছে দেবে—এই সব আর-কী?'

—'বেশ কথা; এখন চাকরটা কী-রকম হয়; আনাড়ি হলে তো সুরেশের বড্ড কষ্ট।'

—'না, সে বেশ চালাক আছে।'

—'গায়ে-পায়ে কাজ করতে পারবে বেশ?'

—'তা ফুর্তিসে সকাল থেকেই তো কাজে লেগে গেছে।'

—'বেশ।'

—'মেজদার গা টিপছে সেই সকাল থেকে।'

—'সুরেশের গাউট বাড়ল না কি আরো?'

—'বাড়েও নি কমেও নি—যেমন ছিল তেমনি আছে তবে না-টিপলে কষ্ট লাগে।'

—'দেখো, চাকরটা যেন বেশ মোলায়েম ভাবে টিপতে পারে, আর হাত, পা, ঘাড় টিপবার আগে কখনো যেন তামাক না খায়।'

—'মেজদা চেয়েছিলেন জমিদারি স্টেটে ম্যানেজারি করতে, ঢের বড়-বড় চাকরি পেয়েছিলেন—আমি বললাম, থাকরে বাপু, হাতে-পায়ে এত, বয়সও তো কম নয়, তোমার এখন সেবা শ্রদ্ধা পাবার বয়স, সুস্থিরে বসে ভগবানের সান্নিধ্যে থাকবে, মানুষকে ধর্ম উপদেশ দেবে, পথ দেখাবে, এই আর-কী।'

মা বললে, 'হরিচরণকে তিনবেলা খাবার দিতে হবে! হ্যাঁ, তিনবেলা ভাত দেব কড়ারে নিয়েছি, সুরেশবাবু আচ্ছা ছেলেমানুষ।'

—'খাবে তো। না হলে কাহিল শরীরে কী কাজ করবে?' বাবা শাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে—'যা খেতে পারে, খাবে।'

একটু গলা খাঁকরে—'মানুষ তো ক্ষিধের অতিরিক্ত কিছু খায় না।'

মা একটু চিন্তিত ভাবে—'তিনবেলা একজন চাকরের অন্তত দেড়সের চালের ভাত লাগবে।'

—'লাগলে লাগবে? এ নিয়ে তুমি ভাবছ কেন বড়বউ।'

—'না, টেনে-হিঁচড়ে সংসার চলছে কিনা।'

—'তা, আমি না হয় বলব মেজদাকে চালের টাকাটা দিতে। এক টাকা করে তো চালের মণ।'

মা তাড়াতাড়ি পিসিমার মুখে হাত চাপা দিয়ে—'খবরদার, এমন কাজও করো না ঠাকুরঝি।'

—'দাদা বললে অবশ্য মেজদাকে গিয়ে লাগাতাম; তোমার কথার কী-আর মূল্য বউঠান; তুমি তো বাজারের ঘটি-বাটি।'

খানিক দূর গিয়ে পিসিমা ফিরে এসে বাবার দিকে তাকিয়ে—'আমি কিন্তু মেজদার সঙ্গে কলকাতায় যাব।'

—'তা একবার গিয়ে বেড়িয়ে এলে—বেশ তো,'

—'বেড়িয়ে আসা শুধু নয়।'

—'তবে?'

—'পুজোর সময় আমাকে আনবার জন্য হেমকে যদি পাঠাও তাহলে আমি আসব না।'

—'কেন?'

—'চালের দর নিয়ে যারা কষাকষি করে সে-সব চামারের বাড়ি আমি থাকি না।'

কিছু না বলে পিসিমা হন হন করে চলে যাচ্ছিলেন। মা ডাক দিলেন—দাঁড়ালেন না, কিংবা পিছে তাকালেন না।

—'তোমার দাদা তোমাকে ডাকছেন।'

পিসিমা ফিরে এলে, বাবা—'কই আমি তো তোমাকে ডাকি নি।'

মা বিহ্বল হয়ে বললেন—'আচ্ছা বেশ, আমিই ডেকেছি—আমার ডাক বুঝি শুনতে নেই?'

বলে ঝুপ করে পিসিমার থানের আঁচলখানা ধরে নিজের মুঠির মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে কানে-কানে কথা বলতে-বলতে গলাগলি হয়ে পেয়ারা গাছটার দিকে চলে গেলেন দু-জনে।

পেয়ারা তলায় দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা কথাবার্তার পর পিসিমা পাড়ার দিকে চলে গেলেন।

মা এসে বললেন, 'শুনছ?'

বাবা খাতার থেকে মুখ তুলে তাকালেন।

—'চামার বলুক, কশাই বলুক, আমাদের অভদ্র সেজে কী লাভ?'

বাবা চোখ নামিয়ে লিখতে লাগলেন।

—'রাগ করেছ?'

—'ওই রকমই বলে।'

—'আমাকে বললে বাজারের...।'

কল্যাণী চলে যাচ্ছিল। মা একটু থমকে থামলেন।

বাবা—'কল্যাণী চলে গেল যাক, এ সব প্রসঙ্গ তুলে কোনো লাভ নেই, আমার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

—'আজ যে দুধ খেলে না, ক-দিন ধরে দুধ খাচ্ছ না যে?'

—'দুধ হজম হচ্ছে না।'

—'চা আর মুড়ি তো খুব হজম হয়।'

—'আচ্ছা, এর মানে ডিকশনারিতে দেয় নি কেন খোকা?'

—'এটা কার ডিকশনারি?'

—'অক্সফোর্ডই তো'

—'দেয় নি? কী জানি।'

—'কোথায় পাব তবে?'

—'নিউ ইংলিশ ডিকশনারিতে আছে হয়তো।'

—'হ্যাঁ। তা কোথায় পাই'

—'এখানে কারো আছে বলে তো মনে হয় না।'

বাবা একটু চুপ থেকে—'নবাব হামাম মিঞার খুব বড় ডিকশনারি আছে।'

—'আছে নাকি?'

—'হ্যাঁ, বেশ নামজাদা।'

—'নবাবজাদা কোথায় থাকেন?'

—'সে প্রায় মাইল তিন-চারের পথ।'

—'আগে তো ছিলেন নদীর দক্ষিণ দিকে এক চর, না শকুন চর, কী বলে তারই পাশে।'

বাবা বাধা দিয়ে—'সে বাড়ি নদীতে ভেঙে গেছে। এখন একেবারে নদী এড়িয়ে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে ভিতরের দিকে বাসা করেছেন।'

একটু গলা খাঁকরে, 'তোমাকে—চিনিয়ে দিচ্ছি।'

এক চিলতে শাদা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—'দেখো।'

মিনিট পাঁচেক পরে—'চিনলে?'

—'হ্যাঁ, ওদিকে আগে তো বন-জঙ্গল ছিল বলে জানতাম।'

—'একটা মস্তবড় প্রান্তরও ছিল। এখন বসতি হয়েছে অনেক। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বিঘা জমির ওপরে চমৎকার সুন্দর বাড়ি নবাবজাদার।'

—'কী রকম বই আছে লাইব্রেরিতে?'

—'প্রায় হাজার তিরিশেক বই, প্রায়ই ইংরেজি ক্লাসিক।'

—'তুমি গিয়েছ সেই লাইব্রেরিতে?'

—'হ্যাঁ, গিয়েছি কয়েকবার।'

—'নতুন বই আছে?'

—'প্রত্যেক সনেই তো বই কিনছেন। খুব যা-চাও সে-রকম বই পাবে আশা করি।'

—'গেলে হয় এক দিন।'

—'মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের চিঠি নিয়ে যেও।'

বাবা বলতে লাগলেন, 'শব্দটার মানে দেখে এসো, শুধু শব্দার্থ নয়, সেটা আমি জানি খানিকটা, আমি চাই এই শব্দটির আদ্যোপান্ত ইতিহাস, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা।'

বাংলা খবরের কাগজটা পড়ছিলাম। দক্ষিণের ঘরে শুনছিলাম মেজকাকা ও মায়ের হাস্যকলরব বেশ জমে উঠেছে।

পিসিমা গলায় আঁচল জড়িয়ে এসে—'দাদা।'

খাতার থেকে চোখ না তুলেই—'কী, কী মনে করে?'

—মেজদাকে যে রোজ মিঠাই কিনে দেওয়া হচ্ছে সে কথা তোমাকে বলি নি।'

—'না, শুনি নি আমি।'

—'রোজ বিকেলে, রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া, পান্তুয়া, অমৃতি খান।'

—'বেশ তো, বাজারের থেকে না এনে ঘরেই করে দিতে পারতে।'

—'তা, পয়সা অনেক জমে গেছে, ক্ষিতীশ আমাকে বললে—বাকিতে আর আমি দিতে পারব না।'

—'ক্ষিতীশকে খাতা নিয়ে আসতে বলো।'

—'আচ্ছা।'

—'আর-একটা কথা।'

—'বসে বলো, দাঁড়িয়ে রইলে? হেম একটা মোড়া এনে দাও।'

—'না, না, আমার বসতে হবে না, এক মিনিট শুধু।'

চৌকাঠের ওপর বসে—'মাঝে-মাঝে গাড়িতে বেড়াতে গেছেন, সেই ভাড়াটা।'

—'আচ্ছা।'

—'আর একটা ইংরেজি খবরের কাগজ রোজ দিতে বললেন।'

—'অমৃত বাজার কি একটা রাখা হয় না হেম?'

—'মেজকাকা স্টেটসম্যান চান।

—'বেশ তাই রেখো; যার যাতে তৃপ্তি হয় তার থেকে তাকে বঞ্চিত করে লাভ নেই তো কিছু।'

পিসিমা—'কাপড়-কাচা সাবানের জন্য কিছু পয়সা দেবেন?'

—'এক সের সাবান?'

—'হ্যাঁ, ধরুন, আড়াই সের আন্দাজ।'

—চাবি তো ওর কাছে। বলো গিয়ে, যত পয়সা লাগে দেবেন।'

বাবা গুন-গুন করে গাইতে-গাইতে উঠলেন। সংস্কৃত একটা শ্লোক। হয়তো উপনিষদের।

মাইনে অবিশ্যি পঞ্চাশ টাকা। ধার, পাঁচ হাজার পেরিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর খুকিকে ঘুম পাড়িয়ে বাবার কোঠায় গিয়ে বসলাম। সদর রাস্তার দিকের দরজাটা বাবা বন্ধ করে ইস্কুলে চলে গেছেন, খুলে দিলাম দরজাটা। দিব্যি আলো ঘরের ভিতর ঢুকল, ফুরফুরে মেঘলা বাতাস। কয়েক হাত দূরে সবুজ নিবিড় কৃষ্ণচূড়া গাছটা দাঁড়িয়ে—এখনো ইতস্তত কিছু ফুল ফুটে আছে।

একটা টুল নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বসলাম।

পায়ের শব্দ শুনেই তাকিয়ে দেখি মা পান চিবুতে-চিবুতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—'খাওয়া হয়ে গেল?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী দিয়ে খেলে আজ?'

এ প্রশ্নের উত্তর মা কোনোদিনই দেন না, আজও নিরুত্তর হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন।

বললাম—'বসো।'

—'না, ঢের কাজ আছে।'

—'কোনো সময়ই তো তুমি বসতে চাও না।'

কোনো জবাব দিলেন না।

—'তোমাকে কখন আমি পাই বলো তো?'

এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই।

—'সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে দেখি তুমি রান্নাঘরে চলে গেছ। কত সকালে যে যাও তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

—'না-গিয়ে উপায় কোথায়?'

—'শুধু সেইজন্যই না, আমার মনে হয় যেতে তোমার ভালো লাগে,'

—'তাই তোমার মনে হয় বটে।'

—'তাই না মা? উকিলের যেমন কোর্টে যেতে ভালো লাগে, ডাক্তারের যেমন হ্যাট-কোট পরে স্টেথিস্কোপ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে খুব উৎসাহ, দালাল যেমন নাকে-মুখে গুঁজে ছাতি নিয়ে ছুটতে ভালোবাসে, হেঁসেল হয়েছে তোমার তাই।'

নীরব ছিলেন।

—'এই বৃষ্টির ভোরে বিছানায় একটু শুয়ে থাকতে কত ভালো লাগে মানুষের। তুমি সব অগ্রাহ্য করে অন্ধকার থাকতে একটা গামছা মাথায় ফেলে বৃষ্টি ভেঙে রান্না করে দাও ছুট।'

—'চুনে দেখছি জিব পুড়ে গেছে।'

—'তারপর রান্নাঘরে গিয়ে কী করো?'

—'পানটা নিশ্চয় বউমা সেজেছিল আজ।'

—'উনুন জ্বালাও? না আগেকার দিনের বাসন মাজো?'

—'বউ এত চুন খায়?'

—'হ্যাঁ চুন খেতে খুব ভালোবাসে, শরীরে ক্যালসিয়াম খুব কম কিনা।'

—'ক্যালসিয়াম কী?'

—'যা দিয়ে হাড় তৈরি হয়; কল্যাণীর সেই জিনিশের খুব অভাব, তার মেয়েরও। দু-জনেরই রিকেট।'

—'রিকেট কাকে বলে?'

—'যাদের শরীরে চুন জাতীয় জিনিশ, আরো নানারকম সার পদার্থ ঢের কম, ভিটামিন কম, ভিটামিন এ-বি-সি-ডি জীবনী শক্তির যত সব মাল মশলা সবই নিবন্ত প্রদীপের মতো জ্বলছে আর-কি?'

—'আজ বড্ড চুন দিয়েছে এই পানে। আমি একশোবার নিষেধ করে দিয়েছি তবু যদি কানে ঢোকে। এরপর দেখছি একটা পান নিজের তৈরি করে খেতে হবে।'

—'আগের রাতের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আগে মেজে নাও?'

—'তোমার বউ তো আর মেজে দেবে না আমাকে—

—'তারপর উনুন জ্বালাও?'

—'না, বাসন আগের রাতে মেজে রাখি।'

—'রোজই? সমস্ত?'

—'হ্যাঁ, তবে কি আবার থোক-থোক করে মাজব না কি?'

—'চেপে যে-দিন ঝড়-বৃষ্টি আসে।'

—'বললাম তো, রোজই মেজে রাখি রে, তুইও নিজের চোখে দেখেছিস কত? আজ যে বড় জিজ্ঞাসা?'

—'আগে তো ছাতা নিতে না।'

—'এখনো নেই না।'

—'বৃষ্টিতে এত ভিজতে পারে মানুষ?'

—'ঘাটলার পাশে মস্তবড় জামগাছটা আছে রে।'

—'তাতে বৃষ্টি মানায়।'

—'মানিয়েই তো যায় এক রকম দেখি।'

—'সকালবেলা প্রথম উনুন জ্বালাও গিয়ে?'

—'হ্যাঁ রে।'

—'উনুন জ্বালানো কি সোজা ব্যাপার মা, বিশেষত এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে সমস্তই থাকে স্যাঁতসেঁতে হয়ে। সমস্ত বাড়িঘরে শুকনো ডালপাতা জোগাড়, কয়লা ভাঙা, গোবর দিয়ে মেখে ঘুটে তৈরি করা।'

—'বড় তো ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে বসলি রে? খুকি ঘুমিয়েছে?

—'হ্যাঁ।'

—'আর বউমা?'

—'পড়ছে বোধহয়।'

—'কী বই?'

—'কিংবা লিখছে।'

—'চিঠি?'

—'চিঠিই লিখছে বোধ করি।'

—'কাকে?'

—'তা তো আমি জিজ্ঞেস করি নি।'

—'জিজ্ঞেস করলে, বলে কি সব সময়?'

—'কেনই-বা বলবে? আমরা কেউ-বা কাকে জীবনের [illegible] কথাটুকু বলি?'

হাসতে লাগলাম।

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বললেন, 'যাই।'

—'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তো রইলে এতক্ষণ, বসলেও না।'

—'যাই, একটু ঘুমোই গিয়ে।'

—'ঘুমোবে না তুমি নিশ্চয়ই।'

—'কী করব তা বলে?'

—'ঘুমোলেও আধঘণ্টার বেশি নয়।'

—'কেন? তারপর কোথায় যাব?'

—'সে সব তুমি জান, তবে দুপুরে আধঘণ্টা-তিন কোয়ার্টারের বেশি ঘুমোতে দেখি নি কোনোদিন; কোনোদিন একাগ্রভাবে অনেকক্ষণ বই পড়তেও দেখি নি; পাড়ায় কড়ি খেলা বা বিন্তির মজলিশে পনেরো মিনিটের বেশি তুমি টিকতে পার না; সেলাইয়ের কলের ইতিহাস তোমার জীবনে নেই; না আছে নকশি কাঁথা, মোজা, টুপি বুনবার।'

—'সমস্ত সময়ই রান্নাঘরে থাকি বুঝি?'

—'না, তা নয়।'

—'তবে?'

—'মানুষকে আপ্যায়িত করতে, কথাবার্তা বলতে, আসর জমাতে, খুবই পার তুমি কিন্তু—'

একটু চুপ থেকে—'সময়ের অভাবে কিছুই হল না তোমার।' মা ঈষৎ প্রসন্ন ও বিমর্ষ মুখে—'যার যেমন ভাগ্য।' ঈষৎ বিরস ও খানিকটা প্রফুল্লভাবে— 'অবিশ্যি নিজের ভাগ্যকে দোষ দেই না আমি, বিধাতা আমাকে যা দিয়েছেন'—পরস্পর বিরুদ্ধ কথা কলের মতো আউড়ে গেলেন। এখন সময়বিশেষে বিক্ষোভ ও যাতনা। অন্য সময়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্তি।

ভাবলেন নিজের জীবনের জবাবদিহি দেওয়া হয়ে গেছে।

—'হ্যাঁ সময়ের অভাবে কী হল না তোমার? এই তো তিনমাস ধরে এখানে এসেছি—দিনের ভিতর কতবার তোমাকে চেয়েছি। কিন্তু সব সময় শুনেছি অনেক কাজ, কোনো সময় নেই।'

মা চুপ করে ছিলেন।

—বাবাও তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান; বলতে পারলে ভালো লাগে তার—'

বাধা দিয়ে মা—'এমন মিথ্যা কথা বলো না তুমি।'

—'মিথ্যা নয়, সত্য কথা।'

—'চব্বিশ ঘণ্টা তিনি নিজের কাজ নিয়ে আছেন।'

—'না চব্বিশ ঘণ্টা নয়, অনেকটা সময় তাঁর অবসর।'

—'আমি তো তাঁকে এই পঞ্চাশ বছর ধরে দেখছি।'

—'ইস্কুল থেকে এসে রাত দশটা-এগারোটা, কোনোদিন বারোটা অব্দি তিনি কথার মানুষ খুঁজতে থাকেন, আলাপ করতে চান, নিজেকে বড্ড একা বোধ করেন।'

—'বেশ তো, দাবার আড্ডায় গেলেই পারেন।'

—'বাবা তো ইহজীবনে কোনোদিন তাসও খেলেন নি।'

—'এ-রকম অদ্ভুত লোককে বাধ্য হয়েই একা থাকতে হয়।'

—বাঃ বাঃ, তুমি এই রকম কথা বল, তাস-পাশার মজলিশ ছাড়া, মানুষের আনন্দ পাবার অন্য কোনো জায়গাই নেই এই পৃথিবীতে?'

—'যে লোক বাড়ির থেকে বেরুবে না, সমাজে মিশবে না, আন্তরিক কথাবার্তা বলবার জন্য বন্ধু-বান্ধব কী করে জুটবে তার।'

মা বললেন—'অর্থসম্পদ নেই, প্রভুত্বপ্রতিপত্তি নেই, কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ নেই।'

—'না, তা নেই।'

—এ-রকম ধরণের বোবালোকের কাছে কে এসে বসবে বলো?'

—'না বড় একটা কারু আসবার কথা নয় বটে।'

—'মাঝে-মাঝে দু-চারটি ছাত্র এসে টিক-টিক করে।'

—'হ্যাঁ তা দেখেছি।'

—'ক্বচিৎ দু-এক জন মাস্টার আসে। তাও যদি হেডমাস্টার হতেন; তাও তো নন তোমার বাবা।'

—'বাবার জীবনটাকে এ-রকমভাবে পর্যালোচনা করা চলে বটে কিন্তু আমি তার জীবনের অন্যরূপ দেখেছি।'

উদাসীন চোখ তুলে মা আমার দিকে তাকালেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে মাথা হেঁট করে রইলাম, কেমন বেদনা বোধ করছিলাম।

—'কোন অপূর্ব রূপ তোমার চোখে পড়ল?'

—'তোমার চোখেও পড়েছে নিশ্চয় একদিন, যখন তিনি মরে যাবেন তখন বুঝতে পারবে।'

মা—'ছি, এমন কামনা করো তুমি? জেনো, আমার নোয়া-সিন্দুর একদিন ঘুচে যাবে এই কথা আমাকে শুনিয়ে বলবার প্রবৃত্তি তোমার সংযম মানে না?'

—'বাবার জীবনী বা চরিত্রের কথা বিশদভাবে তোমাকে বলতে যাচ্ছি না, তোমাকে বলবার প্রয়োজনও নেই, কিন্তু দেখে না-দেখেও সবই জান তুমি। আজকালকার নানারকম নবীন-তরুণ মানুষদের মধ্যে তিনি এমন একজন সাবেকি লোক, যিনি চলে গেলে আমাদের পরিবারের শাখায়-প্রশাখায় কেউ কোথাও তার স্থান পূর্ণ করতে পারবে না।'

—'আবার তুমি সেই কথাই বলছ; নোয়া-সিঁদুর নিয়ে তার পায়ে মাথা রেখে আমি মরব।'

—'পায় মাথা রাখবার দরকার নেই—দিনের মধ্যে কয়েকবার অন্তত তার মাথার কাছে এসে বসো।'

—'যাই।'

—'কোথায়?'

—'লুচি করতে হবে। তোমার মেজকাকার জন্য।'

—'তা এত তাড়া কী? এখন তো মোটে দুটো।'

—'উদ্যোগ করতে হবে তো।'

—'না হয় একটু দেরিই হয়ে গেল আজ; বলো হেমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু বিলম্ব হয়ে গেল; কিছু বলবেন না তিনি।'

—'না, আমার একটু এখন দক্ষিণের ঘরে যেতে হবে।'

—'কেন?'

—'তোমার মেজকাকা বলেন, দুপুরটা বড্ড একা লাগে।'

—'তাই না কি?'

—'সান্নিধ্য তিনি বড় একটা ভালোবাসেন না।'

—'পিসিমা ওখানে আছেন?'

—'হ্যাঁ আছে। ওর বকবকানি মেজবাবুর চক্ষুশূল।'

—'মেজকাকা জেগে আছেন এখনো?'

—'আছেন বইকি; সারা দুপুরই কি মানুষ ঘুমোয়?'

—'কী করেন সমস্তটা দুপুরবেলা?'

—'কীই-বা করবেন, তাই তো বলছিলেন, বড্ড একা লাগে, সময় কাটতে চায় না; তুমি এসো বড়বউ।'

—'বাবা তোমাকে বড়বউ বলে ডাকেন না?'

মা একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন।

—'কিংবা কাছে এসে বসতেও বলেন না?'

—'বুড়ো বয়সে কাণ্ডজ্ঞান হারান নি তো'—

—ইস্কুল থেকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন, খুকিকে আদর করেন, কোলে নেন, খুকির সঙ্গে খেলা করেন, কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা অভাব ঘুচতে চায় না, বুঝি অনেক কথা বলবার আছে তাঁর, তিনি অনেক বিনিময়ের মানুষ, আমার কাছে সমস্ত কথা ব্যক্ত করবার তাঁর সুযোগ নেই—অধিকার নেই, নির্দেশ নেই। আর্টিস্ট নন তিনি, লিখে নিজেকে নির্মুক্ত করে নেবার অবসর নেই। সামাজিক লোক নন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে গিয়ে নিজের বোঝা হালকা খালাশ করে নেবার সৌভাগ্য নেই। ঘুরেফিরে আমার কাছেই আসেন। বিছানার অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকেন অনেকক্ষণ, চেয়ারে গিয়ে বসেন, বারান্দায় গিয়ে পায়চারি করতে থাকেন, আমার কোঠায় এসে বারবার উঁকি দিয়ে যান, দু-চার মিনিটের জন্য আলো জ্বালেন, আলো নিভিয়ে ফেলেন। তারপর আবার চলে অন্ধকারের মধ্যে পায়চারি—এ-কোঠায়, ও-কোঠায় সে-কোঠায়—বারান্দায়, এ যেন আর ইহকালেও ফুরবে না, নিজের কোঠায়—চেয়ারে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। দক্ষিণের ঘরে পিসিমা, মেজকাকা ও তোমার হাসি-তামাশার কোলাহল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পাই আমরা—কিন্তু এ-ঘরটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে। কল্যাণী তার কোঠায়, আমি আমার কোঠায়, বাবা নিজের কোঠায়। জীবনের হাসি-আনন্দকে আমরা কেউই অপছন্দ করি না, কিন্তু পরস্পর এত কাছে থেকেও সে জিনিশ আয়ত্ত করবার অধিকার আমাদের নেই,

অনেক রাত বসে খবরের কাগজটা চিবিয়ে-চিবিয়ে শেষ করি, তারপর আবার চিবোই, তারপর আবার চিবোই। বাবা থেকে-থেকে উপনিষদের শ্লোক আওড়ান, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন—কল্যাণী তেঁতুলের ঝোল খেয়ে সন্ধ্যারাতেই বাতি নিবিয়ে জীবনের ক্ষমাহীন জীবনস্রোতের কথা ভাবতে থাকে।

মা—'এই জন্যই তো এই ঘরে আসতে চাই না; এ নিরানন্দের মধ্যে এসে অন্ধকারের ভিতর মুখ গুঁজে কাঁদব—'

—'কিন্তু এটাই তো তোমার ঘর—'

—'সেইজন্যই তো ঘুমোবার সময় এ ঘরে আসি।'

—'আমার ও কল্যাণীর কথা আলাদা। মানুষের জীবনকে তুমিও স্বীকার করেছ, বাবাও স্বীকার করেছেন, তোমাদের বিশ্বাস আছে, ভক্তি আছে, প্রেম আছে, তোমরা প্রার্থনা কর; অথচ তার এক মুহূর্ত আগেও অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক মানুষদের সঙ্গে অবান্তর কথা বল—অথচ তুমি ঘুমোবার সময় এ-ঘরে আসতে চাও শুধু, বাবা না-ঘুমিয়ে ঘুরে মরেন, বুঝি না এ কেমন?

—'একদিন বুঝবে; তুমিই তো একদিন আমাকে চিতায় নিয়ে চড়াবে, সে দিন আমার কপালের সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারবে সব।'

—'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শাড়ি-সিঁদুরের আড়ম্বরের কোনো মূল্য দেই না আমি; হয়তো সিঁদুরের দিকে তাকাবই না; জীবনে কে কাকে কেমন আঘাত করেছে সেই কথাই মনে হবে।'

—'যাক, তোমার সঙ্গে মিছিমিছি কথা বলবার কোনো অভিরুচি নেই আমার।'

মা চুলের ভিতর ধীরে-ধীরে চিরুনি নাড়ছিলেন।

—'পৃথিবীতে যদি অনেকদিন বেঁচে থাকতে হয় তাহলে সৎচরিত্র ধার্মিক আদর্শ গৃহস্থ হয়ে যেন জীবনটা না কাটাই—তার চেয়ে তাড়িখানাও ঢের ভালো।'

—'তোমার যা মনে আসছে, তাই বলছ দেখছি হেম।'

—'বাবার মতো সত্তর-বাহাত্তর বছর যদি বেঁচে থাকতে হয়—কবিতা লিখবার শক্তি যদি হারিয়ে ফেলি, তাহলে, তাহলে চীনাদের মতো জুয়ার আড্ডায় কাটাব। কিংবা জাহাজের খালাশি হয়ে বেরিয়ে যাব, মিছিমিছি বাবার মতো উঠানে বারান্দায় অন্ধকারে পায়চারি করে শিষ্ট সাধু হয়ে জীবনের সম্ভাবনাটাকে নষ্ট করে কী লাভ? মেজকাকাও করেন না, সেজকাকাও করেন না; প্রতি মুহূর্তেই জীবনের কাছ থেকে নতুন কিছু পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনায় থাকেন।'

ভিজে শালিকের ঘাড়ের পালকের মতো চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছিল মা-র, শাড়ি বদলাতে গেলেন, ফিরে এসে খুকির মাথায় দু-তিন বার হাত বুলিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে চলে গেলেন। রাত বারোটা-একটার আগে এ ঘরে আর পদধ্বনি শোনা যাবে না।

বাবা চমকে উঠে—'কে?'

—'আমি'

—'ও, হেম?'

—'হ্যাঁ'

—'রাত কটা বাজে?'

—'এই দশটা হবে।'

—'ওঃ তবে তো কম রাত হয় নি—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আরো ঢের বেশি রাত হয়েছে, এই বারোটা আন্দাজ,' একটু হেসে, 'অবিশ্যি আমার মনের ঘড়ি অনুসারে রাত একটা-দুটো হয়ে যাওয়া উচিত এতক্ষণে; কিন্তু তুমি খেয়েছ?'

—'হ্যাঁ অনেকক্ষণ, আপনি খেলেন না কিছু?'

—'এক গ্লাশ মিছরির পানা খেয়েছি, আজ আর খাব না।'

—'কিছুই না?'

—'না', একটু চুপ থেকে, 'মাঝে-মাঝে উপোস দেওয়া দরকার; তাতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না, ভালোই হয়, খুকি ঘুমিয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'দুধ খেয়েছিল?'

—'খেয়েছে।'

—'তোমার বিছানায় নিয়েছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'খুকির আবার পাঁচড়া হচ্ছে দেখলাম।'

—'হ্যাঁ।'

—'সমস্ত হাত-পা, বুক-পিঠ, খুজলিতে ভরে গিয়েছে।'

—'দেখেছি।'

—'এ তো বড় ভালো কথা নয়।'

—'নাঃ, ঘুরে-ঘুরে হচ্ছে।'

—'কিন্তু বার-বার এ-রকম পাঁচড়া হয় কেন? এই আড়াই বছরের মধ্যে তিন বার হল?'

মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন।

—'কলকাতায় তুমি চোদ্দ বছর ধরে আনাগোনা করছ, কখনো কোনো প্রলোভনে পড়ো নি তো? শরীরে কোনো রোগ আছে তোমার?'

—'আছে বলে তো জানি না।'

—'এ মেয়ের প্রতি দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পেরেছ বলে মনে হয় না।'

নিস্তব্ধতায় খানিকটা সময় কেটে গেল।

একটু চুপ থেকে—'থাক, এ প্রসঙ্গ থাক। তুমি ঘুমোতে যাবে এখন?'

—'না।'

—'পড়বে?'

—'এখন আর পড়ব না।'

—'ভবিষ্যতে আর—'

কিন্তু না-বলে থামলেন।

বললেন—'অবিনাশকে কাল ডেকে আনব।'

—'এখানে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি তো অ্যাসিসট্যান্ট সারজেন—'

—'ভিজিট দেব, বেশ পাকা ডাক্তার, খুব অমায়িক, ভদ্র মানুষ।'

—'কিসের জন্য আনবে তাকে বাবা?'

—'খুকিকে দেখবে, তাঁকে খুলে সব বলো।'

চুপ করে ছিলাম।

—'আর তোমারও ব্লাড এক্সামিন করবে। ওষুধ দেবে, হয়তো ইনজেকশান-এর দরকার হবে।'

একটু বিব্রত হয়ে—'কিন্তু মেজকাকা যদ্দিন এ বাড়িতে আছেন এখানে অবিনাশ বাবুকে না আনাই ভালো।'

—'কেন সুরেশ কোনোদিন এর জন্য ইনজেকশান নেয় নি।'

মাথা হেট করে—'নিলে তো প্রকাশ্যে নেয় নি।'

বাবা—'বছর পনেরো আগে একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম, সুরেশের বাসায় কয়েকদিন ছিলাম; গামছা ছিল না, সুরেশ একদিন আমাকে তার টার্কিশ তোয়ালেটা দিয়ে বললে, দেখবেন দাদা, এ গামছায় চোখ-মুখ মুছে অন্ধ হয়ে যাবেন না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ-রকম বলছ? বললে, ডাক্তারের নিষেধ আছে, ছেলেপিলেদের দেই না আমার ব্যবহৃত জিনিশ, কারুরই ধরবার উপায় নেই। খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললাম, ডাক্তারের এ-রকম নিষেধ কেন? সুরেশ বললে, কামনাই বলুন প্রেমই বলুন, সে-সব জিনিশের তাড়া আমার বড্ড বেশি; কাজেই ডাক্তার, লোশন, অনেক কিছুই লাগে। কিন্তু তবুও গামছার এই দুর্দশা; পাশেই ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়েছিল তামাশা পেয়ে হাসতে লাগল। রমেশের মতিগতিও এইরকম। এই পরিবারটা যেন একটা অসুরের। অবাক হয়ে ভাবি, বাবা এমন দেবতার মতন মানুষ ছিলেন অথচ এই রকম হল কী করে।'

একটু চুপ থেকে, 'আজও সুরেশ রোজ সন্ধ্যায় ইনজেকশান করে বেরোয়।'

অনেকক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—'রাত্রে ফিরে এসে, ইনজেকশান করে আবার।'

—'তাই না কি?'

—'নিজেই আমাকে বলে, বলে জীবন এনজয় করছি।'

দু-জনেই চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে বসে রইলাম; আকাশে মেঘের ঘন গভীর আয়োজন, পেয়ারা গাছে বাদুড়ের পাখার ঝটপটানি, পশ্চিম দিকের মাঠে একটা বিড়ালছানার অবিশ্রাম কান্না—আমার কোঠার থেকে খুকির শান্ত নিশ্বাস।

আরো অনেকটা সময় কেটে গেল।

বিড়ালের ছানার কান্না থেমে গেলে বাবাকে—'যাক্, তবুও খুকিকে নিয়ে যাব আমি।'

—'অবিনাশবাবুর কাছে?'

—'হ্যাঁ; তিনি এখানে না এলেই ভালো।'

—'তা বেশ, তবুও ব্লাড দেখিয়ে এসো।'

—'তা দেখালেও হয়, না দেখালেও হয়।'

—'কেন?'

—'আমার মনে হয়, শরীরে আমার কোনো রোগ নেই।'

—'নেই?'

—না, আমার বোধহয়, পেট পরিষ্কার না হয়ে খুকির এই রকম পাঁচড়া হচ্ছে।'

একটু চুপ থেকে—'অবশ্য কলকাতায় এ চোদ্দ বছর যে খুব সুষ্ঠভাবে কাটিয়েছি তা নয়।'

—'আচ্ছা বেশ।'

—'দৈন্য নানাভাবেই এসেছে।'

—'একটা বিড়ালের ছানা কাঁদছে না।'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

—'পশ্চিম দিকের মাঠে বোধ করি।'

—'নিয়ে এলে হয় না?'

—'ছানাটাকে এনে কোথায় রাখবে?'

—'আমার এই কোঠায় রাখতে পার, ওই যে বেতের বড় ঝুড়িটা আছে ওরই ভিতর কয়েক টুকরো ন্যাকড়া রেখে শুইয়ে দিলে হয়তো।'

—'কিন্তু কোনো এক জায়গায় তিষ্ঠবে না যে, ঘুরে-ঘুরে কাঁদবে।'

—'কেন?'

—'হয়তো মাকে খুঁজছে।'

—'মা-ই-বা ওর আসে না কেন?'

—'সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে, বিধাতা জানেন; বেঁচে থাকলেও হয়তো দু-দশটা মাঠ পেরিয়ে। সারা গায়ে উনানের কালি মাখিয়ে। শূন্য ভাতের হাড়ির পাশে বসে জীবনের প্রবঞ্চনার কথা ভাবছে।'

—'আমি আর তোমার মা, তুমি আর কল্যাণী পরস্পরের আরো ঢের কাছে; কিন্তু আমাদের অবস্থাও অনেকটা ওই রকম, কী বলো হেম?'

টিটকারি দিয়ে বাবা একটু হাসলেন।

পরক্ষণেই—'না, তা নয়, ওই ছানাটার বেদনা যে কী গভীর তা আমরা ধারণাও করতে পারি না।'

বিছানার থেকে নেমে এসে টেবিলের লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিলেন।

বললাম—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'দেখি, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসি।'

—'কিন্তু আনলে তো কেঁদেকেটে একাকার করবে।'

—'তা করুক, তবু আশ্রয় পাবে তো।'

—'এ-ঘরে কারো যে ঘুম হবে না তা হলে; মা আর কল্যাণী হয়তো বিরক্ত হবে।'

লণ্ঠনটা দু-তিনবার দুলিয়ে-দুলিয়ে বাবা—'একটু গরম দুধ দিলে হয়তো কান্না থামবে বাচ্চাটার।'

—'দুধ এত রাত্রে কোথায় পাব?'

—'আচ্ছা, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে এসো দেখি।'

দক্ষিণের ঘরের থেকে ফিরে এসে বললাম—'না, দুধ নেই।' ছানাটার কান্নাও আর শোনা যাচ্ছিল না, খুব চেপে জল এল। জীবনের গভীর উদাসীনতা আমাদের পেয়ে বসল। সৃষ্টির ক্ষমাহীনতার রহস্যময় উপেক্ষার সাথে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে অন্ধকারের

ভিতর মাথা গুঁজে দু-জনে ঝিমুতে লাগলাম। গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে ঘরের ভিতর বিড়ালছানার শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম বাবার ঘরে আলো জ্বলছে, মানুষের নড়াচড়ার শব্দ, ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ছানাটাকে কোলে করে চুপচাপ বসে আছেন চোখ বুজে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পৃথিবী সব সময়ই কি বাস্তবিক অন্ধস্রোতে চলে?

নিশ্চিত বেদনা, নিষ্ফলতা ও মৃত্যুর সমুদ্রই কি জীবনকে ঘিরে রয়েছে?

তা নয় হয়তো, অন্তত আবিষ্কারের জায়গা আছে, হয়তো আমারও।

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গেলাম; এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তাহলে? কোথাও বিড়ালের ছানা নেই, আলো নেই, কিছু নেই, বাবার স্থূল নাকডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চারদিকে অন্ধকার শ্রাবণের বাদল ও বাতাসের বীভৎস আমোদ-টিটকারি এতক্ষণে জমল তা হলে?

আরো দুপুর রাতে, রাত তখন প্রায় দুটো-আড়াইটে হবে, মনে হল, কল্যাণীর ঘরে আলো জ্বলছে, ধীরে-ধীরে বিছানায় উঠে বসলাম—হ্যাঁ আলোই জ্বলছে।

এত রাতে আলো জ্বালিয়ে কেন?

বরাবরই বাতি নিভিয়ে ঘুমোবার অভ্যাস।

মিনিট পনেরো বিছানার উপর বসেছিলাম, দেখলাম আলো নিভছেও না, কারু কোনো সাড়া-শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। কল্যাণী, বা কোনো মানুষ, যে ও-ঘরে আছে তাই বোধহয় না। আস্তে-আস্তে খুকিকে শুইয়ে দিয়ে, বাতাস দিয়ে মশারি ফেলে, চটির মধ্যে আস্তে-আস্তে পা ঢুকিয়ে কল্যাণীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম বিছানার এক পাশে, একখানা আনন্দবাজার পত্রিকার উপর লণ্ঠনটা রেখে চুপচাপ বসে আছে। সামনে তিনটে জানলাই খোলা, যতদূর দৃষ্টি যায় কতকগুলো বড়-বড় তাল গাছ, তেঁতুল, হিজল, আম, অশ্বত্থ, বাঁশ, ধানখেত, আরো অনেক দূর গ্রামের প্রান্তর ও শ্মশান।

আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকতেই কল্যাণী—'তুমি এসেছ, ভালো করেছ।'

একটু হেসে বললে—'ভাবছিলাম, আমি তোমাকে ডাকব।'

বিছানার এক কিনার দেখিয়ে দিয়ে—'বোসো।'

একটা টিনের চেয়ার ছিল, সেইটে টেনেই বসলাম।

—'কেন, বিছানায় বসতে দোষ কী? আলো দেখে চলে এসেছ? না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম, তা হলে তো ঘুমোও নি।'

—'ঘুমিয়েছিলাম।'

—'তবে কিছুক্ষণ হল জেগেছ। কেন জাগলে? রাত এখন কটা?'

—'আড়াইটা।'

—'এই সময়ে জেগে উঠলে, কী মনে করে?'

—'এমনি, হয়তো মশার কামড় খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।'

—'মশারি ফেলে শোও নি বুঝি?'

—'না, এইমাত্র ফেলে দিয়ে এলাম।'

—'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেচারা। আমাকে যে ও পেয়েছে, বোঝা হল না। মনে করো, মাতৃহীন হয়েই পৃথিবীতে এসেছে।'

—'অনেক শিশুই তো আসে। তা নিয়ে এত চোখ ছলছল করবার দরকার কী?'

—'চোখ ছলছল করছে বুঝি আমার?' আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে কল্যাণী—'তুমি না এলে তোমাকে কিন্তু আমি ডাকতে পারতাম না।'

—'তা আমি জানি।'

—'সত্যি জানো নাকি? আমার মান-অপমানবোধ বাস্তবিক কিন্তু খুব বেশি।' আঁচলের খুঁটে আবার চোখ মুছে—'তুমি আমাকে অপমান কর নি বটে, কিন্তু এতরাতে তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে ডাকব—জীবনের মধ্যে আমার না আছে সেই প্রীতি, না আছে তেমন আবেগ।'

একটু চুপ থেকে—'বাস্তবিক, তোমার স্ত্রী হয়ে এসে তোমাকে বড্ড লাঞ্ছনা দিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে—নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখ যদি তুমি, তাহলে হয়তো উপলব্ধি করতে পারবে যে লোকসান আমার বেশি হলেও শূন্যতা যেন তোমার বেশি—কারণ সঞ্চয় বলে কোনোদিনই কিছু যেন পাও নি'—

পকেটের থেকে একটা সিগারেট বের করে—'জ্বালাব?'

—'হ্যাঁ, জ্বালাতে পারো।'

—'দেশলাই কোথায়?'

—'আমার বালিশের নীচেই আছে—দিচ্ছি।'

দেশলাই হাতে নিয়ে বললাম—'এত রাতে বাতি জ্বালালে যে?'

—'ঘুম আসছিল না।'

—'কেন, কী হয়েছে?'

—'না, হয় নি বিশেষ কিছু।'

—'আজ ভাত খেয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী দিয়ে?'

—'তোমরা যা দিয়ে খেয়েছ।'

—'দু-এক-দিনের মধ্যে আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি যাতে মনে আঘাত লাগতে পারে? এমন কিছু বলেছি বা করেছি বলে মনে তো পড়ছে না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে যদি কিছু বেদনা দিয়ে থাকি—'

—'না, তুমি তো কোনো বেদনা দাও নি আমাকে, কিছু বলো নি; তিন-চার দিন ধরে আমাদের মধ্যে কথাই তো হয় নি।'

—'তিন-চার দিন কথা হয় নি? কেন, কল্যাণী?'

—'এই বর্ষা-বাদলের মধ্যে মাঝে-মাঝে এই রকমই হয়; শুয়ে, ঘুমিয়ে, নিজেদের ভাবে থেকে দিনের পর দিন এমনি ভাবেই কেটে যায়।'

সিগারেটটা পকেটে রেখে দিলাম।

কল্যাণী—'তা ছাড়া আমার রুচি বুদ্ধিকে খুব শ্রদ্ধা করো তুমি?'

একটু হেসে—'কী রকম?'

—'তুমি জান, মাঝে-মাঝে আমি চিঠি লিখে ডায়েরি লিখে নিজেকে নিয়ে একটু থাকতে চাই; এ-সময়ে আমার কাছে কেউ আসে তা আমার ভালো লাগে না, এ

ভিতর মাথা গুঁজে দু-জনে ঝিমুতে লাগলাম। গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে ঘরের ভিতর বিড়ালছানার শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম বাবার ঘরে আলো জ্বলছে, মানুষের নড়াচড়ার শব্দ, ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ছানাটাকে কোলে করে চুপচাপ বসে আছেন চোখ বুজে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পৃথিবী সব সময়ই কি বাস্তবিক অন্ধস্রোতে চলে?

নিশ্চিত বেদনা, নিষ্ফলতা ও মৃত্যুর সমুদ্রই কি জীবনকে ঘিরে রয়েছে?

তা নয় হয়তো, অন্তত আবিষ্কারের জায়গা আছে, হয়তো আমারও।

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গেলাম; এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তাহলে? কোথাও বিড়ালের ছানা নেই, আলো নেই, কিছু নেই, বাবার স্থূল নাকডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চারদিকে অন্ধকার শ্রাবণের বাদল ও বাতাসের বীভৎস আমোদ-টিটকারি এতক্ষণে জমল তা হলে?

আরো দুপুর রাতে, রাত তখন প্রায় দুটো-আড়াইটে হবে, মনে হল, কল্যাণীর ঘরে আলো জ্বলছে, ধীরে-ধীরে বিছানায় উঠে বসলাম—হ্যাঁ আলোই জ্বলছে।

এত রাতে আলো জ্বালিয়ে কেন?

ববাববই বাতি নিভিয়ে ঘুমোবার অভ্যাস।

মিনিট পনেরো বিছানাব উপব বসেছিলাম, দেখলাম আলো নিভছেও না, কারু কোনো সাড়া-শব্দও পাওযা যাচ্ছে না। কল্যাণী, বা কোনো মানুষ, যে ও-ঘরে আছে তাই বোধহয় না। আস্তে-আস্তে খুকিকে শুইয়ে দিয়ে, বাতাস দিয়ে মশারি ফেলে, চটির মধ্যে আস্তে-আস্তে পা ঢুকিযে কল্যাণীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম বিছানার এক পাশে, একখানা আনন্দবাজার পত্রিকার উপর লণ্ঠনটা বেখে চুপচাপ বসে আছে। সামনে তিনটে জানলাই খোলা, যতদূর দৃষ্টি যায় কতকগুলো বড়-বড় তাল গাছ, তেঁতুল, হিজল, আম, অশ্বত্থ, বাঁশ, ধানখেত, আরো অনেক দূর গ্রামের প্রান্তর ও শ্মশান।

আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকতেই কল্যাণী—'তুমি এসেছ, ভালো করেছ।'

একটু হেসে বললে—'ভাবছিলাম, আমি তোমাকে ডাকব।'

বিছানার এক কিনার দেখিয়ে দিয়ে—'বোসো।'

একটা টিনের চেয়ার ছিল, সেইটে টেনেই বসলাম।

—'কেন, বিছানায় বসতে দোয কী? আলো দেখে চলে এসেছ? না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম, তা হলে তো ঘুমোও নি।'

—'ঘুমিয়েছিলাম।'

—'তবে কিছুক্ষণ হল জেগেছ। কেন জাগলে? রাত এখন কটা?'

—'আড়াইটা।'

—'এই সময়ে জেগে উঠলে, কী মনে করে?'

—'এমনি, হয়তো মশার কামড় খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।'

—'মশারি ফেলে শোও নি বুঝি?'

—'না, এইমাত্র ফেলে দিয়ে এলাম।'

—'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেচারা। আমাকে যে ও পেয়েছে, বোঝা হল না। মনে করো, মাতৃহীন হয়েই পৃথিবীতে এসেছে।'

—'অনেক শিশুই তো আসে। তা নিয়ে এত চোখ ছলছল করবার দরকার কী?'

—'চোখ ছলছল করছে বুঝি আমার?' আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে কল্যাণী—'তুমি না এলে তোমাকে কিন্তু আমি ডাকতে পারতাম না।'

—'তা আমি জানি।'

—'সত্যি জানো নাকি? আমার মান-অপমানবোধ বাস্তবিক কিন্তু খুব বেশি।'

আঁচলের খুঁটে আবার চোখ মুছে—'তুমি আমাকে অপমান কর নি বটে, কিন্তু এতরাতে তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে ডাকব—জীবনের মধ্যে আমার না আছে সেই প্রীতি, না আছে তেমন আবেগ।'

একটু চুপ থেকে—'বাস্তবিক, তোমার স্ত্রী হয়ে এসে তোমাকে বড্ড লাঞ্ছনা দিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে—নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখ যদি তুমি, তাহলে হয়তো উপলব্ধি করতে পারবে যে লোকসান আমার বেশি হলেও শূন্যতা যেন তোমার বেশি—কারণ সঞ্চয় বলে কোনোদিনই কিছু যেন পাও নি'—

পকেটের থেকে একটা সিগারেট বের করে—'জ্বালাব?'

—'হ্যাঁ, জ্বালাতে পারো।'

—'দেশলাই কোথায়?'

—'আমার বালিশের নীচেই আছে—দিচ্ছি।'

দেশলাই হাতে নিয়ে বললাম—'এত রাতে বাতি জ্বালালে যে?'

—'ঘুম আসছিল না।'

—'কেন, কী হয়েছে?'

—'না, হয় নি বিশেষ কিছু।'

—'আজ ভাত খেয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী দিয়ে?'

—'তোমরা যা দিয়ে খেয়েছ।'

—'দু-এক-দিনের মধ্যে আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি যাতে মনে আঘাত লাগতে পারে? এমন কিছু বলেছি বা করেছি বলে মনে তো পড়ছে না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে যদি কিছু বেদনা দিয়ে থাকি—'

—'না, তুমি তো কোনো বেদনা দাও নি আমাকে, কিছু বলো নি; তিন-চার দিন ধরে আমাদের মধ্যে কথাই তো হয় নি।'

—'তিন-চার দিন কথা হয় নি? কেন, কল্যাণী?'

—'এই বর্ষা-বাদলের মধ্যে মাঝে-মাঝে এই রকমই হয়; শুয়ে, ঘুমিয়ে, নিজেদের ভাবে থেকে দিনের পর দিন এমনি ভাবেই কেটে যায়।'

সিগারেটটা পকেটে রেখে দিলাম।

কল্যাণী—'তা ছাড়া আমার রুচি বুদ্ধিকে খুব শ্রদ্ধা করো তুমি?'

একটু হেসে—'কী রকম?'

—'তুমি জান, মাঝে-মাঝে আমি চিঠি লিখে ডায়েরি লিখে নিজেকে নিয়ে একটু থাকতে চাই; এ-সময়ে আমার কাছে কেউ আসে তা আমার ভালো লাগে না, এ

সব জান তুমি; অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো দূরে সরে থাক, এক মুহূর্তের জন্যও বাধা দিতে আস না। এ জন্য শ্রদ্ধা করি আমি তোমাকে।'

দেশলাইটা রেখে দিলাম।

কল্যাণী—'কিন্তু চলে যেতে হবে আমাকে কাল।'

—'কাল?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

—'এমন বিশেষ কোথাও না। আলমোড়া-মুসুরি পাহাড়ে নয়, যাব আমি', একটু থেমে-থেমে—'মেদিনীপুরের একটি পাড়াগাঁয়ে।'

—'কেন?'

—'দরকার আছে।'

—'মেদিনীপুরে তোমার কে আছেন?'

—'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।'

—'নেই?'

—'না, হেমন্তবাবু আছেন আর তাঁর স্ত্রী।'

—'কে তাঁরা?'

—'চিনবে না, সেই বাসাতেই যাব। আজ বিকেলে একটা চিঠি এসেছে।'

—'হেমন্তবাবুর?'

—'না, তাঁর স্ত্রীর।'

—'তোমাকে যেতে লিখেছেন?'

—'যেতে অবিশ্যি আমাকে লেখেন নি, কী ভরসায় যেতে লিখবেন। তাঁরা অত্যন্ত ভদ্রমানুষ—নিজেরা সংসার করছেন, পরের সংসারের উপর তাঁদের সহানুভূতি আছে।'

—'তবে তুমিই বুঝি যাওয়া ঠিক করলে?'

—'হ্যাঁ, একটি মানুষ মরছে—তার মৃত্যুশয্যায় তার কাছে আমি না থাকলে চলবে না।'

বলে, কল্যাণী চোখে আঁচল দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল। খানিকক্ষণ পর—চোখ মুছতে-মুছতে, 'থাইসিসের রোগী মেদিনীপুরের একটা গ্রামে পড়ে আছে এই বর্ষা বাদলের সময়ে।'

—'বড্ড খারাপ কথা—কেন, বাপ-মা নেই তার?'

—'নির্মলদার? কিচ্ছু নেই। আমার উপরেই তার সব নির্ভর করে—'

—'নির্মলদা?'

—'হ্যাঁ'

প্রায় পনেরো বছর ধরে মুখ চেয়ে থাকার মতো একটু বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, কে কার মুখ চেয়ে থেকেছে পনেরো বছর? কল্যাণী নির্মলের? না নির্মল কল্যাণীর? প্রয়োজন মতো অস্পষ্টতা দিয়ে এই সম্পর্কে নিজের বক্তব্যটুকুকে বেশ আবরণ দিয়ে রেখেছে কল্যাণী।

—'হেমন্তবাবুদের কিছু হন না কি?'

—'কে? নির্মলদা? কিচ্ছু না, ওরা ভদ্রসদ্র মানুষ, দয়া করে তাকে স্থান দিয়েছেন।'

—'তা নির্মলের এই রকম অবস্থা কেন? পৃথিবীতে সে একেবারেই একা বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ-রকম হল কেন? ইতিহাস কী?'

—'দু-জন কাকা আছেন বুঝি, তবে তারা ওর কোনো খোঁজখবর নেন না। ম্যাট্রিক পাশ করেই স্বদেশী করে জেলে যায়।'

—'কে? নির্মল?'

—'হ্যাঁ, সেই থেকেই জেলেই এক-রকম। এক সময় জেলের থেকে বেরিয়ে চামড়া ট্যানিং শিখবার চেষ্টা করেছিল।'

—'তা শিখল না যে?'

—'টাকা নেই, কড়ি নেই, স্বদেশীর দিকে ঝোঁক, কোনো একটা মার্কেট থেকে ধরে নিয়ে গেল।'

—'তোমার সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?'

—'আমাদেব বাড়ির পাশেব বাড়িতেই ওরা থাকত।'

—'কোথায?'

—'তখন আমরা মানভূমে ছিলাম। মানভূমে প্রায় দশ বছর থাকা, তারপর বাবা বাগনানে এলেন—বছর দুই-তিন পরে কালীঘাটে একটা বাসা ভাড়া করে ছিলেন—সেইখানেই বাবা মারা যান। সেই রাত্রে যে—'

কল্যাণী জানলার দিকে তাকিয়ে—'তা হলে কালই যাব আমি।'

—'তা যেও; দুঃখেব বিষয় তোমার কোনো টাকাকড়ি নেই।'

—'আমার গয়নার বাক্স সঙ্গে নেব, কলকাতায় বিক্রি করে নেব।'

—'কার সঙ্গে যাবে?'

—'তুমি দিযে আসতে পারবে না?'

একটু চিন্তা করে—'রবিকে যদি দেই তা হলে হবে না?'

—'রবি ঠাকুরপোকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে তো বেশ ভালোই হবে, আমার মনে হয় তোমার না-যাওয়াই ভালো, আমরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে উঠব, তাতে নির্মলদা আঘাত পাবে। মিছিমিছি তাকে অযথা কষ্ট দিয়ে লাভ কী? তাকে দুঃখ দেবার জন্য যাচ্ছি না তো আমি।'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'যাতে উৎসাহ পায়, ভরসা বোধ করে, জীবনের সম্বন্ধে আশা ফিরে আসে, আলো-বাতাস ভালো লাগে, ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস হয়, সেইজন্যই তো যাওয়া।'

বলে বালিশে মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল কল্যাণী। উঠল যখন, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

বললে—'তুমি এখনো বসে আছ?'

—'হ্যাঁ, গোটা তিনেক সিগারেট খেলাম বসে।'

—'তাই নাকি?'

—'টেরও পাও নি বুঝি?'

—'না তো।'

—'এক-এক সময় মানুষের মন বড় অপার্থিব হয়ে পড়ে কল্যাণী, পৃথিবীর স্থূল সামান্য কদর্য জিনিশগুলো সম্বন্ধে খেয়ালও থাকে না—মন থাকে জীবনের মহামূল্য

মহিমাময় জায়গায় বিচরণ করতে।'

মাথা কাত করে ধীরে-ধীরে কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে নিচ্ছিল কল্যাণী, চোখ জানলার ভিতর দিয়ে—দূর প্রান্তরের দিকে, কখনো দু-তিনটি নক্ষত্রের পানে।

বনলতার কথা মনে হয়—এমনি শান্ত ধূসর শ্রাবণের শেষ রাতে সেও কি কোনো দূর দেশে তার স্বামীর ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কোনো প্রান্তরের চিতার দিকে তাকিয়ে আমার কথা ভাবছে এমন করে?

আমি যদি যক্ষ্মায় বিছানা নি, সে যদি খবর পায়, এমনি করে সেও কী শিয়রের পাশে বসে থাকবার জন্য চলে আসবে?

না, তা আসবে না, এমন কোনো নারী নেই যে তার মৃত্যুশয্যা থেকে আমার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করবে।

কোনো রূপ নেই, রং নেই, রীতি নেই—কিছুই ঘটে না জীবনে।

আকাশ পরিষ্কার ছিল, ভোরবেলা একটু বেড়িয়ে এলাম। বেশ রোদ, আকাশ চমৎকার নীল! শরৎ আসে নি, তবে কাশ এসেছে।

বেশি দেরি করলাম না, তাড়াতাড়িই বেড়িয়ে ফিরলাম। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম কল্যাণী চা নিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে বললাম—'কোথায় চা পেলে?'

—'কেন, বাবা তো অনেক দিন হয় তোমার জন্য চা কিনে রেখেছেন।'

—'ওঃ।'

—'আমার কাছেই রেখেছিলাম—কিন্তু এদ্দিন তোমাকে দেওয়া হয়ে ওঠে নি।'

দেখলাম, বেশ দেখে-শুনে বিচার-সহানুভূতি দিয়ে চা করেছে। চা খাওয়ার পরে একটা ঝাঁটা নিয়ে এল, বললে—'তোমার ঘরটা যে কী হয়ে আছে, ভালো করে ঝাঁটও দেয় না কেউ।' অনেকক্ষণ বসে বেশ দরদের সঙ্গে ঝাঁট দিলে, কোনায় যেখানে যা ময়লা ছিল দেখলাম সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আমার বইয়ের তাকটা গুছিয়ে দিল। আমার টেবিলটা গোছাল। মাঝে-মাঝে এসে হাসিমুখে খুকিকে নিয়ে আদর করা, আমাকে মিষ্টি করে কথা বলা—কল্যাণীর এ-বড় গভীর রূপান্তর।

যে-সব জামা-কাপড় ছিঁড়ে ছিল, বোতাম ছিল না, অনেকক্ষণ বসে সেলাই করে দিল।

এক সের আন্দাজ বাংলা সাবান ও নোংরা কাপড়ের গাদি নিয়ে ঘাটে চলে গেল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর এসে—'যাক, আমি যাব না।'

—'কোথায়? মেদিনীপুরে? কেন যাবে না?'

—বছর তিন-চার নির্মলের দেখা নেই, কেমন যেন লজ্জা করে।'

—'রোগীর কাছে আবার লজ্জা-সঙ্কোচ কী কল্যাণী?'

—'কিন্তু সে তো আমাকে যেতে লেখে নি।'

—'কে? নির্মল? মৃত্যুশয্যার থেকে কী করে লিখবে?'

—'কিন্তু যারা লিখেছেন, তাঁরাও তো আমাকে যেতে লেখেন নি।'

—'তাঁরা মনে করেছেন, ও-রকম রোগের খবর পেলে তুমি নিজে থেকেই যাবে।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু আমার তো টাকাকড়ি নেই, শুধু হাতে গিয়ে কী লাভ।'

—'কেন গয়নার বাক্স নিয়ে যাবে—কলকাতায় বিক্রি করে নেবে।'

—'আহা! কেই-বা বিক্রি করে দেবে।'

—'কেন? রবি?'

—'রবি ছেলেমানুষ। সে কি আর পারবে?'

—'তুমি জান না কল্যাণী, রবি এ-বিষয়ে খুব ওস্তাদ, নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, তোমার চেয়ে ছ-সাত বছরের বড়, ব্যবসাদারের ছেলে।'

একটু থেমে—'তা, যদি তুমি তাই মনে করো, আমি এখান থেকেই বিক্রি করে দিতে পারি।'

—'না, থাক, এখানে বিক্রি করে দরকার নেই, লোকে কী মনে করবে।'

—'কিংবা কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে গিয়ে—'

—'এই তো একমাত্র গয়নার বাক্স আমার সম্বল, কিন্তু গয়নাগুলো আজ যদি বিক্রি করে ফেলি, একদিন অভাবের সময়?'

—'আজও তো কম অভাবের দিন নয়।'

—'কী রকম?'

—'নির্মলের মা নেই, বাপ নেই, একটা ভালো চেঞ্জের জায়গায় যায় এমন সঙ্গতি নেই বেচারির—'

—'ভালো চেঞ্জের জায়গায় নিয়ে গেলে কিছু হয় কী? বলো?'

—'হ্যাঁ।'

—'শিমুলতলা, মধুপুর?'

—'কিংবা ধর্মপুর হতে পারে, ভাওয়ালি হতে পারে।'

—'সে ঢের টাকা লাগে তাতে।'

—'টাকা তো লাগবেই।'

—'তাছাড়া আগের থেকে বেড-এর ব্যবস্থা করে নিতে হয়। আমি মেয়েমানুষ কী করে এত সব পারব?'

—'হেমন্তবাবুদের সাথে পরামর্শ করবে, দরকার হলে আমিও সঙ্গে যেতে পারি।'

—'মোটমাট সে ঢের টাকার দরকার, তোমারও কোনো চাকরি-বাকরি নেই, গয়না বিক্রি করলে চার-পাঁচশো টাকা বড় জোর পাব।'

মাথা নেড়ে—'পাঁচশো তো খুবই পাবে।'

—'কিন্তু খুকির কথাও তো ভাবতে হয়, মা হিশেবে তার উপর আমার দায়িত্ব রয়েছে।'

চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কল্যাণী—'গয়নার বাক্স তো আমারই জিনিশ শুধু নয়—এ তো খুকির জিনিশ। বেচারাকে বঞ্চিত করবার কোনো অধিকার আমার আছে কি?'

—'গয়নাগুলো এ-রকম কাজে লাগিয়েছ, ভবিষ্যতে হয়তো এ কথা শুনে খুকি অপ্রসন্ন হবে না।'

—'কিন্তু যদি হয়?'

—'তাহলে তার অপ্রীতিকে উপেক্ষা করলে অধর্ম হবে না আমাদের।'

কল্যাণী, একটু ইতস্তত—'শুধু তো এই নয়, ভগবান না করুন—কিন্তু বাবা চলে গেলে আমাদের কটা দিন অন্তত দাঁড়াতে হবে তো।'

তর্ক আর বহুদূর চালিয়ে লাভ নেই; এই গয়নার বাক্স সম্পর্কে পরাজয় মানবার ইচ্ছা এই নারীটির নেই।

বললাম—'গয়না বেছে টাকাকড়ি নাই-বা সঙ্গে নিলে, এমনিই যেও।'

—'শুধু হাতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কত সময়-অসময় নির্মলের কত খরচ দরকার হবে; আমি একটা পয়সাও দিতে পারব না?'

—'তোমার বাবা যে তোমার জন্য কিছু রেখে যেতে পারেন নি সবাই তো তা জানে; তোমার শ্বশুরবাড়িরও কোনো সম্বল নেই।'

—'কিন্তু তাই বলে দুটো বেদানা কেনার জন্যও পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকা।'

—'কুড়ি-পঁচিশ না হয় আমি জোগাড় করে দেব।'

কল্যাণী—'যক্ষ্মারোগীর কেউ কাছে আসে না। হেমন্তবাবুরা হয়তো সেবা করে-করে হয়রান হয়ে গেছেন, এখন সমস্ত সেবার ভার হয়তো পড়বে আমার ওপর।'

—'হ্যাঁ, টাকাকড়ি না থাকাতে যা পারলে না, সেবা দিয়ে তাই শুধরে দেবে। জীবনের এই দুঃসময়ে নির্মল বুঝবে যে, নারী, তার ভালোবাসা কত আশীর্বাদের জিনিশ।'

কল্যাণী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে বললে—'কিন্তু আমি তো আজ একা নই। সংসারের পাকে জড়িয়ে গেছি যে। আমার দায়িত্ব আজ অনেক দিক দিয়ে। সংসারের বধূ আমি। আমি মা। কোনো একটা রোগ যদি বাধিয়ে আসি তা হলে খুকির কী হবে? তোমাদের এই সংসারের শান্তিও যাবে একেবারে নষ্ট হয়ে। ছেলেবেলার স্বপ্ন, খেলা, স্নেহ, ভালোবাসা অবিশ্যি খুব ভালো জিনিশ, কিন্তু সজ্ঞানে হোক, অন্ধভাবে হোক জীবনের পথে আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছি যে শুধু আমার হৃদয়ের বিলাসের জন্য এতগুলো লোকের অনিষ্ট করা অন্যায় হয়।'

একটু চুপ থেকে—'হরিচরণের কাণ্ড দেখেছ?'

—'কেন? কী করে? কই দেখি নি তো।'

—'কপালে চোখ থাকলে তো দেখবে? গাছের সমস্ত পেয়ারা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে।'

নিস্তব্ধ ছিলাম।

—'পেয়ারা চিবুতে ইচ্ছা করে না অনেক সময় মানুষের? কই? ওর কল্যাণে বাকি আছে কি কিচ্ছু?'

—'পেয়ারা গাছ তো তিন-চারটে।'

—'একটা গাছেও একটা কড়াও যদি থাকে। না পাওয়া যায় খাবার সময় একটা লেবু হাতড়ে? একটা জাহাঁবাজ চোর।'

—'লেবু হয়তো কাকার জন্য নিয়ে যায়।'

—'বাবাকে বলে দাও না কেন তুমি?'

—'কী বলে দেব?'

—'এই সব অনাচারের কথা।'

—'তাহলে মেদিনীপুরে তুমি আর যাবে না?'

—'উঁহু। সেদিন দেখলাম খুকুর দুধ চুমুক দিয়ে খাচ্ছে।'

—'কে?'

—'হরিচরণ, আর-কে? রাতেরবেলা আবার ডিবে ভরে-ভরে কেরোসিন নিয়ে পালায়।'

মেদিনীপুরের পাড়াগাঁয়ে যক্ষ্মা রুগির সন্ধানে সে গেল না আর।

পানের বাটার কাছে বসে ধীরে-ধীরে আট-দশটা পান তৈরি করল, চিবুল—ডিবের মধ্যে ভরে নিল। তারপর ভালো করে সিঁথিপাটি করে টকটকে লাল পাড়ের একটা সুন্দর ধোপদুরস্ত শাড়ি বের করে সেজেগুজে পাড়ায় বিন্তি খেলাতে চলে গেল।

হয়তো বনলতাও আজ এই রকম।

দুপুরবেলা প্রায় আড়াইটের সময় মা ঘরে শুতে এলেন।

আমি—'ঘুমোবে না কি?'

—'হ্যাঁ, একটু জিরিয়ে নেই।'

—'তোমার খাওয়া-দাওয়া কখন শেষ হল?'

খাটে বিছানো মাদুরের উপর শুয়ে পড়ে—'এই প্রায় আধঘণ্টা আগে।'

—'আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়েছ তা হলে? বিনা বালিশে শুয়ে পড়লে যে?'

—'বালিশটার তুলো বেরিয়ে গেছে।'

—'আমার বালিশটা এনে দেই?'

—'কেন এই তো তোশকে মাথা দিয়ে শুয়েছি।'

বলে, মাথা তুলে ভাঁজ করা তোশকের উপর রাখলেন।

—'দক্ষিণের ঘরে আজ যে কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।'

—'ওরা ঘুমিয়েছে সব।'

একটু হেসে—'তাই আমি ভাবছিলাম।'

—'কী ভাবছিলে হেম?'

—'ভাবছিলাম বৃষ্টি পেয়ে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে—মা-র আজ আর কথাবার্তা বলবার লোক নেই।'

—'একটা বাংলা গল্পের বই দিতে পারো হেম?'

—'নেই কিছু।'

—'তা হলে ঘুমনো যাক।'

—'আমি ভাবছি দু-চার দিনের মধ্যে কলকাতায় যাব।'

—'তা, গেলেই পারো।'

—'টাকা জোগাড় করেছেন বাবা, কিন্তু গিয়ে কী করব সে বুঝে উঠতে পারি না, এই ছ-সাত বছর যত চেষ্টা করেছি তাতে মানুষ লাটসাহেব হয়ে যায়, আমি হয়ে গেছি পোড়াকাঠ। এখন কলকাতায় মানে একটা থাইসিস-টাইসিস কিছু তৈরি করে বাড়ি ফিরে আসা।'

মা চুপ করে ছিলেন।

—'যদি যক্ষ্মা নিয়ে আসি তাহলে তোমরা কী করবে?'

—'উঠোনের এককোণে একটা আটচালা তুলে দেবেন তোমার বাবা, সেইখানে তোমার বউকে নিয়ে থাকবে।'

—'যক্ষ্মা হলে?'

—'হ্যাঁ; আমরা জোগার ওষুধ পথ্য আর বউমার কাছ থেকে দিন-রাত সেবা পাবে। না—সেটুকু ভরসাও তার কাছ থেকে নেই।'

—'সেবা বরং তুমিই করবে; নাঃ, কলকাতায় আজকাল বড্ড যক্ষ্মা হচ্ছে। আমার যদি হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

মা চুপ করে ছিলেন।

—'বয়স বেড়ে গেছে, চাকরি নেই, শরীরের ধাত চিরকালই খারাপ; টিকটিক করে মনটা ছিল, সেও গেছে যেন ছিঁড়ে টুকরো হয়ে। তারপর দিনরাত কলকাতার পথে-পথে ঘোরা। শ্রাবণ ভাদ্রের বৃষ্টি ও রোদ। মেস-এর যাচ্ছেতাই খাওয়া। এই বয়সে এ-রকম মনমরা হৃদয় নিয়ে যদি দেখি রোজই অল্প-অল্প জ্বর হচ্ছে?'

মা—'মেসে কী খেতে দেয়?'

—'তা তো তুমি জানোই।'

—'আমাদের বাড়ির চেয়েও খারাপ?'

—'আমরা অন্তত ভালো ডাল পাই আর খানিকটা দুধ।'

—'ওখানে দুধ দেয় না ভাতের সঙ্গে?'

—'দুধ খেতে হলে পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়।'

—'অল্প-অল্প জ্বর হয় নাকি তোমার?'

—'না, তবে মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন শরীর গরম হয়েছে—কেমন অরুচি হয়, কিছু ভালো লাগে না। একটা থার্মোমিটার থাকলে দেখা যেত কী রকম টেম্পারেচার হয়, একটা চার্ট তৈরি করতে পারতাম।'

—'জ্বর-জ্বর বোধ করলে কী করো তখন?'

—'বিছানায় শুয়ে থাকি, আর ভাবি, ভগবান, আর যাই হোক, টি-বি-র বীজ যেন শরীরের থেকে না বেরোয়।'

—'একটা থার্মোমিটার কিনলে পার?'

—'কিনব-কিনব করে আর হয়ে ওঠে না।'

—'ডাক্তার দেখালেই পার।'

মাথা নেড়ে—'হয়তো বলে দেবে স্পুটামের মধ্যে যক্ষ্মার বীজ, তখন কী উপায়?

—'তা বলবে কেন? যক্ষ্মা তোমার হয় নি; কেনই-বা হবে? তোমার বাবা তো সত্তর বছরের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে আছেন, আমিও তো এত জলঝড়ে ভিজি, কিচ্ছু হয় না, আমার মনে হয় ডাক্তার দেখিয়ে খানিকটা কুইনিন খেলে ঠিক হয়, কিংবা একটা মিক্সচার।'

—'এবার গিয়ে স্পুটাম পরীক্ষা করাব ভাবছি।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'রক্তও পরীক্ষা করাব।'

—'মিছিমিছি টাকা খরচ করবি কেন? তোর মেজকাকার সঙ্গে অনেক ভালো ডাক্তারের জানাশোনা আছে। বিনি পয়সায় করিয়ে দেবে।'

—'কী দরকার, কতই-বা আর নেবে?'

—'আচ্ছা, আমি না হয় সুরেশবাবুকে বলব আজ, তিনি খুব খুশি হয়েই রাজি হবেন।'

—'না, থাক, বলতে যেও না।'

—'সঙ্কোচ করছিস কেন হেম? আমি তো খুব নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।' একটু চুপ থেকে—'অন্তত আজ তুমি বলতে যেও না, দু-তিনটে দিন ভেবে দেখি।'

—'বেশ, এখানে তুমি তো ক-দিন আছ'

—'হ্যাঁ।'

—'উনিও আছেন ক-দিন।'

একটু চুপ থেকে—'দেখাতে হলে এখানকার অবিনাশবাবুকেও তো দেখাতে পারি। মথুরবাবুও আছেন। এ তিন মাস এখানে থেকে একটু ভালোই বোধ করছি; হজমের গোলমাল তেমন হয় না, রাতেও ঘুম হয়।'

—'সুরেশবাবুও বললেন—বেশ ঘুম হচ্ছে তার।'

—'পেটের গোলমাল হয় মেজকাকার'

—'না, তাও হয় না।'

—'খান তো মন্দ না।'

—'তবে কলকাতায় যে ঢের কম খান।'

—'কী সব ওষুধও খান বোধ করি খাবার পর?'

—'কয়েকদিন থেকে সোডা ওয়াটার আনছেন।'

একটু চুপ থেকে—'সোডা ওয়াটার কি শুধুই খান?'

মা নিস্তব্ধ ছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম না আর।

—'সোডার দামটা যেন তোমার বাবা দিয়ে দেন।'

—'বাকিতে আনাচ্ছেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'মেসে গিয়ে প্রথম দিকটা বড্ড খারাপ লাগে, মা। গিয়ে পৌঁছই একেবারে দুপুরবেলা, মানুষজন নেই, এমন খাঁ খাঁ করতে থাকে, খুকির জন্য বড্ড কষ্ট লাগে।'

মা......

—'তোমার কথা মনে হয়, বাবার কথা মনে হয়; অবাক হয়ে ভাবি, তোমাদের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে কিনা?'

মা....

—'নীচে নেমে দেখি চৌবাচ্চা শূন্য; খানিকটা ঠাণ্ডা ভাত, পুঁয়ের চচ্চড়ি আর ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে, উপরে চলে এসে, পথের ধুলো-কালি-মাখা বিছানাটা পাতি। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু সাধ্য নেই—ছটফট করে উঠে বসতে হয়।'

মা....

—'বিছানায় উঠে বসে ফুটপথের ওপাশে মস্ত তেতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকি—দেখি আকাশপ্রদীপ দেওয়া শিকের ওপর একটা চিল বসে আছে, কতকগুলো পায়রা; ছাদে তারের ওপর চওড়া লাল পাড়ের, কস্তা কালো পাড়ের কতকগুলো শাড়ি শুকুচ্ছে—এক ঝলক শান্ত নিরিবিলি ঘরকন্নার গন্ধ ভেসে আসে; এমন লাগে।

মা....

—'চেয়ে দেখি একজন বর্ষীয়সী মহিলা ভিজে চুলে সিন্দুর মাথায় লুচি ভাজবার ঝাঁঝরি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কিংবা একজন তরুণী স্নান-খাওয়ার পর পান চিবুতে-চিবুতে...।'

মা....

—'মেসের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমি আর। চাকরটাকে দু-পয়সা বকশিস দিই—বলি, রাস্তার কলে এক বালতি জল তুলে আনতে, তাই দিয়ে স্নান করে পথে বেরিয়ে পড়ি।'

—'কোথায় যাও?'

—'দুপুরবেলা কোথায় আর যাব? সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাই সাত বছর ধরে গিয়ে দেখে এসেছি। ওয়াই-এম-সি-এ-তে গিয়ে কাগজ পড়ি খানিক। রেইনট্রি গাছের নীচে গোলদিঘির বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। আকাশ, মেঘ, দিঘির জল, চারপাশের ফুলের কেয়ারি ও দেবদারুর ডালপালার দিকে তাকাই। মনে হয় পৃথিবীটা তো সুন্দর ছিল, মানবজীবনের সম্ভাবনাও ছিল চমৎকার। এত সহজে বসে উপলব্ধি উপভোগ করছি এ তো ঢের, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে মাছির মতো মনে হবে অন্ধকারের মধ্যে একটা অন্ধ গুবরে পোকার যতখানি নিস্তার তার চেয়ে একটুও বেশি পথরেখা দেখবার উপায় থাকবে না।'

মা...

—'কয়েক মিনিট বসে থাকতে-থাকতে জীবনটা কেমন ছটফট করে ওঠে, আবার বেঞ্চির থেকে উঠে গিয়ে ফুটপথে দাঁড়াই। রাস্তা পেরুতে গিয়ে দেখি একটা বাস আর-একটু হলেই আমাকে গিলে ফেলছিল আর কি।'

—'কলকাতার পথে খুব সাবধানে চলতে হয়।'

—'হ্যাঁ সাবধানে বরাবরই চলি। তবে মাঝে-মাঝে মনটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।'

—'বাসের ধাক্কা খেলে তো আর রক্ষা নেই।'

—'অবিশ্যি সম্ভাবনাটা খুব কম।'

—'ফুটপথ দিয়ে চলো।'

একটু চুপ থেকে—'তারপর চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।'

—'দুপুরবেলাও চা পাওয়া যায়?'

—'হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টা।'

—'কিন্তু দুপুরবেলা চা খেতে ইচ্ছে হয় তোমার?'

—'ওখানে থাকতে তো মাসের মধ্যে দু-চার দিন যাই।'

একটু হেসে—'তুমি আছ, বাবা আছেন, খুকি আছে, তার মা আছে— চারদিকে আমার কল্যাণের মতো রয়েছ তোমরা, এ কথা ভাবতে গিয়েই মন তৃপ্তি হয়ে থাকে। মনকে প্রবোধ দেবার জন্য কোনো অনাবশ্যক কথা বা ঘুষের দরকার হয় না এখানে?'

মা....

—'কিন্তু কলকাতায় মনটাকে স্থির করবার জন্য এমনি সব ছোটখাটো ঘুষের দরকার হয়ে পড়ে।'

মা....

—'চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি।'

—'দুপুরবেলা আরো অনেকে চা খায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'ক্রমাগত মানুষ এসে খেয়ে যাচ্ছে।'

—'হ্যাঁ'

—'কটা অব্দি?'

—'সে প্রায় রাত বারোটা।'

—'সেই এক পেয়ালায়ই হয়তো পর-পর পঁচিশ জন খেল?'

—'প্রায় সেই রকমই হয়; তবে পেয়ালা ধুয়ে নেয়।'

—'ধুয়ে নিলেও তো আমার খেতে প্রবৃত্তি হয় না; আর কেমন করেই-বা ধোয়—দায়সারা গোছের নিশ্চয়ই? তা ছাড়া আবার কী? ছি, খেতে ঘেন্না করে না তোমার?'

—'এক কাপ চা সামনে রেখে ভাবি, কলকাতায় এসে এবার আর প্রবঞ্চিত হয়ে ফিরে যাব না, জীবন এবার পুরস্কার পাবেই; মনে ধীরে-ধীরে আরো উৎসাহের সঞ্চার হয়। খানিকটা বল পাই।'

মা....

—'মনে মনে নানা রকম ছক কাটি, কী করব না-করব গতিবিধি ঠিক করি। চায়ের দোকানে অনেক ক্ষণ বসে থাকি।'

মা....

—'কিন্তু পথে নেমেই কী রকম শূন্যতা, কোনো উপায় দেখি না যেন। চার দিকে সাজানো-গোছানো দালান-দোকান, সাইন বোর্ড, প্রতিষ্ঠিত জীবনের পরিচয় দেয়। ট্রামে-বাসে মানুষের দল তাদের জীবনের সঙ্কল্প ও কষ্টের কথা প্রচার করে চলে—বড়-বড় আপিস-আদালত কলেজ-স্কুল ইনস্টিটিউশানগুলো। জীবনের ব্যস্ত মোহাসক্ত মৌমাছির নির্ব্বিবাদ নিরপরাধ গুঞ্জন; অপরূপ। গ্রামোফোনের দোকান থেকে গান ও টাকার ঝনঝনানি জড়িয়ে মিশিয়ে কানে এসে লাগে। বুঝতে পারি না জীবনের প্রয়োজনে কোনো আওয়াজটার রূপ ও সফলতা বেশি, এগিয়ে যাই—রেডিও তার কাজ করে চলেছে; কাগজওয়ালা সব কাগজ বিক্রি করে ফেলেছে, এখন নাগরাই পায় দিয়ে বাড়ি চলে গেলে পারে, কিংবা সাইকেল চড়ে আরো একগাদা কাগজ নিয়ে আসবে; পানওয়ালির ভিজে চুল সিথায় সিন্দুর, অফিসের বাবুদের পান জোগাতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে সে। বইয়ের দোকানে বিস্তর ভিড় হয় তো—কলেজে সেশান আরম্ভ হল। হু-হু করে নোট কাটছে; কাটা কাপড়ের দোকানে মৌতাত লেগে গেছে, হয়তো সেলের বিজ্ঞাপন। থিয়েটারে তিনটের সময় থেকেই ম্যাটিনি আরম্ভ হবে, একটা হ্যান্ডবিল হাতে এসে পড়ে, একটা নতুন ব্র্যান্ডের সিগারেটের বড় পোস্টার নিয়ে গাধার টুপি ও সঙের পোশাক এঁটে সারি-সারি কতকগুলো লোক নিঃশব্দে হেঁটে যায়। বালিগঞ্জের দিক থেকে একটি প্রসন্ন প্রদীপ্ত পরিবার অসংখ্য সুটকেস-ট্রাঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে শিয়ালদার দিকে ছুটছে। হয়তো দার্জিলিঙে যাবে। খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল, একটা শেড খুঁজে বার করতে-করতে ঢের ভিজে গেলাম। ভিজে ফুটপথে হাঁটতে-হাঁটতে একজন রোগীর ছিটনো থুথু আর-একটু হলেই গায় লাগছিল, একটা দোকানের মস্তবড় পাপোশ আমার মুখের সামনে ঝেড়ে নিল। একটা মহিষের লেজের বাড়ি খেলাম। রেলিং-ঘেরা এক বারান্দায় এক অনিন্দ্য সুন্দর খুকি দাঁড়িয়ে আছে, সেই একটি অনিন্দ্য সুন্দর খুকির মুখ অনেকক্ষণ মনকে আকর্ষণ করে রাখে। নিরর্থক একটা বেটনের গুঁতো খেলাম। দেখি, বড় রাস্তার মোড়ে একটা উত্তেজিত ভিড়ের কাছে এসে পড়েছি। এগিয়ে চলি, কয়েকটা কাক দেবদারু গাছের ভিজে শাখার দিকে উড়ে গেল। খুপরির মতো স্টলে বসে লুঙ্গিওয়ালা মুসলমান ছোকরারা নিদারুণভাবে

শাল পাতা কেটে চলেছে, বিড়ি তৈরি করবে।'

মা....

—'এক-এক দিন রেসের মাঠে যেতে ইচ্ছা করে।'

মা....

—'কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না আর; মাঠটা কোথায় তাও ঠিক জানি না।'

মা....

—'তিন টাকার টোটে এমন চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে এক-এক দিন খবরের কাগজ খুলে দেখতে পাই, অবাক হয়ে ভাবি দুই-তিন মাসের টিউশানের টাকা পাঁচ মিনিটেই পেয়ে গেল? উৎসাহ ও উত্তেজনার কলরবের ভিতর? প্রলুব্ধ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি খানিকক্ষণ—কিন্তু স্থির হয়ে নিজের স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়—তা না হলে বাঁচতেও পারব না যে।'

মা....

মা অবশ্য রেসকোর্স, রেস বা টোটের কোনো মানেও জানেন না।

—'লটারির টিকিট কলকাতায় গিয়ে ইদানীং কিনছি—এক টাকায় চার আনা পাওয়া যায়, আট আনার কিনি।'

—'টিকিট কিনলে কী পাওয়া যায়?'

—'কপালে যদি থাকে আট-দশ হাজার টাকাও জুটতে পারে।'

—'আট আনার টিকিটে?'

—'একখানা চার আনার টিকিটেও।'

—'তাই নাকি? তাহলে তো সে বড় সৌভাগ্যের কথা।'

—'কিন্তু কয়েকবার কিনে-কিনে দেখেছি—শুধু টিকিটের পয়সাটাই যায়; এখন বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, কিনব না আর।'

—'আরো দু-তিন বার কিনলে পার।'

—'মাঝে-মাঝে মনে হয় দু-একজন মাড়োয়ারির পকেট কেটে নিলে পারি।

—'এমন কথাও মনে হয় তোমার?'

—'হ্যাঁ, অত্যন্ত অবসাদ নিরাশার মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় বইকি; কোনো বড়লোকের বাড়ি, ব্যাঙ্ক বা মাড়োয়ারির টাকার ওপর লোভ জন্মায়; তাদের তো অনেক আছে, অত আতিশয্যের দরকার কী? হৃদয় মনের স্থূলতা ও পাশবিকতায় অর্থ জমিয়ে অর্থ খরচ করেই-বা কী লাভ তাদের? আমাকে কিছু দিক—মানুষের ক্ষমা ও দাক্ষিণ্য বিধাতার হৃদয়হীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাক—দেশে ফিরে যাই, দু-মুঠো খেয়ে বাঁচি, কবিতা লিখি, শার্ট তৈরি করি।'

হাসতে লাগলাম।

—'কিন্তু এ-ভাবে শিগ্‌গিরই কেটে যায় আমার। দারিদ্র্যের সংগ্রামের ভিতর অজস্র নিপীড়িত আত্মা ফুটপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখি। চেয়ে দেখি কুষ্ঠ রোগী জীর্ণশীর্ণ কাঠের ঠেলা গাড়িতে বসে আছে তার। ভিজে ফুটপথের উপর একপাশে কাদা-জলের মধ্যে আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে একটি নারী পড়ে রয়েছে—দেবদারু গাছের ছায়ায় নয়, মেঘের সোনায় নয়, কিন্তু এই পথে-ঘাটে রাস্তায় পৃথিবীর আদি অসীম স্থিররূপ আবিষ্কার করি আমি। নিজের জীবনের বেদনাকে মুকুটের মতো মনে হয়। বাদলের বাতাসে, আবছায়ায়, জনমানব, ট্রাম-বাস, গাছের পাতাপল্লব, পাখপাখালির

কলরবে এক-একটা সন্ধ্যা বড় চমৎকার কেটে যায় আমার।'

মা....

—'কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।'

—'কার? তোমার? কেন?'

—'চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সে রকম মৃত্যু নয় আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে; মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না আসি।'

—'ও, এই রকম? কিন্তু এ তো কোনো সম্ভবপর কিছু কথা নয়। আউটরাম ঘাট কোথায়?'

—'গঙ্গার একটা ঘাট।'

—'কোনদিকে বলো তো?'

—'তুমি দেখো নি।'

—'ঢের জাহাজ দেখা যায় বুঝি সেখান থেকে?'

—'তা যায়।'

—'রেঙ্গুনে যে-জাহাজগুলো যায় তা দেখেছ?'

—'দেখেছি।'

—'আমি একবার দেখেছিলাম—সে। অতবড় জাহাজ মানুষ বানায় কী করে?'

—'গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয় মা?'

—'কেন? সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা কেন?'

—'কিংবা, খুন করে জেলে গেলে?'

—'স্ত্রী-সন্তান আছে, মিছিমিছি জেলে গিয়ে কী লাভ?'

—'জেলের বাইরে থেকেই-বা কী করতে পারি?'

—'বাইরে থেকে চেষ্টা তো করতে পারবে।'

মাথা নেড়ে—'হৃদয়ে যদি বিশ্বাস থাকত, তাহলে অনেক আগেই জেলে চলে যেতাম।'

—'কী সে বিশ্বাস?'

—'যে-বিশ্বাসে মানুষ জেলে যায়। সংসার ছেড়ে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াতেও ঢের বিশ্বাস লাগে, তাও নেই।'

—'তোমার রকম-সকম দেখে মনে হয় সংসারেও কোনো বিশ্বাস নেই তোমার।'

—'তা বরং খানিকটা আছে।'

—'কই? কোনো নজির তো পাই না।'

—'দেখো না, বিয়ে করেছি, আজকালকার দিনে কোনো বিষয়াসক্ত লোকও বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু আমার সংসারাসক্তি তাদের চেয়েও যে কত গভীর, কল্যাণীকে এখানে এনে যে ক্ষয় করছি তাই কি তার প্রমাণ নয়?'

—'এত তো বোঝ তবু অকর্মণ্য থাক কেন?'

—'তারপর দেখ, একটি সন্তানেরও জন্ম দিয়েছি। পৃথিবীতে এসে সংসারকে পুজো করবার লোলুপতাই তো অত্যন্ত বীভৎসভাবে দেখালাম।'

—'এখন থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করো।'

—'চেষ্টা করছি। অন্তত সন্তানসৃষ্টি করব না আর।'

—'বেশ, তা না-করাই ভালো। কোনো কালেও যেন না-হয় আর।'

—'সাজতে চেয়েছিলাম জীবনের সেবায়েৎ, সেজে বসেছি সেবাদাসী। উপভোগ নেই, অন্ধতা ও বেদনার ভোগ্য হয়ে বেড়াচ্ছি।'

—'যাও, কলকাতায় গিয়ে একটা টিউশান জোগাড় করে নাও। এ দুর্যোগ আস্তে-আস্তে ঘুচিয়ে ফেলো।'

—'বাবা বলছিলেন চেতলা কিংবা উল্টোডিঙ্গিতে টিউশান পেলে না-নেওয়াই ভাল।'

মা ভ্রূকুটি করে—'কেন? নেবে না কেন?'

—'এই-বৃষ্টি বাদলা, অনেকটা পথ হাঁটাহাঁটি করতে হয়। মেস থেকে প্রায় দু-তিন মাইল দূরে।'

—'সেইজন্য তোমার বাবার কষ্ট বুঝি? তুমি কি মনে কর পৃথিবীতে তুমি একাই এ-রকম কষ্ট কর? পৃথিবীতে বাপ-মায়ের সন্তান তুমি কি শুধু একা? কত কৃতী, মেথরের কাজ করছে, তাদের বাপ নেই? কত ছেলে দেশ-ভুঁই তিন দিনের পথের পিছনে ফেলে গঞ্জে-গঞ্জে কয়লার কাজ করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা বাপ-মায়ের সন্তান না?'

—'বাবাকে বলো না মা, কিন্তু তোমাকে বলছি, চেতলায় হোক বা ঢাকুরিয়ায় হোক দশ-দশ টাকার টিউশান পেলেও আমি নেব।'

একটু চুপ থেকে মা—'মেসের থেকে চেতলা কত দূরে?'

—'এই মাইল চারেক।'

—'আর ঢাকুরিয়া?'

—'সেও ওই রকম।'

—'হেঁটে যাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন, ট্রামে গেলে হয় না?'

—'ধরো, যদি দশ টাকা দিতে চায় তাহলে ট্রামে গেলে আর কী থাকে?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'সকালবেলা যেও।'

মাথা নেড়ে—'তাই যাব। কিন্তু ভয়, পৌঁছতে-পৌঁছতে ছেলের স্কুলের বেলা হয়ে যায় যদি।'

—'তাই তো; তা হলে সন্ধ্যার পর যাবে।'

—তাই তারা যেতে বলবে।—'কলকাতার ভিতরে টিউশান পাও না?'

—'পেলে নেব।'

মা আমার মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে—'আমি আশীর্বাদ করি, তাই যেন পাও।'

একটু চিন্তিতভাবে—'কিন্তু বাইরে যদি পাও?'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'তা হলে একটা ছাতা কিনে নিও।'

ঘাড় নেড়ে বললাম—'আচ্ছা।'

জননীর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

বললাম—'বাতাসা আছে মা?'

—'কেন?'

—'একটু চিবুতাম।'

—'রাতে ভাতের সঙ্গে খেও।'

একটু চুপ থেকে—'মেজকাকার জন্য আজ লুচি ভাজবে না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমাকে একখানা দেবে?'

—'গুনে দশখানা ভাজি শুধু।'

—'আজ না-হয় এগারো খানা ভাজলে।'

—'কই? তোমার বাবা তো এ-রকম বলেন না?'

—'লুচির জন্য বেগুন ভাজ বুঝি?'

—'হ্যাঁ বেগুন ভাজি, ডিম ভাজি।'

মায়ের হৃদয়—একখানা লুচি নিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই আমার জন্য। বিকেলবেলা ভাবছিলাম, লুচিটা পেলে খুকিকে ছিঁড়ে দেব খানিকটা। বাকিটা দেব কল্যাণীকে। তারা আমাকে রাজা মনে করবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু সন্ধ্যা উতরে রাত হয়ে গেল—তবুও কেউ এল না। জল ধরে গেছে।

সন্ধ্যাব সময় বিরাজ এসে হাজির হল। ছেঁড়া জুতো পায়, মাথায় অজস্র বেযাদপ চুল আইনস্টাইনের মতো, মাইনাস দশ-নং এর চশমা, উৎক্ষিপ্ত দাঁড়কাকের ডানার মতো বিরাট গোঁফ, ছেঁড়া ঢলঢলে নোংরা জামা। যেখানে-সেখানে কালির চ্যাপসা। বুকে নকল সোনার বোতাম। জমকালো জীবনের কাজ অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে—এখন জোর করে বেচারিকে আটকে রাখা শুধু।

মস্তবড় শাদা ন্যাকড়ার তালিওয়ালা ছাতাটা কয়েকবার ঝেড়ে লম্বা-চওড়া দোহারা শরীর নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

—'এসো বিরাজ।'

বাজখাই গলায় চিৎকার করে—'যা চেপে জল এল। তোমাব এখানেই আস্তানা নিলাম। কী করছ, সন্ধ্যার সময় বসে-বসে? বেরোও না।'

—'না, জলের ভিতর আজ আর বেরোলাম না। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই—কতদিন হবে হে? প্রায় বছরতিনেক?'

—'সে-সব মনে আছে কার? হ্যাঁ, বসে-বসে হিশেব-কিতেব করি, আব কী? তোমাদের বাড়িটা পথের ধারে পড়ল—ঝড়-জল—খেয়াল হল—এলাম চলে।'

—'বোসো।'

একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম।

—'চেয়ার তোমার যা। দেখছি তো, লোহার, কাঠের না কাঁঠালের? ঠাকুর্দাদা কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি? বসলে ভাঙবে না তো।'

—'ভাঙলে না-হয় আর-একখানা চেযার দেব।'

—'চেয়ারের দাক্ষিণ্য খুব আছে দেখি', চশমা খুলে হো হো করে হাসতে লাগল।

—'আজকাল প্রাকটিশ করছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখানকার বারেই? চলছে কেমন?'

—'লগি গুতিয়ে চলেছি।'

—'শুনলাম ওকালতিতে সুবিধা হচ্ছে না কারো আজকাল?'

—'কেন হবে না? যারা ইডিয়েট তাদের হয় না।'

—'তুমি তা হলে পাচ্ছ বেশ?'

একটা হুমকি দিয়ে বললে—'ব্যবসা কি চাকরি নাকি, যে বাঁধাধরা থাকবে? আজ না-হয় মাসে পনেরো টাকাও না পেলাম—কিন্তু তাই বলে কাল পনেরোশো টাকা পেতে বাধা কোথায়?'

—'তা নেই অবিশ্যি।'

—'এই তো সাব-ডিভিশনে প্র্যাকটিশ করছি, এরপর সদরে যাব।'

—'কেস নিয়ে?'

—'কেস নিয়ে কেন? সেখানে গিয়ে বসব, হিয়ার করব, সরকারি উকিলকে ইঁদুরের গর্তে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।'

হা হা করে হেসে উঠল আবার।

বিরাজ অবিশ্যি মেধাবী ছাত্র ছিল, কিন্তু এখন তার পাতলুন, বোতাম ও জামার দিকে তাকিয়ে বোধহয়, মেধার পুরস্কার সে বিশেষ কিছু পাচ্ছে না।

—'শিগ্‌গিরই বসছ, গিয়ে তা হলে, সদরে?'

—'কালও যেতে পারি, তিনবছর পরেও।'

চুপ করে ছিলাম।

—'সদর থেকে যাব হাইকোর্টে।'

—'হাইকোর্টে যাবে?'

'নিশ্চয়ই।' বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—'এই সব ডিস্ট্রিক্ট জজদের ঘাড়ে চেপে চেপে বেড়াব।'

—'কী করে?'

—'পনেরো বছরের মধ্যে উইগ মাথায় দিয়ে গিয়ে বসব; ইয়া টাই ঝুলিয়ে, কালো গাউন পরে—হাইকোর্ট।'

—'হাইকোর্টে ব্যাক করবার কেউ আছে তোমার?'

—'ব্যাক? স্যার রাসবিহারীর কে ছিল? ঘাড়ের ওপর একটা হেডপিস পেয়েছি কিসের জন্য।'

খুকি বিছানায় ঘুমিয়েছিল, বিরাজের বক্তৃতার গরমে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল।

বিরাজ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে—'এটি বুঝি তোমার মেয়ে?'

—'হ্যাঁ।'

আমি—'বসো বিরাজ। ওকে ওর ঠাকুমার কাছে দিয়ে আসি।'

রান্নাঘরে খুকিকে রেখে দিয়ে এসে দেখি, বিরাজ চশমাজোড়া কপালে আটকে বাংলা খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছে।

আমাকে দেখেই চোখ কপালে তুলে বললে—'এই সব সাপ-ব্যাঙ পড়ো নাকি তুমি?'

—'কাগজটা আজ রেখেছিলাম। কেন? কী লিখেছে!'

বিরাজ কাগজটা একেবারে চোখের কাছে তুলে নিয়ে বললে—'লিখেছে রালোয়া তহশিল....'

—'সে কোথায়?'

—'তারিখ দিয়েছে, গোয়ালিয়র থেকে।'

—'ও।'

—'রালোয়া তহশিলের মুসনে গ্রামের এক পাল গরু পাঁচদেওলি পাহাড়ের গোচারণ ভূমিতে চরিতেছিল।'

—'বেশ কথা।'

—'চরিতে-চরিতে গাভীর পাল এক বিস্তৃত বনজঙ্গলের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছায়।'

—'আচ্ছা।'

—'প্রকাশ, যে সেই সময়ে একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে একটি গরুর উপর লাফাইয়া পড়ে।'

—'বটে?'

—'অন্যান্য গরুগুলি পলাইয়া না যাইয়া একযোগে ব্যাঘ্রটিকে আক্রমণ করে।'

—'বাঃ।'

—'গাভীগণের তীক্ষ্ণধার শিঙের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রটি জঙ্গলের ভিতর পলাইয়া যায়।'

—'হুঁ?'

—'বহু গ্রামবাসী দূর হইতে এই গাভীদলের সমবেত আক্রমণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।'

—'বাঃ বাঃ।'

—'এই সব আঁস্তাকুড় পড়ে দিন কাটাচ্ছ বুঝি?'

বিরাজ মর্মান্তিক বিক্ষোভে কাগজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—'এই কাগজের ব্যবসা, এর চেয়ে পান-বিড়ির ব্যবসাও ভালো—খদ্দের জমাবার জন্য নাকে এমন রসকলি কাটে যারা।' একটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে—'তোমার এখানে কী বই আছে?'

—'কী রকম বই চাও?'

—'.....বই আছে?'

—'না।'

—'রাইমসের কোনো বই আছে? জে-এম-এর? বাঃ, নাম শোনো নি?'

—'শুনেছি। নেহাৎ চাষভুষো ছাড়া কে না শুনেছে? তার কোনো বই কি আর এখানে পাবে? না, আমার কাছে সে সব কী আর থাকবে?'

অপ্রতিহত হয়ে বিরাজ—'মানির কোনো বই নেই?'

মাথা নেড়ে—'আমার এখানে? দূর। ইকনমিকস নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত কেন? তোমার কাব্যচর্চা তো ব্রিফ নিয়ে।'

বিরাজ গলা খাঁকরে, ধমক দিয়ে, —'বইখানার নাম শুনেছ।'

—'এই তো এইমাত্র শুনলাম।'

—'এর আগে শোনো নি?'

—'না।'

—'ইডিয়ট। এ সব কী বই তাকে সাজিয়ে রেখেছ তা হলে?'

—'দেখো-না।'

চশমাটা কপালে আটকে নিয়ে বিরাজ একখানা বই তুলে—'পোয়েট্রি।'

আর-একখানা বই তুলে পড়ল—'টেলস্ অফ মিসট্রি।'

আমার দিকে দাঁত খিচিয়ে ফিরে তাকিয়ে—'এটা কে? এরা শালা-ভায়রা একটা কিছু বুঝি? না মাসতুত ভাই?'

রাগে-বিরক্তিতে গজগজ করতে-করতে বিরাজ বই দুটোকে ঠেলে দিয়ে, আর একখানা বই টেনে নিয়ে পড়ে বললে—'অলিভার টুইস্ট? চার্লস ডিকেন্স?'

পরের বইখানা তুলে পড়তে-পড়তে—'ডেভিড কপারফিল্ড। চার্লস ডিকেন্স। এগুলো কী?'

—'নভেল।'

আমার দিকে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে—'এই রত্নটি কে?'

গম্ভীরভাবে—'কার কথা বলছ?'

—'এই-যে, যার ভোগের থালা দিয়ে তাকখানা সাজিয়ে রেখেছ।'

—'ডিকেন্স?'

—'হ্যাঁ, মাই হার্টস সিক্‌নেস।'

—'ডিকেন্সের নাম শোনো নি বিরাজ?'

—'মানে তো শয়তান।'

দু-তিন ধাপ পরে গিয়ে বিরাজ আর-একখানা বই হাতে তুলে নিয়ে—'এখানা কী?'

ধীরে-ধীরে পড়ল—'আনন্দমঠ।'

আরো পড়ল—'বঙ্কিমচন্দ্র।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'হদ্দ করল বাড়ির মধ্যে প্যাদা এসে।'

বইখানা অজ্ঞাতসারেই হাত থেকে পড়ে গেল বিরাজের; বইয়ের উপর দিয়ে পাতলুন চালিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে তাকের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করে।

—'...-এর কোনো খবর রাখো?'

—'অনেকক্ষণ তো বসলে বিরাজ। চা খাবে?'

—'...-এর আর...এর মধ্যে বড্ড কষাকষি; চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব এবার বুঝি টেঁশে।'

—'চা এনে দেই?'

বলতে-বলতে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে জমকালো গোঁফজোড়া একবার শানিয়ে নিয়ে শাদা তালিমারা ছাতাটা মাথায় দিয়ে বিরাজ শ্রাবণের অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। বিরাজের মতো এমন অমূল্য জিনিশ সাবডিভিশানের কোর্টে নষ্ট হয়ে যায়।

যদুনাথবাবু টাকাপয়সাওয়ালা লোক, বাপের বিপুল জমিদারি ছিল; অনেক খুইয়েছে, তবুও দেদার পড়ে রয়েছে; সারা জীবন এঁর টিকিও এদিকে কেউ দেখে নি; কাশ্মীর থেকে সিমলা, সিমলা থেকে কাশী এই ছিল তার পরিচিতি, এদিকে বড় একটা আসেন নি। বুড়ো বয়সে অবিশ্যি এখন দেশে এসে বসেছেন। সকালবেলা কোনো একটা ইলেকশন সম্পর্কে বাবার কাছ থেকে ভোটের জন্য যদুনাথবাবু এসে হাজির হলেন। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর আমার ঘরে ঢুকে বললেন—'কী করছ? কিচ্ছু না? বাড়িতে চুপচাপ বসে আছ বুঝি?'

একটা সিল্কের পাঞ্জাবি গায়—সিল্কের উড়ানি, এক মাথা শাদা চুল, তার উপর

চিরুনির কোনো ব্যবহার নেই। খুব সাধারণ এলবার্ট জুতো পায়। ভালো করে বুরুশও করা নেই। মুখে আন্তরিকতার চেয়ে আগ্রহ বেশি; চোখ চতুর ও চিন্তাশীল; জীবন পণ্ড হল, না কৃতকার্য হল, সে বিষয়ে সমস্যা এখনো যেন শেষ হয় নি, মুখাবয়বের উপর এ-রকম এক ভাব; হৃদয়ে পরিকল্পনা ও উৎসাহের অভাব নেই।

চেয়ারটা টেনে বসে, আক্ষেপ করে মাথা নেড়ে—'তোমাদের দেখে বড় দুঃখ হয় আমার; এই তো বি-এ পাশ করেছ। বি-এ না এম-এ? এম-এ? বেশ-বেশ, তা হলে তো গাজন আরো চমৎকার—কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বয়সও, তোমার বাবা বললেন, চৌত্রিশ। বিয়ে করেছ, সন্তান রয়েছে অথচ একটা মুটের যা সম্বল তাও তোমার নেই।'

একটা চুরুট জ্বালিয়ে—'দিনান্তে দুটো পয়সা নিজের বলে খরচ করতে পার? কী আক্ষেপের কথা। চাকরি খুঁজছ?'

—'এবার যাব কলকাতায়।'

—'কবে?'

—'এই সপ্তাহখানেকের মধ্যে।'

—'কী, চাকরি পাবে?'

—'দেখি।'

হাত নেড়ে—'মিছে কেন কলকাতায় ফোপর দালালি করতে যাও? তুমি মনে করেছ আমি একা এম-এ পাশ করে বসে আছি—এমন আশি হাজার ছেলে তোমার মতো বাংলাদেশের পথে-ঘাটে ঘুরছে—একটা ছাগল সারাদিন চরে যে ঘাসটুকু পায় তাও জোটে না।'

চুপ করে ছিলাম।

খানিক ধোঁয়া ছেড়ে—'মিছিমিছি নিজেকে ঠকিও না; সে যাদের শ্বশুর-সম্বন্ধী থাকে তাদের চাকরি জোটে—এ কাঠামো তোমার কিছু হবে না—একটা টেকনিক্যাল কিছু শেখো।'

কোনো জবাব দিলাম না।

—'শিখে এসো।'

—'টাকা নেই।'

—'বেশ, তা হলে ব্যাঙ্কিং শেখো-না। তাও টাকা নেই? আচ্ছা, তা হলে নিরিবিলি বসে দর্জিগিরি শেখো না কেন?'

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'কিংবা ডিমের ব্যবসা করতে পার, ছোট ডিমের?'

—'পোলট্রি ফার্মিং।'

—'আঃ, সে তো ঢের বড় কথা হল; এক নিশ্বাসে মগডালে চড়ে বসতে বলি না। আমার অবিশ্যি একটা কথা অনেক সময়ই মনে হয়েছে এই যে যদি কোনো ভদ্রলোকের ছেলে দেশগাঁয়ে এসে দুধের ব্যবসাটা ধরে, তা হলে টাটকা দুধও খেতে পারি, চাকরিসমস্যাও খানিকটা মিটে যায়, কী বলো?'

—'দেখলে হয় ।'

ভ্রূকুটি করে হেসে—'আরে দূর! আজকালকার শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে ভদ্রলোকের ছেলেরা যত চশমখোর চামার হয়েছে, ছোট লোকরা কি আর তত রে ভাই? না হয় জোলো দুধ দিচ্ছে কিন্তু তোমরা ব্যবসা শুরু করলে পিটুলি গোলা খেতে হবে।'

চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে—'তা ছাড়া গরুর যত্ন আমরা জানি কোনো লোক? ধবলী, কমলী, মঙ্গলী বলে যতই আদর করি, বিলেতের একটা কশাইও আমাদের চেয়ে—দেখবে মিল্ক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের পাশে গরুর ছবিগুলো? কিংবা যে-কোনো বিলিতি কনডেনসড মিল্ক কোম্পানির ইতিহাস পড়ে দেখলেই পার, আমাদের মতো তেঁতুলের খোশা আর হাঁসের ডিমের খোলা দেয় না তো। কী সব প্রাইজ পেয়েছে, শুনেছ?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'খবর কিছু রাখ না দেখছি। কেবল উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য? আরে ধেত্তেরি তার শিবনৃত্য। শিবচক্ষু ।'

আমার দিকে তাকিয়ে—'ডারবাইতে যে রয়েল শো হয়। ডারবাই বলতেই ভেবেছ হয়তো রেসের কথা।'

—'না, তা নয়—'

—'রয়েল শো রেসের চেয়ে ঢের বড় জিনিশ। সেখানে এবার গাভীগুলো ছটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার চ্যালেঞ্জ কাপ, আরো সাঁইত্রিশটা।'

চক্ষুস্থির করে আমার দিকে তাকালেন।

বললেন—'এখন হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ সের দুধ রোজ দোয়া হচ্ছে। আর সে দুধ কী? খেতে লাগে স্রেফ হুইস্কির মতো।'

চুরুটটা নিভে এসেছিল; হাতে রেখে যদুনাথবাবু—'মোটর ভেকেলস্ ডিপার্টমেন্টে কত মোটর পারমিট হয়েছে হিশেব রাখ?'

—'না।'

বাঁ-হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে—'পাঁচ হাজার প্রাইভেটকার, দু-হাজার ট্যাক্সি, এক হাজার বাস।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বাংলাদেশের পথে-ঘাটে এই সব ছুটছে; কত ড্রাইভার দরকার হয়, ভেবে দেখো তো! মোটর ড্রাইভারি শিখে নাও।'

ভাবছিলাম।

—'যা পাবে, তাতে দশটা মাস্টারমশাইকে গিলে ফেলতে পারবে। এটা হীন কাজ বলে ভাবছ? স্কুল-কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে মাস্টারমশাইরা যা সম্মান পান—তার চেয়ে ঢের বেশি সম্মান পাবে।'

ধীরে-ধীরে চুরুট টানতে লাগলেন।

চুরুটে একটা টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—'না-হয় জমি চাষ করো। লাঙ্গল ধরো, হলধরের মতো, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিকে জলে ফেলে দাও।'

—'জমি ঢের কিনতে হয়।'

—'কলেকটরের সঙ্গে গিয়ে দরবার করো। দুশো বিঘে চর লিখে দেবেন চাষবাস করবার জন্য।'

—'একবার গিয়েছিলাম।'

—'তারপর?'

—'শুনলাম ডিসট্রিবিউশন হয়ে গেছে।'

—'কুছপরোয়া নেই, তোমাদের এই ঘরদোরের চারদিকে আধ বিঘে জমি হবে তো? মা সর্বমঙ্গলার নাম নিয়ে শুরু করে দাও।'

চুরুটে একটান দিয়ে—'দাঁড়াও, তোমাকে বাতলে দিচ্ছি আমি।'

চুরুটটা ফেলে দিয়ে, পকেট থেকে আর-একটা চুরুট বার করে—'পঞ্চাশ বছরই তো এ-সব করলাম বসে-বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তোমাকে লাভ নেই বাছা। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে—অন্তত পঞ্চাশ একর আবাদি জমি যদি না জোগাড় করতে পার, চাষবাসের কাজে হাত দিয়ে কোনো ফয়শালা নেই।'

বললেন—'তা যদি জোগাড় করতে পার, তা হলে পেটে ভাত খেয়ে থাকতে পারবে।' পকেট থেকে দেশলাই বার করে—'কিন্তু জমি পেলেই তো হল না শুধু, আরো দু-হাজার মূলধন লাগবে।'

দেশলাই-এর গায়ে একটা কাঠি ঘষতে-ঘষতে—'পরে যদি একশো একর জমি আর চার হাজার টাকা ক্যাপিটাল জোগাড় করতে পার তা হলে মাথার ঘাম পায় ফেলে উপার্জন করলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ তোয়াজেই থাকতে পারবে।' কাঠিটা জ্বালতে না-জ্বালতেই নিভে হাতের থেকে পড়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে—'কিন্তু দশ-বিশ একর জমিতে কিছু কাজ হবে না। তা তোমাকে অনেক আগেই বলে রাখছি। দশ একর জমি নিয়ে একজন আনাড়ি হয়তো বড় জোর পনেরো-বিশ টাকা সংস্থান করতে পারবে। একজন ঘুঘু পারবে হদ্দ পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তাও ধরো যদি বন্যা হয় বা অনাবৃষ্টি-অজন্মা, তহলে তো সবই গেল। ভগবান আমাদের নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন। এত বড় সৃষ্টি ফাঁদিয়ে বসে কী করবেনই-বা আর। কাজেই কখনো আকাশ থাকে শুকিয়ে, কখনো পৃথিবী যায় ডুবে।' আর-একটা কাঠি জ্বালতে চেষ্টা করলেন যদুনাথবাবু। সেটাও নিভে গেল। —'কাজেই টাকার জোর থাকা চাই। অন্তত লাখ-দেড়লাখ টাকা মজুদ না থাকলে জমি নিয়ে খেলা করা বিড়ম্বনা; তার চেয়ে পরস্ত্রী নিয়ে ইয়ার্কি করাও ঢের নিরাপদ। এই কথাটা তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই। ....একদল ছেলে খেঁকিয়ে উঠেছে ভাদ্রমাসের কুত্তার মতো—জমি চাষ করে তারা বড়লোক হবে। পারবে?'

এইবার ভালো করে কাঠি জ্বালিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন যদুনাথবাবু।

বললেন, 'রোজ এগারো ঘণ্টা কাজ করতে পারবে? যদি বলি লাঙল ধরে ষোলো ঘণ্টা, তা হলে তো, আচ্ছা, লাঙল না ধরেই ষোলো ঘণ্টা। যে-সব কিষান খাটাচ্ছ তাদের কাজকর্ম তদারকি করতে হবে। তাদের কাছ থেকে ষোলো আনা কাজ আদায় করে নিতে হবে। —অন্তত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে নভেল বা নারীর মুখ দেখতে পারবে না, থিয়েটারে যেতে পারবে না, বায়োস্কোপ দেখবার জো নেই। বাপ, মা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী, প্রণয়িনী উচ্ছন্ন গেলেও ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না। সৃষ্টির বিধাতা যেমন হৃদয়হীন ও অন্যকর্ম, অক্লান্ত ও ধূর্ত, তেমনি করে তোমাকেও জমি পাহারা দিয়ে বেড়াতে হবে।'

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম দু-জনে।

—'দেখো, যদি পার, অনেক ছোকরাকে দেখেছি বোশেখ-জ্যৈষ্ঠের ঝাঁ-ঝাঁ আগুনের মধ্যে দশ-বারো ঘণ্টা—একটা শয়তানেও পারে না। কিন্তু সেই ধকলটাই জমির পিছন খাটাতে বললে তাদের চোখের তারা কপালে ওঠে। এমনই—'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'দিন-কাল ছিল তখন আমার, চোত-বোশেখের রোদে দশ ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা করে খেটেছি আমি। থার্মোমিটারে তখন একশো সত্তর ডিগ্রি।'

চুলের ভিতর আঙুল চালাতে-চালাতে যদুনাথ—'সূর্য না-উঠতেই বেরিয়ে যেতাম,

ফিরতাম যখন আকাশে বাদুড় চরে।'

—'কোথায়?'

—'বললাম যে।'

—'লাভ ছিল, অমানুষিক ব্যবসায়ীই ছিলাম না শুধু।'

একটু চুপ থেকে—'জীবনের মনুষ্যত্বের দিকটাও একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা করি নি আমি।'

চুরুটে টান দিয়ে—'থাক্। এই তো সত্তর করলাম, এখন নিদেন বারো ঘণ্টা খাটতে পারি'—একটু হেসে—'অবশ্য বোশেখের রোদ এখন আর সহ্য হয় না।'

আরো খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন—'কুমায়ুন পাহাড়ে চলো; যাদের এদিকে রুজি আছে ভারী আনন্দ পাবে তারা।'

নিভে গিয়েছিল চুরুটটা—জ্বালিয়ে নিয়ে, 'কিন্তু এতে ক্যাপিটাল লাগে আরো ঢের বেশি।'

—'কুমায়ুনে কী ফল হয়?'

—'আপেল হয়। পেয়ারা হয়, অবশ্য বিশেষ সুবিধার না, সবচেয়ে কাছে, তাও পাহাড় থেকে প্রায় মাইল চল্লিশেক দূরে, পথ-ঘাট খারাপ। বর্ষাকালে হাপুস চোখে কান্না আসে কিন্তু তবুও ফলের বাগান যখন তৈরি হয়ে ওঠে— বাংলার ধানখেতের দিকে তাকিয়ে যা-সুখ, তার চেয়েও ঢের বেশি আনন্দ ও তৃপ্তি।'

—'এ দেশের ধানখেতের শোভাও কি কম?'

—'ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে, ছেলেবেলার থেকেই দেখেছি কিনা।'

—'কিন্তু সেই সময় থেকে—তারও ঢের আগের থেকে এই ধান খেতগুলোর রহস্য ও বিচিত্রতা কী যে গভীর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তো জন্ম-জন্ম এগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি।'

—'তাই থেকো, তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না।'

যদুনাথ বলে চললেন—'পোস্ট-অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে যদি কুমায়ুন থেকে মোরব্বা করার ফল—যেমন কুলুর থেকে ভি-পি-পি সিস্টেমে করা হয়—তা হলে অবিশ্যি সুবিধা আছে ঢের।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু এ-সব কাজ বেদখল করে নেবে; বাঙালি তো দূরের কথা, পশ্চিমারাই কিছু করে উঠতে পারে কিনা সন্দেহ।'

চুরুটের ছাই খানিকটা ঝেড়ে ফেলে যদুনাথবাবু—'এখানে যেমন চর দিচ্ছিল, কুমায়ুন পাহাড়ে তেমন যদি জমি দেয়, তা হলেও জমি তৈরি করে একটা বাগান খাড়া করতে, খেদ্দায় হাতি ধরবার চেয়েও ঢের বেশি টাকা ও হেপাজত।'

খানিকটা নীল ধোঁয়া উড়ছিল।

—'ছোটখাটো একটা বাগান যদি তৈরি করে নেওয়া যায়, কুড়ি একর মতো বেশ তোয়াজ করা যায় যদি, গাছে যদি উপযুক্ত মতো ফল ধরে, তাহলে একর বাবদ মাসে দুশো টাকা আসতে থাকে।'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'আবার যাব ভাবছি, টাকার জন্য নয়—তাহলে পাটের ব্যবসায় [টাকা ঢালতাম] ; কুমায়ুনে আমার সেই কাল বিধবার মতো বাগানটার গন্ধে-গন্ধে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। দাঁত মুখ খিঁচে, ভেঙচি দিয়ে—'আরে তা হলে তো কত জিনিশই করতে হয়। বিধাতা তো পনেরোটা জীবন

দেন নি, দিয়েছেন একটা, অথচ দুশোটা জীবনের কামনা ও চরিতার্থতা এরই ভিতর গুদামজাত করতে হবে—মানুষের কি আর হাঁফ ফেলবার সময় আছে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাই আর ধুলো; পথে-পথে ব্যর্থতা বাড়িয়ে চলা।'

চুরুটটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে—'এই তো আবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের জন্য ভোট কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি—মাঝে-মাঝে দপ করে মনে হয়, কুমায়ুনে গেলে হত না? আমার সেই বাগানটা....সেই....'

মাথা নেড়ে—'ভগবান নির্বাণ দেন নি, দিয়েছেন স্মৃতি; ভালোবাসা দিয়েছেন। সমুদ্রের মতো আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু দেহটাকে তৈরি করেছেন দুই রত্তি ঘুণ দিয়ে, এই যাঃ, চুরুটটা নিভে গেল।'

জ্বালিয়ে নিয়ে—'তা কুমায়ুনে আমি তোমাদের যেতে বলি না, মোটা খাও না, জমিদারিও ভোগ করো না, সহাসনী নদীও নেই, সে ঢের টাকার শ্রাদ্ধ ভাই—সেই বাগানে গিয়ে ফলের বাগান তৈরি করা, অন্তত ত্রিশ একর আন্দাজ জমি কিনতে হয়, বাড়ি তৈরি করতে হয়, খেত তৈরি করতে হয়, কমপক্ষে হাজার দুই অন্তত ফলের চারা লাগিয়ে দিতে হয়।'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'তারপর সেই পরান কথার রাজকন্যাকে পোষো, ফল ধরতে-ধরতে আট-দশটা বছর কেটে যাবে। মনে হবে যেন জেলে রয়েছ'—চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—'কিন্তু মনের অবস্থাতে নিজেকে না খুন করে বাঁচো যদি, তা হলে দুনিয়ার দালাল মুখ তুলে চাইবেন বইকি। ফকিরের কান্নায় তিনি হার্ট ফেল করেন না। ভিটের ঘুঘুর কষ্টে প্রাণ টন-টন করে ওঠে তাঁর। ফকির সাজা না ঘুঘু সাজা, পৃথিবীকে যদি উপভোগ করতে চাও তা হলে সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মনপ্রাণ দিয় গ্রহণ করতে শেখো, ভগবানও আশীর্বাদ করবেন, নারীও হাতের পুতুল হবে।'

[দূর থেকে দূরে সরে যায়—
অন্তর্গত পৃথিবীর সুনিশ্চয় ঘন পরিচয়; প্রত্যাবর্তনের পথ নিঃশেষে মুছে—
কীর্তি সফলতা আর উদ্যমের বিপুলতা দিয়ে।
নির্বাসনের এক নিরন্ধ্র বলয় কাছে আসে।
কারুবাসনার লয়, নিরন্ধ্র বলয়—]

বড় গল্প

নিরুপম যাত্রা

বছর চারেক পরে কলকাতার থেকে দেশে ফিরছে—সম্বল একটা টিনের সুটকেশ, রংচটা শতরঞ্জিতে মোড়া একটা বিছানা এবং মনিব্যাগে তিন টাকা সাড়ে ন আনার পযসা। একটা বিষয়ে খুব স্বাধীনতা আছে—কলকাতার থেকে চলে যাচ্ছে বলে কোনো উপরওয়ালার অনুমতির দরকার নেই; কোনো উপরওয়ালা নেই, চাকরির বিড়ম্বনার থেকে জীবন নির্মুক্ত—বেশ ঝরঝরে নির্মল দিনগুলো—যতক্ষণ ইচ্ছা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, ফাল্গুনের সোনালি রোদে মাছির মতো ঘুরে বেড়াতে পারে, মেসের বারান্দায় চড়াইদের নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত জীবনোপভোগ সমস্ত দীর্ঘ অলস দুপুর বেলা বসে উপলব্ধি করতে পারে। একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় কলেজ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে বসে সমস্ত সকাল অশ্বত্থের খড়-খড়ে ডাল-পালার ভিতর বাতাস ও বুলবুলিগুলোর গান শুনতে পায়—শুকনো পাতা ঝরে, সজীব পাতা গজায়, সবুজ বেঞ্চির ওপর খয়েরি রঙের, বাদামি রঙের পাতা উড়ে আসে, খানিকটা দূরে দেবদারু গাছটা ছোট নিটোল, শিমুলের ডালপালার পাতা নেই—অসংখ্য লাল ফুলের নিশান, কৃষ্ণ শিখার মতো কাকের পাখাগুলো সাপের ফণার মতো সারাদিন ঘুরছে, বিলম্বিত সকাল এখানে নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারা যায়—কেউ কোনো কৈফিয়ৎ নিতে আসবে না, রাস্তার ট্রামে-বাসে অফিসমুখী কেরানিদের জীবনের উর্ধ্বশ্বাসকে একটা অবাঞ্ছিত বিকৃত অনিয়ম বলে মনে হবে, দেবদারু গাছের লীলা ও ভঙ্গি জীবনরচনার প্রণালী মনে হবে গভীর সত্যিকারের জিনিশ, অশথ-অশথের বুলবুলিগুলোর জীবন সত্যিকারের মনে হবে, তার নিজের জীবনটাকে সত্যিকারের মনে হবে। সমস্ত রাত মেসের ছাদের ওপর মাদুর পেতে শুয়ে থেকে একটা দূর ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পেতে পারে—গোলদিঘির দেবদারু ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম গাছগুলো যার আভাস পায়, এই শহরের শিশির ভেজা অজস্র কাকের নীড় এমনি গভীর গহন রাতে যে পরিপূর্ণতার স্পর্শে সুন্দর নিবিড় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিনগুলোকে এমনি ভাবে চালালেও চলে। চালাতে প্রভাতের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিপদ এই যে সামান্য দাড়ি কামাতে, একটা দেশলাই বা পেন্সিল

ব্যবহার করতেও যার সাহায্যের দরকার, সেই পয়সাই নাই। বয়স ত্রিশ বছর—আরো কুড়ি কি ত্রিশ বছর যদি সে বাঁচে তা হলে তিন টাকা সোয়া ন আনায় হয় না।

নিজে একা মানুষও নয় সে; স্ত্রী আছে—একটি ছেলেও রয়েছে।

এই চার বছর কলকাতায় কবিত্ব করে আর বুলবুলির গান শুনে কাটায় নি সে। শুধু আর্থিক অধঃপতনের অপরাধে আত্মিক জীবনের অমর্যাদা ও গ্লানি সহ্য করতে যারা অভ্যস্ত তাদেরই এক জনের মতো সারাদিন পথে-পথে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে সে। সুখ-সুবিধা-সফলতা এই সব অর্জন করবার জিনিশ—পুরুষকারের দরকার—প্রতিদিন সকালবেলা এই দুরারোগ্য ছন্দ তাকে পেয়ে বসেছে; কেরোসিন কাঠের টেবিলে ডিটমারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে প্রতিদিন রাতের বেলা মনে হয়েছে, এই অন্ধকারের যেন শেষ না হয় আর, এ বিছানার থেকে কোনোদিন যেন আর তাকে উঠতে না হয়।

সাধারণ বিশেষত্বহীন জীবনের বিশেষত্বহীন সাধারণ বেদনার অসহায় গভীরতায় চারটা বছর আস্তে-আস্তে এমনি করে কেটে গেল তার।

বাড়ির থেকে চিঠিপত্র বেশি কিছু পায় না সে। মা মাঝে-মাঝে লিখেছেন 'অনেক দিন তোমাকে দেখি না, মাঝে-মাঝে দেখতে ইচ্ছা হয়—সময় করে একবার আসতে পার না?'

বউয়ের চিঠি, পনেরো-কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্তর এক-এক বার আসে। 'কিছু সুবিধা হল? এত দিনেও তুমি যে কিছু করে উঠতে পারলে না এই ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই।'

তাই তো—

প্রভাত লেখে—'খোকা কত বড় হল?'

জবাব আসে—'কুন্দর চিঠি পেলাম আজ; তার স্বামী তো কলকাতায় গিয়ে ছমাসের মধ্যেই রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে কত বড় চাকরি জোগাড় করে নিল আর তুমি কিছু পারলে না।'

বেশ কথা। সেই যত উদাসীনতা দেখতে দেশে যেতে ইচ্ছা করে বড়। দেশে সে যাবে এবার—এবার একবার দেশে যাবে না কি? যাবে, যাবে। মা-র চিঠিতে হয়তো আগ্রহ বেশি নেই—কিন্তু একবার গিয়ে কাছাকাছি দাঁড়ালে তিনি উচ্ছ্বাসে বাঁধন-সম্বিৎহারা যদি না হন। আর এই কমলা—প্রথম দিনটা হয়তো সে একটু মুখ গোঁজ করে সরে থাকবে—কাছে আসবে না, কথা বলবেও না; কিন্তু তার এ বিরসতা, উচ্ছে-চিবনো রূপ দু-এক দিনের মধ্যেই কেটে যাবে। তারপর চৈত্র-বৈশাখের নির্জন দুপুরবেলা—জামরুল পাতার মর্মর শব্দ, বোলতার গুনগুন, নারকোল গাছে কাঠঠোকরার ঠোকর, কামিনীগাছের ডালপালার ভিতর টুনটুনিগুলোর কিচিরমিচির—মাথার উপর পড়া রৌদ্রে মাছরাঙার ডাক—বাতাসে নিদ্রালু মাঠ-প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ও স্বপ্নের হাহাকার। এমনি সময় দুপুরের বাতাসে অক্ষয় বটের প্রান্তরের সীমা পরিসীমায় আরো দূর অসংবদ্ধ প্রান্তর আকাশের বিস্তারকে টিটকারি দিচ্ছে—

আর খোকা?

খোকাকে ছমাসের দেখে কলকাতায় চলে এসেছিল প্রভাত—আজ বয়স তার প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি। হাঁটতে পারে—দৌড়তে পারে—এমন কথা নেই যা সে না বলতে পারে। দেখতে কেমন হয়েছে? তার নিজের মতো—না কমলার মতো?

খোকা হয়তো কারো কথাই শোনে না; সকালে ঘুমের থেকে উঠে একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে নেয় নিশ্চয়। তারপর?

নয়তো বিড়াল, কুকুর, শালিক, কাক, যা তার নজরে আসে—সমস্ত তাড়িয়ে বেড়াতে খুব ভালো লাগে তার। হয়তো পিঁপড়ে মারে—ফড়িং ধরবার জন্য মেহেদি পাতার বেড়ার চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়—দু-একটা গঙ্গা-ফড়িং কিংবা নতুন ঝিঁঝি যদি নজরে পড়ে তা হলে তার প্রতি লোভ আরক্তিম হয়ে ওঠে খোকার। এক-একটা প্রজাপতি উড়ে এসে আচমকা তাকে অন্য পথে ভুলিয়ে নিয়ে যায়; নানা রঙের প্রজাপতি, হলদে, জর্দা, পাটকিলে নীল—কোনোটা লখনৌ ছিটের মতো, চেককাটা, ফুটফুটে ডোরাদার, কত কী। ফড়িংই-বা কত রকম—কোনগুলো টকটকে লাল, সমস্ত শরীরটা একটা পাকা ধানি লঙ্কার মতো চারটি ডানা—আভের তৈরি নিটোল নিখুঁত জিনিশের মতো—ভাঙে না, গুঁড়ো হয় না—ফড়িংটাকে মাঠের থেকে মাঠে—প্রান্তরের এ পারে, দিগন্তে, নদীর ধারে, শশার খেতে, বাবলার জঙ্গলে, শ্মশানে কত জায়গায়ই যে নিয়ে যায়।

ঘুরে ফিরে এই প্রজাপতি আর ফড়িংগুলো কানসোনার শিষে, দ্রোণ ফুলের ঝাড়ে, ঢেকি লতায়, আকন্দ ফুলে, ভেরেণ্ডাবনে এসে বসে, কিংবা লাউয়ের ডগায়, কিংবা বাঁশের মাচার একটা কঞ্চির উপরে। খোকা হয়তো এই সব দেখে দেখে হয়রান—

একটা ফড়িংও ধরতে পারে না সে, তবুও হয়তো বর্ণচ্ছটাময় অজস্র প্রজাপতির জগৎ তার কাছে একটা সুন্দর সুদূর স্বপ্ন—সাম্পানচড়া মলয় নাবিকের চোখে দূর দক্ষিণ সমুদ্রের স্বপ্নের মতো তাকে এড়িয়েই চলে, দিন-রাত এড়িয়ে এড়িয়ে চলে—তারপর বিকেলের পড়ন্ত রোদের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার আবছায়া নেমে আসবার আগে কোনো পরীর রাজ্যে বিলীন হয়ে যায় সে। যাক্। এই রকম বিলীন হয়ে যাওয়াই ভালো। একটা প্রজাপতি ধরে পাখনা ছিঁড়ে খোকার কী লাভ? তার চেয়ে এরা যদ্দিন শিশুটিকে মাঠে পথে ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে বেড়ায় বেশ হয়; খোকাকে ধরা দেবে না কখনো—তার মনের ভিতর নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা ও স্বপ্ন জাগিয়ে রাখবে; ভোরের থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে অনেক বহুরূপী রূপের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবে—উঠানে, বাঁশবাগানে, চালতা তলায়, কিংবা লাল কুচ সবুজ তেলাকুচা লতার দেশে কিংবা আমের বোলগুলো যেখানে সবুজ কটা-ঘাসের ভিতর ঝরে শুকিয়ে মিষ্টি গন্ধ ছাড়ছে সেই রাজ্যে—

অবাক নিস্তব্ধ হয়ে ভাবছিল প্রভাত।

একটা পাতিলেবুর সবুজ পাতার উপর কমলা রঙের একটা প্রজাপতি—আজ এই দুপুরেই হয়তো খোকার কাছে তা জামশিদের মিনারের রাজ্যের চেয়ে ঢের বড় জিনিশ। তার নিজের কাছেও ওই রকমই মনে হত—খোকার বয়সে।

পৃথিবীর সাধারণ হাঁটা-চলার পথ—তুচ্ছ খুঁটিনাটি যতদিন অনাবিষ্কারের বিস্ময়ে কুয়াশাভ হয়ে থাকে, ততদিনই খুব গভীরে লাভ—ধীরে ধীরে কল্পনা শুকিয়ে যায়—স্বপ্নগুলো যায় ভেঙেচুরে—বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি তৃপ্তি পাই না, শান্তি পাই না, জীবনটা একটা দাঁড়কাকের বাসার মতো ছন্নছাড়া জিনিশ হয়ে দাঁড়ায়; সকাল থেকে রাত্রি অব্দি একটা ক্ষুধিত কাকের মতো সমস্ত রকম কদর্যতা, চিত্তপ্রসাদহীন লালসা ও গ্লানির ভিতর নিবৃত্তি খুঁজে মরি, জীবনকে বুঝি জীবনধারণ বলে।

প্রভাত মেসের বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। আজকের গাড়িতেই

সে দেশে চলে যাবে। যাওয়া যায় না?

ট্রেন ছাড়ে প্রায় বিকেল চারটের সময়—এখন বেজেছে দুটো। প্রভাত একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিল। ঘন্টাদেড়েক সময় আছে আর। যাবে কি সে? আজই যাবে? কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে হেঁটে চলে গেলেই হয়—সময় ঢের বাকি আছে গাড়ি ছাড়বার। কালকে কমলার একটা পোস্টকার্ড এসেছিল—তোশকের নীচের থেকে পোস্টকার্ডটা বের করল প্রভাত—প্রভাত যে দেশে যাবার সংকল্প করেছে এ তাদের কল্পনার ত্রিসীমানায়ও নেই; বরং অনুযোগ করে লিখেছে এতদিনেও কেন সে চাকরি জোগাড় করে উঠতে পারল না? বিয়েই-বা করেছিল কেন? ছেলেও তো হয়েছে দেখি? কী দিয়ে কী হয়? কে কোথায় দাঁড়ায়? চুরুটে এক টান দিয়ে পোস্টকার্ডটা রেখে দিল প্রভাত—

চুরুটে এক টান দিয়ে ভাবল—পোস্টকার্ডে এ সব লেখা উচিত হয় নি কমলার। এটা তো একটা মেস—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মানুষ থাকে। পিয়ন এসে চিঠিপত্র একটা ঢাকনা খোলা টিনের বাক্সে ফেলে দিয়ে যায়—যে খুশি যখন খুশি চিঠি নেড়েচেড়ে দেখে—কার্ড পড়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। একখানা খামে লিখতে পারত কমলা—

যাক আজ আর যাওয়া হয় না। মেসের হিশেব মিটিয়ে দেওয়া হয় নি সমস্ত; খানিকটা বাকি আছে। ভাড়ার টাকারও জোগাড় নেই। খোকার জন্যও কিছু ছবির বই, খেলনা কেনা দরকার। খেলনা মানে ইঞ্জিন কিংবা মোটর—পুতুল নিয়ে তৃপ্তি থাকার বয়স পেরিয়ে গেছে সে, কমলার জন্যও অন্তত একখানা শাড়ি না নিলে চলে না—আর মায়ের জন্য একখানা গরদের চাদর।

শেষ পর্যন্ত এত কিছু সে পারবে না বটে, মায়ের জন্য একখানা থান কাপড় আর কমলার জন্য একখানা সুতির শাড়ি আর খোকার জন্য একটা বেলুন—শেষ পর্যন্ত সম্ভার এইটুকুতে গিয়েই ঠেকবে হয়তো।

প্রভাত চুরুটের থেকে খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলল। তারাপদর কাছ থেকে গোটা পনেরো টাকা ধার করে আনবে সে। বড় লজ্জা করে। তারপদর সঙ্গে কলেজে একসাথে পড়েছিল সে—এক মেসেও ছিল অনেক দিন। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। স্ত্রী-সন্তান চাকরি-বাকরি ও ভাড়াটে ফ্ল্যাট নিয়ে সে আজ সফল মানুষ—প্রভাতের জীবন থেকে সে ঢের দূরে চলে গিয়েছে।

ঘড়িতে তিনটা বাজল। না, আজ আর রওনা হওয়া যায় না, কলকাতা ছাড়বার আগে দাবি-দাওয়া মিটিয়ে রওনা হওয়াই ভালো, চোরের মতো পালিয়ে যাবে না সে।

মেসের বাকি টাকা কটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবে ম্যানেজারকে। দেশের বাড়িতে গিয়ে যখন উঠবে সেই মুহূর্তেই একেবারে ভিখিরির মতো আত্মবিক্রয় করে ফেলবে না সে; কয়েকটা মুহূর্ত অন্তত বেশ মহাজনের মতো বাহুল্য থাকবে তার—খোকাকে বেলুন দেবে, লাটিম দেবে—

মাকে থান, কমলাকে খদ্দরের শাড়ি—

প্রভাতের হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে খবরের কাগজটা তুললে সে। সকাল থেকেই বাড়ি যাওয়ার ঝোঁকে আছে—সেই থেকে এই অব্দি খবরের কাগজের একটা লাইনও তার মাথার ভিতর ঢোকে নি—কাগজটাকে নেড়েচেড়ে দলেমুচড়ে তছনছ করে রেখেছে সে। গুছিয়ে নিল।

টেলিগ্রামের পাতাটা খোলে—এডিটরের আর্টিকেল কী, একবার তাকিয়ে দেখে। কিন্তু পড়বার চাড় নেই। কাগজ হাতের থেকে মেঝের উপর পড়ে যায়—চুরুটের থেকে আগুনের ফুলকি কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে—কাপড়ের খানিকটা খানিকটা জায়গায় আলপিনের মাথার মতো ছোট ছোট ছ্যাঁদা হয়ে যায়—ক্রমে ক্রমে চুরুটও নিভে যায়—প্রভাত কলকাতার দূর দিগন্তের একটা সুরকিধূলিরক্তাক্ত ঝাউ গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে—

দেশে সে যাবেই। আজ অবিশ্যি যাওয়া হল না। কালও হয়তো হবে না। তারাপদর কাছ থেকে টাকা ধার করে এনে তিন-চার দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই রওনা দেবে সে। বিকেল চারটের সময়ও শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেনের গায় বেশ চড়া রোদ—থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের থেকে কেমন একটা গন্ধ বেরোয়। দেশে যাবার জন্য যখন সে এই ট্রেনে চড়ত এই ঘ্রাণ এত ভালো লাগত তার—পড়ন্ত রোদ ভারি মিঠে মনে হত—

হঠাৎ এক সময় গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে যেত—তার পরই কামরার বেঞ্চিগুলো রোদে যেত ভরে—মুখে রোদ, মাথায় রোদ। কেমন নরম রোদ—আঘাত দেয় না—বোনের মতো, মায়ের মতো সস্নেহে সমস্ত শরীর বুলোতে থাকে যেন—হৃদয়ের ভিতরেও একটা গম্ভীর ভরসা আসে—এখন থেকে আর সংগ্রামের দবকার নেই—চিন্তার প্রয়োজন নেই—উপায় খুঁজবার আবশ্যকতা নেই—জীবন এখন থেকে বেশ নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত—নরম রোদ এসে আশীর্বাদ করে, ভালোবেসে, এক সুদূর শান্তির দেশে নিয়ে চলেছে—

দেখতে দেখতে বি-কে পালের বাগান—নারিকেলের সারি—পামবীথি—পশ্চিমে ধোপাদের কাপড় কাচার ঘাট—ধোলাই কাপড়-ঢাকা সবুজ ঘাস—দমদম স্টেশনে ট্রেন ধরে এক বার—তার পরেই হুম হুম করে মুহূর্তের ভিতর খোলা পৃথিবীতে এসে পড়ে—দুধারে মাঠ প্রান্তর—খেজুরের জঙ্গল—আখের খেত, বড়-বড় সোঁদাল গাছ, পাকুড়, ঝরঝরিয়া ও অর্জুনের বন—নিস্তেজ বিকেল বেলার কোল থেকে নেমে পৃথিবী ভরা সোনালি রোদের হুড়োহুড়ি—শূন্য ধানখেত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাশ, খড়ের স্তূপ, গাঙ শালিখগুলোর ওড়াওড়ি—

তারপর রাত্রি নেমে আসে—অবসন্ন ঝিঁঝিঁর ডাক, কোকিলের গান ও ব্যাঙের কলরবের ভিতর দিয়ে মাঠ-প্রান্তরের সীমানায় জোনাকিমাখা বাতাসের ভিতরে ট্রেন এসে থামে। তারপর স্টিমার—এ এক নিরুপম বিচিত্র যাত্রা—মাঠ আছে, তেপান্তর আছে :

সমস্ত রাত বিচিত্র সরীসৃপের মতো এঁকে-বেঁকে নদী যেন তিমিরাবৃত শীতল পাতাল দেশের দিকে চলেছে—

চুরুট নিবে গেল বুঝি?

কিন্তু জ্বালাল না আর প্রভাত—

সকাল বেলা গিয়ে স্টিমারে দেশের স্টেশনে পৌঁছায়। স্টেশনে নেমেই সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা চোখে পড়ে—ফাল্গুন মাসেই সেটা ফুলে ভরে যায়—

এক দিকে একটা ডালপালায় মস্ত বড় শিমূল গাছ—মাঘের শেষেই নীল আকাশের মাথায় আগুন লাগিয়ে দেয় যেন; এমন রক্তাক্ত শিমুল কোথাও কোনোদিন সে দেখে নি আর, যেন সিন্দুরমাখা সুন্দরী সধবার লেলিহান চিতা জ্বলে উঠেছে।

স্টেশনের ধারে এই শিমুল গাছটার বয়স ঢের। ছোটবেলার থেকেই দেখে এসেছে প্রভাত—দাঁড়কাক ঠুকরে ফুল ছিঁড়ত—ফুল পাকত—ফল শুকনো হয়ে ফেটে আকাশে বাতাসে তুলো ছড়াত; একদল ছেলেমেয়ের হাসি-ঝগড়া-কলরব এই ফুল ও তুলোর সঙ্গে কত দিন এসে মিশেছে যে।

সে যে কবেকার কথা। পনেরো-কুড়ি বছর আগের একটা পৃথিবী প্রভাতের চোখের সামনে জেগে ওঠে, সেই পৃথিবী আজ মরে গেছে। সেই বালক-বালিকার ভিড় আজ নর-নারীত্বে পর্যবসিত—পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—শিমুলের ফুল ও তুলো আজ তাদের কাছে সবচেয়ে উপেক্ষার জিনিশ। কেন এ রকম হয়?

দিঘির পাড়ের অশ্বত্থের সবচেয়ে মোটা ডালগুলো তখন জন্মায়ও নি, কেওড় বাবলার বন কতবার পেকে গেছে তারপর, ঝরে গেছে কতবার, কত জল-মেটুলি সাপ মরে গেছে, কত পুকুর শুকিয়ে গেছে, কত শালিখ কোকিল অন্তর্হিত হয়েছে, বিশ্বম্ভরবাবুর শাদা গোঁফ জোড়া তখন কাচপোকার মতো নীল ছিল, গায়ে ছিল অসুরের মতো শক্তি—এখন তিনি চোখে দেখেন না, লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে হয়, সেদিন একটা ভেড়ার ঢুঁ খেয়ে রাস্তায় গেলেন পড়ে—

স্টিমারের সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে তারপর সেই জেটি—চটের বস্তার গুদাম—চট ও আলকাতরার গন্ধ সেখানে; কতদিন সে ঘ্রাণ পায় নি সে; আজ এই মেসের কামরায় বসে তা কত কাছের জিনিশ মনে হয়—

জেটির থেকে বেরিয়ে তক্তার সিঁড়ি ধরে তারপর স্টেশনে লাল কাঁকরের রাস্তায়; রাস্তার দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া আর ছাতিমের সারি; সবুজ ঘাসের উপর কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলগুলো ছড়িয়ে থাকে; মস্ত বড় পল্লবিত ছাতার মত কৃষ্ণচূড়ার মাথাগুলো সবুজ পাতার নিবিড় ঘাসে নিরবচ্ছিন্ন রক্তিম ফুলের আভায় নীল আকাশের গায় খেলা করে; ছাতিম গাছের নীচে প্রতিবারই একদল নিরীহ ভেড়া ও ছাগলের ভিড় সে দেখে—এগুলো কার যে, জানে না সে। চুপচাপ বসে থাকে, ফুল খায়, ঘাস চিবোয়, প্রভাতের দিকে মুখ তুলে নিরপরাধ চোখের শান্ত অভ্যর্থনায় তাকায়।

সেই ভেড়া ও ছাগলগুলোকে এবারও গিয়ে দেখতে পাবে না কি সে? গতবারও দেখেছিল; তার আগে আরো কতবার দেখেছে যে সে।

স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি ঢের; প্রভাতকে স্টিমার থেকে নামতে দেখলে ঝিলকান্দি রোডের আস্তাবলের গাড়োয়ান কালিম সবচেয়ে আগে ছুটে আসত; এবারও আসবে নিশ্চয়; মুখে তার ক্রমাগত—'মহারাজ—হুজুর', 'মহারাজ—হুজুর'। নিজের হাত দুটো জোড় করে অনবরত কচলাতে থাকে কালিম, কেন এলাম, কেমন আছি, দেশে কদ্দিন থাকব—সে কত জিজ্ঞাসা তার। ঢের উচ্ছ্বাস; প্রভাতদের বাড়ির সবাই যে ভালো আছে সে কথা আগারি জানিয়ে দেয় প্রভাতকে সে। শামশ রং—জোয়ান চেহারা—উড্ডীন বাজপাখির মতো দিব্যি চমৎকার মুসলমান যুবা; কালিমকে দেখলে মনটা খুব তৃপ্তি পায়—

কিন্তু এবার আর গাড়িতে চড়া যাবে না; কালিমকে নিরাশ করতে হবে; পয়সা বড্ড কম; কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে বাড়িতে যেতে হবে।

চুরুটটা জ্বালাল প্রভাত।

এক টান দিয়ে ভাবল সেই কুকুরটা বেঁচে আছে তো? বাবা তার নাম রেখে গিয়েছিলেন 'কেতু'—সেই থেকেই সব্বাই 'কেতু' 'কেতু' বলে ডাকে। বাবা আজ

নেই। কুকুরটাও ঢের বুড়ো হয়ে গিয়েছে বোধ করি—

বেঁচে আছে তো? কমলা এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তরই দেয় না। কুকুর-বিড়ালকে সে জীবনের গ্রাহ্য জিনিশের মধ্যেই ধরে না।

কেতুর যখন দু-তিন মাস বয়স মোটে, সারা রাত এমন চিৎকার করে অস্থির করত মানুষকে—প্রভাত এক দিন রাগ করে বারান্দার থেকে বাচ্চাটাকে উঠানে ছুঁড়ে মেরেছিল। মরে নি; কিন্তু একটা পা ভেঙে গেল। কত রকম ফিকির, চেষ্টা, কিন্তু সে পা আর জোড়া লাগল না। কুকুরটি বড় হয়েও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে—চার বছর আগে দেখে এসেছিল প্রভাত—কুকুরটার বেশ স্ফূর্তি-আনন্দ-জীবনোচ্ছ্বাস কিন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে গিয়ে ল্যাং ল্যাং করে—একটা অপ্রীতিকর বাধা সব সময়ই বহন করতে হয় বেচারিকে—

বাড়ি গিয়ে কুকুরটাকে এবার মাছের কাঁটা দুধ-ভাত নিয়মিত দেবে সে; খোঁড়া পায়েরও একটা ব্যবস্থা করা যায় নাকি? দেখবে সে। বাস্তবিক, কেতু যেন মাঝে-মাঝে এ মেসের কামরার ভিতর থেকেও প্রভাতকে টানে—কী যেন বোবার কথা জানাতে আসে; হয়তো উচ্ছিষ্টমাখা ভাত আজকাল আর জুটছে না তেমন, হয়তো তিন-চারদিন না খেয়েই থাকতে হয়, হয়তো খিদের লোভে মড়া বিড়ালের মাংস খায়, শকুনদের ভাগাড়ের চারদিকে ঘোরাঘুরি করে, গোরুর ঠ্যাং কুড়িয়ে আনে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ায় বসে সমস্তটা দুপুর চিবোয় তাই—তারপর বিকেলের ছায়া নিস্তব্ধ হয়ে নেমে আসে যখন, তখন বাঁশ ও কাঁঠালের জঙ্গলের কিনারে বসে অবাক হয়ে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে হয়তো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশ্চর্য হয়ে ভাবে : কোথায় সে গেল? এই চার বছর ধরেই তাকে খুঁজছি, তবুও দেখা পাই নে কেন? কোথায়?

ধীরে-ধীরে চোখ বোজে হয়তো কেতু; ঘুমায় না; মাটির ওপর শুয়ে জিভ বের করে ভাবতে থাকে হয়তো এতদিন মানুষের কাছ থেকে সে যত অকল্যাণ ও গ্লানি পেল প্রভাত এলে সমস্ত জানাবে তাকে সে—

বাঁশের সবুজ পাতা ঝিরঝির করে বাতাসে বাজতে থাকে; ধূসর আকন্দ ফুলে ভোমরা গুন গুন করে মরে; সজনে গাছের শাদা ফুলগুলো বাতাসে উড়তে থাকে, শুকনো বন চালতা ও কদমের পাতা ঝরে পড়ে, জঙ্গলের থেকে গোটা দুই বেজি বেরিয়ে আসে, ডাহুকের বাচ্চাগুলো কাঁদতে থাকে—আমের বকুল ঝরে, কেতু গা ঝাড়া দিয়ে তার ব্যথিত বিচ্ছিন্ন নিদ্রার থেকে উঠে বসে—বিহ্বল হয়ে চারিদিকে তাকায়—সন্দিগ্ধ হয়ে ভাবে এ গাঁয়ে সে আর নেই; কিন্তু এ চার বছরের ভিতর আশেপাশের কত গাঁ খুঁজে এসেছে সে—সে মানুষকে সে কোথাও তো পেল না; খানিকটা দূরে একটা শুকনো কচ্ছপের চাড়া পড়ে আছে—শ্রদ্ধাহীন ভাবে সেটার দিকে তাকায় বোধ করি কুকুরটা। একবার হাই তোলে, ভোমরার গুনগুনানি কানে ভেসে আসে; হলদে প্রজাপতিটার অক্লান্ত ওড়াউড়ির দিকে অবসাদ ভরে তাকিয়ে দেখে; তারপর খামোকা লাফিয়ে উঠে শুকনো পাতার উপর দিয়ে খামচ-খামচ করে হেঁটে মস্তবড় যজ্ঞডুমুরের গাছটার পিছনে প্রান্তরের দিকে অন্তর্হিত হয়ে যায়—

কেতুর কথা ভাবতে গিয়ে চুরুটে আর টান দেয় নি প্রভাত; চুরুটটা নিভে গেছে।

সেই নিরঞ্জন ধোপার দিন কাটছে কেমন? সেই চার বছর আগে দেখা। পাটের দর কমে গেছে বলে সে তো বড্ড ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল; পাটের চাষ সে অল্প-সল্প করত বটে—কিন্তু তা এত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর যে অতখানি ক্ষুব্ধ হবার কোনো

কারণ ছিল না তার; অবিশ্যি সমস্ত বাজারই মন্দা—সকলেরই দারিদ্র্য—জীবন্মৃত অবস্থায় মানুষকে বাঁচতে হয় : সেই-ই হয়তো তার বিক্ষোভের কারণ ছিল। এ জীবনে নিরঞ্জন কত পার্টই যে নিল, ছবছর বয়সে পালিয়ে গিয়ে যাত্রার দলে ঢুকল—ভালো গাইতে পারত বলে নবীন অধিকারীর দলে তার খুব আদর হয়েছিল—প্রভাতও লক্ষ্মণবর্জনে নিরঞ্জনের গান শুনেছে; সে প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা; কিন্তু আজও মনে হলে চুপচাপ নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়, হয়তো আজই সে জিনিশের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

নিরঞ্জনের গানের গলা দু-তিন বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল—অভিনয় সে করতে পারত না—যাত্রার দল থেকে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল—এরপর নিরঞ্জন অন্য এক অধিকারীর দলে জল টেনে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, পান বানিয়ে, তামাক সেজে ফোঁপর-দালালি করে বেড়াত।

কিন্তু এ সব ভালো লাগল না তার।

তবুও যাত্রার দলের গন্ধ সে সহজে ছাড়তে পারল না। কিছুদিন সে সিন আঁকতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার জীবনের সবচেয়ে নিরেট ব্যর্থতা। নিজে একটা যাত্রার দল খুলবে বলে ঠিক করল—কিন্তু অতিরিক্ত মোড়লি করতে গিয়ে পণ্ড হয়ে গেল সব।

একবার প্রভাত শুনল—নিরঞ্জন কলকাতায় পালিয়ে গেছে। প্রভাত তখন ইস্কুলে পড়ে। কলকাতার থেকে যারা আসে তারা খবর দেয়, নিরঞ্জন থিয়েটারে ঢুকেছে। কলকাতা শহরে খুব নাম করে ফেলেছে সে; আধাআধি কলকাতার বাসিন্দা তাকে চিনে নিয়েছে। একদিন হঠাৎ ইস্কুলে যাবার পথে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা—পরনে একটা কপাসডাঙার চুড়ি পাড়ের কাপড়—গায়ে গলাবন্ধ আলপাকার কোট—পায়ে নিউ কাট (?)—বার্ডসাই মুখে।

নিরঞ্জন খুব চাল দিল না কলকাতার; প্রভাতকে খুব খাতির করল—বার্ডসাই সাধল—বললে, 'লেখাপড়া না করলে মানুষ হতে পারা যায় না—বাস্তবিক।'—ইস্কুলে কোন ক্লাসে কী রকম মাইনে দিতে হয় জিজ্ঞেস করল, যে-ক্লাসে সবচেয়ে কম মায়না সেই ক্লাসেই ভর্তি হবে বলল; প্রভাত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ভর্তি হবে একটা পাড়া-গাঁয়ের ইস্কুলে—কলকাতায় তোমার এত নাম!' নিরঞ্জন মাথা নেড়ে হেসে বললে—'না, ও ঠাট্টা করছিলাম—এখানে একটা এ্যামেচার থিয়েটার কোম্পানি খুলব ভাবচি।'

এ্যামেচার কথাটির মানে তখন জানত না প্রভাত—অবাক হয়ে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল : নিরঞ্জন কলকাতায় গিয়ে ইংরেজিও শিখে ফেলেছে ঢের!

ইস্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে একটা খেজুর গাছের আড়ালে দুজন গিয়ে দাঁড়াল। প্রভাত বললে—'বাঃ, কলকাতায় এত নামগাম করে এসে পাড়াগাঁয়ে থিয়েটার খুলবে? এ আবার কী ছাই?'

নিরঞ্জন সিগারেটে একটা Y টান দিয়ে বলেছিল—'দূর। তোমার সঙ্গে একটু মশকরা করলাম। এখানে আমার এজেন্ট রেখে দেব। আমার নিজের থিয়েটার থাকবে কলকাতায়।'

কয়েক দিন পরে ইস্কুল থেকে ফিরবার পথে প্রভাত দেখল পিঠে এক বস্তা নিয়ে চলেছে নিরঞ্জন—

অবাক হয়ে সে থমকে দাঁড়াল, নিরঞ্জন না?

—'কী মিস্টার?'

—'হ্যাঁ হে, এ কিসের বস্তা তোমার পিঠে?'

—'আর কিসের?'

সেই থেকে ধোপার কাজ সে করছে।

মাঝখানে ইস্টিমারের ডকে একবার কাজ পেয়েছিল—মাসে পনেরো টাকা মাইনের কাজ পেয়ে নিরঞ্জন আবার গোলাপবাহারি বাবুগিরি আরম্ভ করে দিল।

কিন্তু অতিরিক্ত বাহাদুরি করার অপরাধে ডকের থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এর পর তার বয়স বাড়তে লাগল; বিয়ে করল—ছেলে-পিলে হল; লক্ষ করে দেখছিল প্রভাত—নিরঞ্জন ঢের বিজ্ঞ ও নিস্তব্ধ হয়ে উঠছে; মানুষের জীবনটাকে মনে মনে পর্যালোচনা করে সে—অত্যন্ত গম্ভীর নানা রকম সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয়।

প্রভাত তাকে 'তুই' বলে ডাকে, নিরঞ্জন প্রভাতকে 'হুজুর' বলে সম্মান করে—'আপনি' বলে সম্ভাষণ করে; হাত তুলে নমস্কার জানায়, 'যে আজ্ঞে' বলে আদেশ গ্রহণ করে, এই সমস্ত সম্পর্কে একজনেরও কারো মনে কোনো খটকা নেই—ঘনিষ্ঠ কথাবার্তাও দুজনের মধ্যে কম হয় না।

বছর চারেক আগে, দোলের দু-তিন দিন পরে সে এসেছিল, কতকগুলো রং-মাখা জামা বের করে প্রভাত বলেছিল,—'পারো কি এমন রং ওঠাতে—'

সে নেড়েচেড়ে বললে—'খুব পারব হুজুর।'

—'গায়ে দেবার আমার একটা জামাও নেই কিন্তু, খুব শিগ্‌গিরই দিয়ে যাবি।'

—'পরশুই দেব হুজুর।'

দিন পনেরো পর এসে সে হাজির।

প্রভাতের শার্ট-পাঞ্জাবি-ফতুয়া সব কটিই গাঁটরির থেকে বের করে নির্বিকার ভাবে একটা শতরঞ্জির ওপর রাখল নিরঞ্জন।

লাল, নীল, সবুজ রঙের জলুশ জামাগুলোর গায়ে যেন আরো সুঠাম হয়ে উঠেছে। প্রভাত চোখ নরম করে—'হারামজাদা এই কাচলে নাকি তুমি?'

—'হুজুর।'

—'হুজুর কী রে শুয়ার, পাজি, উল্লুক, তুমি বললে পরশু দিয়ে যাবে, এনেছ পনেরো দিন পর, তাও এই রকম—'

—'হুজুর, কাচতে দিয়েছিলাম আমার ভাইপোকে।'

—'কেন, তাকে কাচতে দিলে কেন তুমি?'

—'ভাবলাম, ওকে লায়েক করে নেই—আমি মরলে পর ধোপার কারবারটা ওই তো রাখবে—'

—'বেশ একদফা মিথ্যা কথা বললে যে।'

—'বিশ্বাস হয় না মহারাজ?'

—'ভাইপোকে কাচতে দিলে তুমি, দেখিয়ে দিলে না কেন?'

—'আমি ছিলাম না মহারাজ।'

—'কোথায় গিয়েছিলে।'

—'গতবার জামাইষষ্ঠীর সময় শ্বশুরমশাই আমার তত্ত্ব-তলব নিতে পারেন নি, মনে বড় দুঃখ ছিল তাঁর, এবার তাই জামাই খাওয়ালেন।'

—'জামাইষষ্ঠী এখন কী রে। এ তো মোটে ফাল্গুন মাস—'

—'তা তিনি খাওয়ালেন তো।'

—'কদ্দিন ছিলে সেখানে?'

—'এই চোদ্দ দিন ছিলাম—কাল ফিরে এসে ভাইপোকে ঝাঁটা মেরেছি মহারাজ—কী ঝামেলা বলুন তো—রঙের একটা পোচড় অব্দি তুলে দিতে পারে নি—'

চুপ করে ছিল প্রভাত।

নিরঞ্জন—'আমাকে দিন—দু-দিনেই ফকফকে শাদা করে এনে দিচ্ছি—'

—'না, তোমাকে আর দেব না নিরঞ্জন।'

—'পরশুই এনে দিচ্ছি মহারাজ—একটা রঙের আঁশও যদি থাকে তবে আমার দুটো কান আমার পায়ের নীচে কেটে রেখে যাব।'

কিন্তু রঙের একটা আঁশও সে ওঠাতে পারে নি।

পরে প্রভাত বলেছিল—'আচ্ছা লেবুর রসে রং ওঠে যে।'

মাথা নাড়ে নিরঞ্জন—'তা কি হয়? রং পেকে যায়।'

—'আমরুল পাতার রসে?'

—টক জিনিশে রং পাকে—দিতে হয় জলের ছিটে; যত বড় বেয়াড়া রং হোক না কেন, কড়া রোদে তিন দিন জলের ছিটে দিয়ে ভাটিতে ফেললে—আচ্ছা, দেখবেন? আপনার জামাগুলো দিন, আমি তিন দিনেই রং তুলে দিচ্ছি—'

নিরঞ্জন এই রকম।

একবার একটি মশারি কাচতে নিয়ে প্রভাতকে বড্ড বিপাকে ফেলেছিল সে। ভোরের বেলা মশারি নিয়ে গেল, বললে—সন্ধ্যাসন্ধি দিয়ে যাব। কিন্তু তিন সপ্তাহের ভিতরে তার কোনো দেখাই নেই।

লোকটিকে খুব ভালো লাগে তবুও; কাপড়ের বস্তা নিয়ে যখন সে হাজির হয় দুদণ্ড বেশি বসিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে তাকে প্রভাতের; বসতে সেও খুব রাজি...কত রকম গল্পই যে জানে? সামান্য জিনিশও গাঁজিয়ে সরস করে বলবার ক্ষমতা আছে তার। কেন কথক হল না সে? কিংবা মফস্বল কোর্টের মোক্তার?

যাত্রার দলে কিংবা থিয়েটারে যে সব চলতি অভিনয়—তার চেয়ে নিরঞ্জনের এই হাট-বাজার ব্যর্থতা-বেদনা জীবন-মৃত্যুর কথা কত বেশি স্পষ্ট, মৃত্তিকাগন্ধী, গাজনের রসে ভরপুর—

ধোপার কাজ এর জন্য নয়।

এবার দেশে গিয়ে জামপুরের হাটের পথে নিরঞ্জনকে পাকড়াতে হবে—সেইখানেই সে আনাগোনা করে। তারপর তাকে ডেকে এনে বাড়ির পুবদিকের অশ্বত্থ গাছটার নীচে বসতে হবে একদিন দুপুরবেলা; এ চার বছরের মধ্যে কোনো নতুন বিমর্ষতা পেয়ে বসেছে না কি তাকে? জীবন কি কায়ক্লেশে চলে, না কোনো নতুন আত্মিক অর্থ শিখেছে? কাজে সে কি এখনো ফাঁকি দেয়? যাত্রা-থিয়েটারের জন্য মন উড়ু-উড়ু করে না কি আবার? জীবনটা নেহাৎ নিশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে হয়তো। কিংবা, হয়তো কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে; দাড়ি রেখেছে...বৈরাগী হয়েছে। যাই হোক না কেন, সে যতদিন বেঁচে আছে জীবনের হাট জমানো ব্যাপারের থেকে ফাঁকি দিয়ে সে কোথাও চলে যাবে না। মুখে তার গল্পের রং বদলাতে পারে কিন্তু ছাঁচ বদলাবে না—

নিরঞ্জন এমন সরস মানুষ।

চুরুটটা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলল প্রভাত; অনেকক্ষণ ধরে নিভে রয়েছে চুরুটটা; এবার জ্বালিয়ে নেয়া যাক...

দেশে গিয়ে এবার নানারকম পুরোনো জিনিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাকাতে ইচ্ছা করে। দেশের হাই স্কুলটা প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো। অনেক দিন ইস্কুলটার কোনো খোঁজখবর রাখে না প্রভাত; কতকাল ইস্কুলটার মুখও দেখে নি সে। প্রায় বছর পনেরো-ষোলো আগে সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সেই যে বেরিয়ে গেছে প্রভাত—এই ষোলোটা বছর ইস্কুলের দিকে আর মাড়ায় নি সে—

দিন-রাত্রি ফাঁকে ইস্কুলটার কথা যখনই মনে হয় হৃদয়টা এমন নরম হয়ে পড়ে—

ইস্কুলের সামনের প্রকাণ্ড মাঠটার কথা মনে পড়ে; ছুটির পর বিকেল বেলার সফেন সোনালি রোদের ভিতর অলস মাছির মতো তারা কয়েকজন মাঠের এক কিনারে বই ছড়িয়ে বসে থাকত মাঝে-মাঝে; মাঠটার সেই সবুজ কটা-ঘাসের গন্ধ ধূসর খড়ির মতো মাটির ঘ্রাণ—শুকনো ফুল ও নিম পাতার স্তূপ—লাল বটফলের গন্ধ—সেদিন এ সব বড় একটি গ্রাহ্যের জিনিশ ছিল না। কিন্তু আজ এই সবের কিনারে বসে ধীরে-ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও ভালো লাগে।

এর চেয়ে নিবিড় সুন্দর সফল পরিসমাপ্তি কোথাও নিয়ে যেতে পারে না আর।

মাঠটার কিনারে একটা মস্তবড় তেঁতুল গাছ ছিল—কী যে মিষ্টি তেঁতুল—টিফিনের সময় রমেন, অবিনাশ, ইয়ুসুফ আর প্রভাত ঢিল ছুঁড়ে তেঁতুল পেড়ে গাছের ছায়ায়-ছায়ায় চুপচাপ গিয়ে বসত—

সেই তেঁতুল গাছটা আছে আজ?

ড্রিল মাস্টার ছিলেন দ্বিজেনবাবু। লম্বা-চওড়া জোয়ান চেহারা—পাঞ্জাবি পালোয়ানের মতো দেখতে, হাতে সব সময়ই একটা বেত থাকত; ডেঁপো ছেলেদের দু-তিন ঘা লাগাতেন মাঝে-মাঝে—কিন্তু এমন মোলায়েম ভাবে যে তাতে চামড়া জ্বলত না কখনো, সুড়সুড় করত শুধু; বেত নিয়ে আস্ফালন করতেন বেশি—ছেলেদের ধরে মারা তার ধাতে একদম ছিল না। ছেলেদের সারিবন্দী সাজিয়ে কুচকাওয়াজ করাতেন—কখনো রাইট টার্ন, কখনো লেফট টার্ন, অ্যাবাউট টার্ন, মাঝে-মাঝে 'হল্ট' বলে চিৎকার করে উঠতেন। চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেলতেন তিনি : প্রত্যেকেই নিজেকে চোস্ত পদাতিক বলে মনে করত—কোথাও একটা সঙ্গীন লড়াই করতে চলেছে। প্রভাত মনে মনে ভাবত ভবিষ্যৎ জীবনেও সে এমনি আওয়াজ করবে—কাঁধে বন্দুক ফেলে মার্চ করে চলবে—সৈন্য হবে—কে জানে হয়তো নেপোলিয়ন হবে কিংবা মার্শাল নে—

বেশ দিনগুলো ছিল সব।

আবার সব পেতে ইচ্ছা করে। জীবনটাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে পারা যেত যদি।

দ্বিজেনবাবু কি বেঁচে আছেন?

এখনো ছেলেরা সেই মাঠে গিয়ে জড়ো হয়? ড্রিল করে? কী কথা ভাবে তারা? বুনো আনারস খুঁজে বেড়ায়? শুকনো বটপাতার চটের গন্ধ, ভালো লাগে তাদের?

তাদের জীবনের সংস্পর্শে আসতে ইচ্ছা করে বড়; সমস্ত নতুন মুখ—কিন্তু তাদের ভিতরেই সেই পনেরো বছর আগের স্কুলের ক্যাপ্টেন অবিনাশ বেঁচে রয়েছে, সেই

অমূল্য বেঁচে আছে, রমেশ বেঁচে আছে, ইয়ুসুফ বেঁচে আছে—হয়তো তাদের ভিড়ের ভিতর থেকে কোনো গোধূলি নেশাক্রান্ত কলরবহীন স্বপ্নাতুর নিরালা কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভাত তার পনেরো বছর আগের জীবনটাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য খুব তীব্রভাবে উদ্ধার করে নিতে পারবে।

চুরুটটা যেমন তেমনি নিভেই আছে। জ্বালানো হয় নি বুঝি? কই, দেশলাইটা কোথায়? দেশলাই বার করে এবার চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল প্রভাত।

দেশে যাবার সময় এবার খানিকটা ভালো চা নিয়ে যাবে সে; কমলাকে চা তৈরি করতে শেখাবে—পাতলা চা খেতে প্রভাত ভালোবাসে না—চা একটু কড়া হওয়া চাই—চায়ের পাতাও বেশ চমৎকার হওয়া চাই—তাজা দুধের চা হলেই ভালো। দিনের মধ্যে যতবার খুশি চা খাবে সে। কমলা হয়তো মাঝে-মাঝে মোড়া নিয়ে বসতে পারে—সে বড় মর্জির মানুষ।

একটা ছোট স্পিরিট স্টোভ কিনে নেবে প্রভাত—একটা ছোট কেটলি আর একটা পেয়ালা।

দেশে গিয়ে দুপুরটা কতরকম ভাবে কাটানো যায়?

নবীন মজুমদারের বাড়ি গিয়ে ব্রিজ খেললে কেমন হয়? তাই করবে সে। মজুমদারের মস্তবড় বাড়ি; টাকা-কড়ির সচ্ছলতা তাদের খুব—বাড়ির বুড়োরা সারা দিন শতরঞ্জ খেলে। আর ছোকরাদের ব্রিজের আড্ডা বারোমাস লেগে রয়েছে।

রোজ-রোজ ব্রিজ খেলে অবিশ্যি সে তৃপ্তি পাবে না।

এক-এক দিন দুপুরে বেরিয়ে পড়বে সে—ছোটবেলায় যে-পথ ধরে ইস্কুলে যেত সেই পথটা ঘুরে আসবে—দীর্ঘ আঁকাবাঁকা রাস্তা—কোথাও কাঁকরের, কোথাও মাটির—কোথাও এক-একটা রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ মাঠ—তার পরে বাঁশের জঙ্গল—এক একটা মস্তবড় অশ্বত্থ—পাকা-পাকা বেত ফলে ভরা নিবিড় বেতের বন—ছোটবেলা ইস্কুল থেকে ফিরবার সময় থেতলা-থেতলা শাদা ফলগুলো ছিঁড়ে নিত সে—নুন মাখিয়ে খেত।

সে কতদিন হল বেত ফল খায় নি—চোখেও দেখে নি। এবার দেশে গিয়ে এক-একটা দুপুরে খানিকটা নুন নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে—নিস্তব্ধ বেতজঙ্গলেব কাছে এসে একটা পল্লবিত হিজল গাছের ছায়ায় বসে বেতফল খাবে সে। মনে হবে না কি সেই ইস্কুলের দিনগুলো জীবনের থেকে সাঙ্গ হয় নি এখনো তাব? টিফিনের ছুটিতে বেতের ফল খেতে চলেছে সে; খাচ্ছে; এক্ষুনি হয়তো অমূল্য আর বিজন এসে হাজির হবে; একটা মোটা গুলঞ্চলতা ছিঁড়ে হাতে জড়াতে জড়াতে রুক্মিণী একবার দেখা দিয়েই গভীর জঙ্গলের ভিতর কাটা বহরের জন্য ঢুকে পড়বে...

বাবা অনেক বই দিয়েছিলেন—নানারকম ইংরেজি বই—হাক্সলি আছে, হার্বার্ট স্পেন্সার আছে, ডিকেন্সের সম্পূর্ণ সেট রয়েছে—ইস্কুলে যখন পড়ত প্রভাত, তখন ডিকেন্সকে কেমন কঠিন মনে হয়েছে তার;

—বড্ড দুর্বোধ্য—বুঝে উঠতে পারত না।

কলেজে উঠে ডিকেন্সকে উপেক্ষা করে গেছে; একটা বইও স্পর্শ করতে যায় নি তার; হিউগো পড়েছে, ডুমা পড়েছে, ফ্লবেয়ার পড়েছে—ফরাসি উপন্যাস না পড়লে মনে উঠত না তখন—কলেজে ছেলেদের কাছে কেমন বাহাদুরিও বজায় থাকত না যেন। তারপর টলস্টয়, চেখভ্‌ টুর্গেনিভ পড়ল—কিন্তু ডিকেন্সকে ছুঁল

না। এম.এ পাশ করে কলেজের থেকে বেরিয়ে কন্টিনেন্টের ঢের বই পড়ল সে...কিন্তু ডিকেন্স অস্পৃশ্য হয়ে রইল। আজ এই ত্রিশ বছর বয়সে ডিকেন্সের একখানা বইও তার পড়া নেই। ব্যাপারটা হয়তো বিশেষ লজ্জার কিছু নয়...কিন্তু এক-একবার প্রভাত অবাক হয়ে ভাবে বাবা অত সাধ করে ডিকেন্সের সমস্ত বইগুলো কিনলেন, পড়লেন, প্রাজ্ঞের মতো অজড় অমর সংস্থিতি নিয়ে ডিকেন্সকে করেছিলেন যেন তিনি তার খাদ্য—কথাবার্তায় অনেক সময়ই ডিকেন্সের গল্প পাড়তেন। এ-রকম কেন? বইগুলো না পড়া পর্যন্ত কেমন যেন একটা কুজ্ঝটিকা কৌতূহল ডানা বিস্তৃতিকে দাবিয়ে রাখে। দেশের বাড়িতে গিয়ে এ কৌতূহল তৃপ্ত করতে হবে এবার..ডিকেন্সের অতগুলো বই, উই-আরশোলা ও চুরি-চামারির হাত থেকে বেঁচেছে; খুব স্থির নিরপেক্ষ বিচার নিয়ে পড়ে দেখবে প্রভাত...

এই বইগুলো নিয়ে কয়েকটা দুপুর বেশ ভরসার সঙ্গে কাটবে আশা করা যায়—

সন্ধ্যা হয়ে গেল—

বিছানার উপর শুয়ে পড়ে চুরুটটা ফুঁকে-ফুঁকে শেষ করতে রাত হয়ে যায়; তারাপদর কাছে আজ আর যাওয়া হল না।

পরদিন সকালবেলা তারাপদ কুড়িটা টাকা দিল—মেসের ম্যানেজার আট টাকা পায়, থার্ড ক্লাসের একটা টিকিটের জন্য সাড়ে চার টাকা রেখে বাকি টাকাগুলো দিয়ে প্রভাত একটা থান কাপড়, সুতির শাড়ি ও লাটিম বেলুন, ছবির বই কিনে নিল।

ধার করার আগে হাতে তিন টাকা সোয়া ন আনা ছিল—টিকিট কেটেও তাহলে পাঁচ-ছয় টাকা হাতে থাকে—প্রভাত কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই-এম-সি-এতে ঢুকে পাঁচ পয়সা দিয়ে চা খেল। ছোট এক কেটলি ভরা চা...প্রায় দু কাপ আন্দাজ হল—বেশ চা খেতে-খেতে অনেকক্ষণ ফ্যানের নীচে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থেকে এই বিরাট পৃথিবীর জীবন ব্যাপারে চরিতার্থ একজন সার্থক জীব বলে মনে হতে লাগল নিজেকে।

কয়েকটা দামি চুরুট কেনা যায়; কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে গিয়ে একবার বসে, অশ্বত্থ-দেবদারুর দিকে তাকিয়ে দেখে, দিঘির চার কিনার ঘিরে মরশুমি ফুলের গাছগুলো ঢের বড় হয়ে উঠেছে—ফুলের সম্ভার ঢের তো এবার—বিমুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করে নেয়। একটা চুরুট জ্বালায়, ছাঁটা-ছাঁটা মেহেদি গাছের ডালপালার ভিতর চড়াই না কি—তাকিয়ে দেখে একবার—দিঘির পুব-দক্ষিণ কোণে নারকেল গাছটাকে জড়িয়ে জড়িয়ে লতাটা বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে এদ্দিনে—কিন্তু দেশের পথেঘাটে এ রকম কত লতা, কত ঝুমকো ফুল! সুইমিং ক্লাবের ছেলেরা ওয়াটার পোলো খেলছে। একটি ভদ্রলোক, তার স্ত্রী ও দুই-তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে আছে; ভদ্রলোকের মাথায় ছাতা, স্ত্রীর মাথায় ঘোমটা, ছেলেমেয়েদের মাথায় বাঁদর টুপি। কলকাতায় এরই নাম বোধ হয় মুক্তবাতাস সেবন। আকাশ বাতাস আলো-রৌদ্র যেন এখানে লিমিটেড কোম্পানির জিনিশ; কাদের বেশি শেয়ার—বড় বড় ডিভিডেন্ড টানে, বিধাতা জানেন—বিধাতা একাই টানেন হয়তো—কেমন একটা চিমসে দরিদ্রতা ধরা পড়ে যেন এখানে—ভাবতে গেলে দম আটকে আসে যেন—আর তিন-চারদিন পর পাড়াগাঁর মাঠপ্রান্তরের গভীর দাক্ষিণ্যের ভিতর হাঁটতে-হাঁটতে কলকাতার রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি ও জীবনের নিয়ম, অবাঞ্ছিত অনিয়মের রুদ্ধশ্বাস বলে মনে হবে তার কাছে—

দেবদারু মর্মর করে ওঠে। অশ্বত্থের ভিতর দিয়ে ল্যাজঝোলা পাখির মতো হু-হু করে দক্ষিণের বাতাস উড়ে যায়—ডালপালা নড়ে—বুলবুলির পাখনা কেঁপে ওঠে—হলদে শুকনো পাতা বেঞ্চির চারদিকে ছড়াতে থাকে—বাতাসের তাড়ায় সূর্যমুখীগুলো প্রভাতের দিকে চোখ ফিরিয়ে কাঁপতে থাকে—

কয়েকটা মিনিট কেমন একটু বিহ্বল হয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকতে হয়; কিন্তু ভাবটা কেটে যায় শিগ্‌গিরই। সুইমিং ক্লাবের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয়। আজই বাড়ি যেতে হবে যে তাকে। সব ঠিকঠাক করে তিনটার সময়ই স্টেশনে পৌঁছুনো চাই।

মেসে গিয়ে দেখল কমলার একটা কার্ড এসেছে। বউয়ের চিঠির সুর লড়াইবাজ রক্তাক্ত চিলবধূর মতো যেন—নিজেকেও সে ছিঁড়ে খেতে পারলে বাঁচে; আশাস্বপ্নসমাকুল মেঠো ইঁদুরের জীবনেও এক মুহূর্তের শান্তি (ফুরিয়ে যায় যেন)। মেসের কামরার ভিতর ঢুকে হাতের বস্তাটা বিছানার এক পাশে ফেলে দিয়ে প্রভাত অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ল।

নাঃ—দেশে যাওয়া আর হবে না, গিয়ে করবে কী সে?

পরদিন সকালবেলা নিজেকে বড্ড বোকা মনে হল; একটা দিন মিছিমিছি মাটি করেছে সে। কমলা যা খুশি তা লিখুক গিয়ে কিন্তু দেশ তো কমলার নয়; মা রয়েছেন—কেতু কুকুরটা আছে—নিরঞ্জন আছে—খোকা আছে—শ্মশানে বাবার ইশারা রয়েছে—পথেঘাটে কত চেনা লোক—বাড়ির পুবদিকের অশ্বত্থ গাছটা—

প্রভাত সকালবেলাই তার জিনিশপত্র গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখল; বাকি শুধু বিছানা বাঁধা, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে বেডিংটা বেঁধে ফেলবে সে—আড়াইটার সময় স্টেশনের দিকে রওনা দেবে।

আর বেরুল না কোথাও সে।

চায়ের দোকানে অব্দি গেল না। চাকরকে দিয়ে বাইরে থেকেই চা আনিয়ে নিল। বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজটা অনেকক্ষণ ধরে পড়ছিল—হঠাৎ পায়ের শব্দে কাগজ সরিয়ে তাকিয়ে দেখল—চশমা চোখে একটি ছেলে এসে তার চৌকির কাছে দাঁড়িয়েছে।

প্রভাত—'আপনি কাকে চান?'

—'আপনি কি প্রভাতবাবু?'

—'হ্যাঁ।'

—'কার্তিকবাবুকে আপনি চেনেন?'

—'চিনি।'

ছেলেটি প্রভাতের চৌকির উপর বসে।

—'আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি, তিনি আমাকে পড়াতেন, কয়েক দিন হল দেশে গিয়েছেন, মাস তিনেকের ভিতর বোধ হয় ফিরবেন না আর। সামারটা দেশেই কাটাবেন—'

ছেলেটি একটু চুপ করে বললে—'তা আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলেন আমার কাছে। বললেন যে আপনি খালাশ মানুষ আছেন—টিউশন খুঁজছেন—পড়ানোর অভ্যাস-টভ্যাস আছে আপনার—'

ছেলেটি মৃদুভাবে একবার গলা খাঁকরে—'তা আছে কি?'
প্রভাত কোনো জবাব দিল না।
—'শুনলাম, আপনি আট-দশ বছর হল এম-এ পাশ করেছেন; তাই না কি?'
কোনো উত্তর না পেয়ে ছেলেটি বললে—'হ্যাঁ, আমি শুনেছি তাই। ছাত্র পড়াবার অভ্যাস আছে আপনার। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ অব্দি অনেক ছেলেই পড়িয়েছেন না কি?'
ছেলেটি কুণ্ঠিত অমায়িক চোখ তুলে প্রভাতের দিকে তাকাল—
প্রভাত বালিশে মাথা রেখেই—'কার্তিক চলে গেছে নাকি?'
—'হ্যাঁ দেশে গিয়েছেন।'
—'কেন?'
—'গরমের সময় এই তিন-চারটা মাস দেশেই কাটান তিনি, প্রফেসার মানুষ, ছুটিও তো কম নয়—'
—'আপনাকে তিন মাস পড়াতে হবে।'
—'তারপর?'
—'কার্তিকবাবু আসবেন।'
—'এই তিন মাসের জন্য অনেক টিউটরই তো পেতে পারেন আপনি।' ছেলেটি একটু বিস্মিত হয়ে প্রভাতের দিকে তাকাল; সামান্য একটা টিউশন পাবার জন্য কাঠপিঁপড়ের মতো মানুষের দঙ্গল কতবার তাদের বাড়ির দেউড়িতে ধরনা দিয়েছে—কলকাতা শহরের আধাআধি লোকের মাথা তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়; আর এ মানুষটিকে নিজে যেচে সে কাজ দিতে এসেছে, আর তার এই রকম জবাব?
প্রভাত—'দেখুন, আমার বড্ড অবসন্ন বোধ হয়—'
—'কেন বলুন তো?'
—'আজ আমার দেশে যাবার কথা ছিল।'
—'ও, সেখানে কারো অসুখ করেছে বুঝি?'
প্রভাত—'কারো অসুখ না করলে দেশে যেতে নেই?'
—'না, তা নয় অবিশ্যি, তবে আমি ভেবেছিলাম—'
—'চার বছর আমি বাড়ি যাই নি। খোকা আছে। মা আছেন। স্ত্রী আছে। কেতু বলে একটা কুকুর আছে। এদের দেখতে ইচ্ছা করে না?'
ছেলেটি একটু হেসে বললে—'তাই তো?'
দুপুরবেলা প্রভাত বিছানা বাঁধাছাঁদা করছিল—কার্তিক এসে ঢুকল। প্রভাত চোখ তুলে—'তুমি? বাঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গিয়েছ—'
—'দার্জিলিং গিয়েছিলাম, ফিরবার পথে আবার কলকাতা হয়ে বাড়ি যাচ্ছি—'
—'ও, দার্জিলিং গিয়েছিলে বুঝি? তা দার্জিলিং কেমন জায়গা কার্তিক? বেশ চমৎকার, না? একবার গিয়ে দেখতে হবে তো। পয়সাই-বা কোথায়?'
—'তুমি তো আচ্ছা ইডিয়েট।'
—'কী রকম?'
—'সমীরকে পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে—তুমি তাকে ফিরিয়ে দিলে যে।'
—'ও, সেই কথা?'
—'এমন আহাম্মক তুমি।'

—'আমি দেশে যাচ্ছি।'

—'কেন, সেখানে কোন উল্লুকের তিন হাত দাড়ি গজিয়েছে যে তোমার না কামালে চলবে না—'

প্রভাত মাথা নেড়ে—'না, সে হয় না কার্তিক—কলকাতায় আর থাকা যায় না—'

—'টাকায় কামড়ায় তোমাকে? ছেলেটা মাসে-মাসে ত্রিশ টাকা করে দেবে তোমাকে—'

—'তা দিলই-বা।'

—'বেশ তো, মেস-এর খরচ চলে যাবে তোমার।'

—'তা চলে যাবে বটে। এই চার বছরও তো টিউশন করে মেসের খরচ চালিয়ে এলাম।'

—'বেশ তো, কী আর করবে। চাকরির যা বাজার তাতে এইটুকুও তো ছোটখাটো একটি যজ্ঞ ফল ; পিতৃপুণ্য ছাড়া জোটে না।'

—'তা আমি জানি। এ তিন মাস এই টিউশনটা নিয়ে থাকলে চাকরি খুঁজবারও সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু, কার্তিক, আমি আর কলকাতায় থাকতে পারি না—'

—'কেন?'

—'চার বছর আমি কাউকে দেখি নি কার্তিক, মাকে না, খোকাকে না, খোকার মাকে না।'

কার্তিক চুপ করে ছিল।

প্রভাত—'কেতু বলে একটা কুকুর আছে—সেটা হয়তো সারা দুপুর চনমন [চুনমুখ?] করে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে খোঁজে। কে জানে খেতে পায় কি না।'

দুজনেই চুপ।

—'প্রভাত, কেতু বেঁচে আছে কি না সে খবরও আমাকে কেউ দেয় না—নিজের স্বার্থের বাইরে মানুষ এত উদাসীন।'

কার্তিক কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে জ্বালাল।

প্রভাত—'শ্মশানে বাবার ভস্মের ওপর গোটা দুই ইট আছে ; কে জানে জঙ্গলে ভরে গিয়েছে হয়তো। দুটো ইট শুধু তার, নীচে কী, কে জানে? মৃত্যুর পর আমাদের কী হয়? কী হয় কার্তিক? হয়তো এই টেবিলটা, এই দেয়ালটা, এই সিগারেটের ছাইয়ের মতোই অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে থাকি। কিন্তু তবু এক-এক দিন কিছুতেই টিকতে পারি না যেনই এখানে ; মাঝরাতে বিছানার থেকে উঠে বসি—মনে হয় বাবা যেন আমাকে দেশে তার ঘরে গিয়ে বসতে বলছেন—শ্মশানে তাঁর চিতা বেড় দিয়ে সাপের বিড়ের মতো বনচাঁড়াল আর মনসা কাঁটার জঙ্গল সব—হয়তো-বা তার নীচে মৃতের অস্তিত্ব এই দেয়ালটা, টেবিলটা, এই ধুলো, এই সিগারেটের ছাইয়ের মতো কিন্তু তবুও—তবুও—কার্তিক।'

কিন্তু কার্তিকের ইচ্ছাই টিকল—

তিন মাসের জন্য সমীরকে পড়াবার কাজে প্রভাতকে বহাল করে সে চলে গেল।

তিনটি মাস বড় সহজে কাটতে চায় না—

এক-এক দিন দুপুরবেলা মনে হয় ; কমলার তো বিশেষ কোনো ব্যাকুলতা নেই

মনে—সে কেমন বিমুখ উদাসীনগোছের মেয়েমানুষ—কিন্তু খোকাকে আর কেতুকে বড় ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, কোথায় ফাল্গুন মাসে দেশে যাওয়ার কথা। এখন চৈত্র ফুরুতে চলল, খোকার ছবির বই, লাটিম আর বেলুন বাক্সর ভিতর পচছে। লজেনচুষগুলো গলে গিয়েছে সব, বিস্কুট কেমন মিইয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, ছাতকুড়ো পড়ে গেছে। কেতুকে হয়তো এখনো পচা বিড়াল কাকের মাংস খেতে হয়, সমস্ত দুপুর বাঁশের ঝাড়ের কাছে বসে কচ্ছপের খোলা চিবোয় হয়তো ; সমস্ত দিন কুই-কুই করে একা-একা ঘুরে বেড়ায় হয়তো..... কোনো কাজ নেই, দাম নেই, উপায় নেই, ভিতরের খবর জানাবার কোনো লোক নেই কোথাও ; বাস্তবিক একটা কুকুর যখন একা সাথীহীন হয়ে পড়ে তখন নিঃসঙ্গ মানুষের চেয়েও ঢের বেশি কষ্ট তার।

কে জানে কেতু বেঁচেই-বা আছে কি না?

এক-এক দিন গোলদিঘিতে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘুরে অবসন্ন হয়ে রাত্তির বেলা বিছানায় এসে শুয়ে প্রভাতের মনে হয় দেশের বাড়িতে এতক্ষণে মা-র সঙ্গে আর কমলার সঙ্গে কথা বলে নিস্তার পেয়ে বাঁচত সে ; কিংবা নিরঞ্জনকে নিয়ে অশ্বত্থগাছের কাছে আমরুল আর ঘাসে ঢাকা বাঁধানো পৈঠার উপর বসে রক্তাক্ত সংগ্রাম থেকে ছুটি নিয়ে বৈতরণী পারের স্তিমিত ও নরম অন্ধকারের মতো শান্তি ও আশ্বাসে পাড়াগাঁর রাত্রি—

মা-র চিঠিতে খবর পেয়েছে প্রভাত, যে, উষা দেশে এসেছে, প্রভাতদের পাশের বাড়ির অক্ষয়বাবুর মেয়ে উষা আহা, সে এসেছে। আবাল্য তার সঙ্গে মুখের আলাপ রাখে নি কোনোদিন প্রভাত, এমনই লাজুক। কিন্তু কত দিন ধরে এই মেয়েটিকে দেখে এসেছে প্রভাত নম্র, স্নিগ্ধ, বিচক্ষণ, নিঃশব্দ। অন্ধকার রাতে কাঁঠাল-হিজলের জঙ্গলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে যেমন ভালো লাগে—এই মেয়েটিকেও তেমনি লাগে—

দু-তিন বছর পরে উষা দেশে ফিরল—অথচ এই সময়ে নিজে সে দেশে থাকতে পারল না। রাতে গান গাওয়ার অভ্যাস এই মেয়েটির—রোজ রাতেই সে গায় ; কেমন গভীর আত্মনিবেদন আত্মসমর্পণের গান—নারীর সজীব সাধক হৃদয়ের থেকে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছে। তাই এমন নিবিড় ভাবে সরস।

এবারও কি উষা গায়?

এখানে গভীর রাতে মেসের ঝি সৈরভীর গলা খনখন করে ওঠে—ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া না ইয়ার্কি ঠিক বুঝতে পারা যায় না। রাতের অনেক কটা মুহূর্ত—অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কর্কশ বৈচিত্র্যহীন মূল্যহীন গলা নিজের ঢাক পিটিয়ে চলে।

অবাক হয়ে ভাবে : জীবনের বিচিত্র নিয়ম—এমন রাতে।

এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় টালিগঞ্জের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে দেশের শ্মশানের কথা মনে হয়—বাবার মঠের কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে—

চৈত্রের করুণ বাতাসের ভিতর দিয়ে কে আসে?—উড়ো শুকনো পাতা? সুরকি? কাঁকর? খড়? হ্যাঁ, বাবার গলাও যেন—সেই দূর শ্মশান থেকে যেন ডাকছেন 'খোকা, তুমি আমার কাছে এসে একটু বোসো—আমি শান্তি পাই। কলকাতার পথে-পথে হতভাগা ছেলে তুমিই-বা কত দিন এই মনের অশান্তি নিয়ে কাটাবে?'

চৈত্রের বাতাস উড়ে ভেসে চলে যায়; টালিগঞ্জের থেকে পায় হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম-বাস-ট্রাক-গ্যাস লাইটের একটা বিপুল উন্মাদনার ভিতর এসে পড়ে প্রভাত। কী নিয়ে এত উন্মাদ? এতে কার কী লাভ? .

দেখতে-দেখতে তিন মাস প্রায় শেষ হয়ে এল।

সমীর একদিন বললে—'আপনি ইস্কুলের মাস্টারি পেলে নেন?'

—'তা নেই অবশ্যি।'

—'টেম্পরারি কিন্তু।'

—'কোথায়?'

—'আপনার ভয় নেই—কলকাতা ছাড়তে হবে না।'

—প্রভাত মাথা নাড়ে—'না, কলকাতা তো আমার এমন একটা প্রিয় জিনিশ নয় সমীর—'

প্রভাত একটু চুপ থেকে—'এক-এক সময় পথঘাট একেবারে দুঃসহ হয়ে ওঠে—যে কোনো জায়গায় পালিয়ে যেতে পারলে আমি বাঁচি।'

—'মাস্টারিটা কলকাতায় অবশ্যি। বাবার ইস্কুল—বাবা সেক্রেটারি। তা বসে আছেন, নিন না—'

প্রভাত কোনো উত্তর দিল না।

সমীর—'ছ-মাসের জন্য কাজ, ডিসেম্বর অব্দি—করবেন?'

প্রভাত—'ভাবছিলাম দেশে যাব।'

—'দেশে তো সব সময়ই যেতে পারেন।'

—'মনসা কাশীং গচ্ছতি; মনসাবাবু কাশী যায়, না মনে-মনে কাশী যায়।'

—'কেন, ট্রেনে-স্টিমারে করে যেতেই-বা কী বাধা?'

—'কী রকম?'

—'নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করি ততটা আমি নই—তাই যদি হতাম তা হলে সেই যে তিন মাস আগে বিছানাপত্র বেঁধে যাচ্ছিলাম, চলেই যেতাম, কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না—'

সমীর একটু চুপ থেকে—'কিছু মনে করবেন না—আপনার দাম্পত্যজীবন বেশ নির্ব্বিবাদ? মানে সুখের? কী বলেন?'

প্রভাত একটু হেসে—'বাঃ! একথা জিজ্ঞেস কর কেন তুমি?'

—'আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বেশ শান্তির তো?'

—'যেমন সচরাচর হয়।'

সমীর একটু চুপ থেকে হেসে বললে—'আপনি বলছিলেন কি না নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করেন ততটা নন—সেই জন্যেই কেমন কৌতূহল হল—জিজ্ঞেস করলাম। পুরুষ-মহিলার সম্বন্ধ নিয়ে আমি একটা আলোচনা করছি—প্রবন্ধও লিখি—'

প্রভাত একটু হেসে—'আজকালকার ছেলেরা আমাদের চেয়ে ঢের প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই বয়সে আমরা তেঁতুলবিচি নিয়ে খেলা করতাম—'

প্রভাত একটু চুপ থেকে—'প্রেম বলতে তোমরা নর-নারীর নানারকম সম্পর্ক বোঝ—কী বলো সমীর? কিন্তু আমি ঢের জিনিশ বুঝি—স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধই শুধু নয়;

দেশের মাঠ, পথ, সেই ইস্কুলের বাড়ি, অশত্থ গাছটা, খোকা বা কেতু।'

ইস্কুলের কাজ নেবার কোনো ইচ্ছা ছিল না প্রভাতের কিন্তু মানুষের সাংসারিক লাভক্ষতির ব্যাপার প্রভাতের চেয়ে সমীর ঢের বেশি ভালো বোঝে।

প্রভাতকে ছাড়ল না—একেবারে তার বাবার কাছে নিয়ে গেল। তাঁর কথামতো কাজটার জন্যে একটা দরখাস্ত করতে হল। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের কাজ—ছয় ঘণ্টা পড়াতে হয়—পাঁচ-ছয় দিন মাস্টারি করার পর প্রভাত কমলার চিঠি পেল; কেতু মরে গেছে, খোকারও হুপিং কাফ, রক্ত আমাশয়। কিন্তু ইস্কুলে প্রভাত মাস্টারি পেয়েছে শুনে কমলা খুব খুশি।

কমলার এ চিঠি পাওয়ার পর অনেক কটা দিন প্রভাত ইস্কুলের থেকে ফিরে নিজের ঘরে অবিশ্রাম পায়চারি করতে করতে ভাবত : জীবনে ব্যবসাবোধ মেয়েমানুষের কী ভয়াবহ।

এমন অবসাদ বোধ হয়।

সারাটা দিন হাতে খড়িমাটির রং লেগে থাকে—ইস্কুল থেকে ফিরে এসে ধীরে-ধীরে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে প্রভাত; এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়ে কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখে দু-তিনটি চকের স্টিক—ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে লিখতে পকেটেই ফেলে রেখেছিল না জানি কখন—ইতিহাস জিওগ্রাফির কয়েকখানা টেক্সট জোগাড় করে নিতে হয়েছে—দিনরাতের অনেকটা সময়ই এই বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে হয় তার; ভালো করে ম্যাপ আঁকা শিখতে হয়, ইতিহাসের সন তারিখ মুখস্থ রাখতে হয়।

মাঝে-মাঝে রাস্তার ওপারে পানওয়ালার দোকানের দিকে তাকিয়ে ভাবে—কেতু গেল মরে। কেউ ঠেঙিয়ে মারল না কি? নিজের থেকেই মরে গেল? প্রভাত বাড়িতে না যেতেই মরে গেল। একটু অপেক্ষা করতে পারল না? আর ফিরবে না কোনোদিন? কোনোদিনই ফিরবে না? বাস্তবিক কোনোদিনই ফিরবে না আর?

জিওগ্রাফি, ইতিহাস যত সোজা মনে করেছিল সে তা নয়; সেই কবে আঠারো-কুড়ি বছর আগে ইস্কুলের নীচের ক্লাসে এ সব পড়েছিল সে, এ সবের একটা কথাও কি এখন মনে আছে তার। ইতিহাস ও ভূগোলের অসংখ্য রাশি-রাশি ব্যাপার ও বিষয়ের সমাবেশ বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা করে না, কল্পনার না, কবিত্বের না, স্মরণশক্তির ওপর জুলুম করে শুধু।

বড্ড অবসাদ বোধ হয়।

এক-এক দিন ক্লাসে ভূগোল ও ইতিহাসের নানারকম খুঁটিনাটি ভুল নিজেই সে করে ফেলে; ছেলেরা বড় একটা ধরতে পারে না। কিন্তু নিজের মনের কাছে বড় লজ্জা পায় সে।

কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল অঙ্ক নিয়ে। উপরের ক্লাসের জ্যামিতি পড়াবার ভার তার ওপর। ছেলেরা কঠিন-কঠিন এক্সট্রা নিয়ে এসে হাজির হয়। কাজেই বাড়িতে বসে গত তিন মাস অনেক আট-ঘাট করে তৈরি হয়ে যেতে হয় তাকে। ইংরেজির মানুষ প্রভাত। অথচ তাকে ইংরেজি পড়াতে দেওয়া হয় না। একদিন হেডমাস্টারকে সে—'আমাকে ইংরেজি পড়াতে দিন।'

—'তা হয় না।'

—'কেন?'

—'আপনি যার জায়গায় এসেছেন তিনি হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি-জিওমেট্রিই পড়াতেন।

প্রভাত—'তিনি কী পাশ করেছিলেন?'

—'এল-টি।'

হেডমাস্টার কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে গম্ভীরভাবে—'তাছাড়া তিনি টেকনিক্যাল স্কুলেও পড়েছিলেন।'

একবার গলা খাঁকরে নিয়ে—'ড্রিল করাতেও পারতেন।'

হেডমাস্টার প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না—কেমন একটা রাশভারী চাল বজায় রাখেন ও পড়াবার কাজের থেকে অফিসের কাজই তাঁর বেশি; অনেকটা সময় বসে নিজের কী একটা কম্পোজিশনের বইয়ের প্রুফ দেখেন। নতুন ম্যানুয়াল লেখেন, লম্বা কালো দাড়ি, সোনার চশমা, পরনে শাদা পেন্টালুন, গলাবন্ধ তসরের কোট। বুক পকেট থেকে সোনার চেন ঝুলছে। ইস্কুলের পাঁচিলের কাছে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ—সমস্ত ইস্কুলটার ভিতর এই যেন একটু জীবন।

আর এই ছেলেরা।

কিন্তু মাঠ প্রান্তরের কুয়াশার বিস্তৃতি, কাঁচপোকানীল কাজলস্নিগ্ধ বট, অসংখ্য ডালপালা গুঁড়ি জড়িয়ে অজগরের মতো সহস্রধারা লতা, মৃদু বেগুনি ফুল, লাল বটফলের দিকে সহস্র শালিখ কোকিলের কৌমার্যভার, আনন্দ; বিশাল অশ্বত্থ, পাকুড়, হিজল, জামের ডালপালার ফাঁকে রাত্রিব তারা, জ্যোৎস্নার চাঁদ, দিনের অপরিমেয় আকাশের গন্ধ, চট বাবলার জঙ্গল ও ঝিঁঝির ডাকের ভিতর মানুষ হয়েছিল যারা সেই সব ছেলেদের কথা মনে পড়ে। এদের মুখের দিকে তাকালে তাদের কথা মনে পড়ে কেবল; তারা কত অন্যরকম। দেশের বাড়ির সেই ইস্কুলটা চোখের সামনে জেগে ওঠে; সেই কুড়ি বছর আগের অমূল্য, বিজন অবিনাশ রুক্মিণী—

দিনের পর দিন কেটে যায়।

মা-র চিঠিতে জানা যায় হেমন্ত কিছুদিন হল দেশে ফিরে এসেছে; এখনো সে সেই মঠেরই সন্ন্যাসী; অনেক জায়গা ঘুরেছে; মাথা মুড়নো—গেরুয়া কাপড় গায়ে, পায়ে একটি কাঠের খড়ম—

আহা, হেমন্ত তা হলে দেশে ফিরল আবার? এই সময়ে দেশে থাকলে বেশ হত।

দেশের ইস্কুলেই তারা দুজনে পড়েছিল—হেমন্ত এক ক্লাস উপরে পড়ত; কলেজে উঠেই সে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়।

ইস্কুলে থাকতে একটা ঘড়ি দিয়েছিল প্রভাতকে সে; রোজ শেষ রাতে অন্ধকার থাকতে প্রভাত হেমন্তকে ডেকে নিয়ে বেরুত সেই এক ক্রোশ দূরে মধুমুখী দিঘির থেকে পদ্মফুল তুলবার জন্য। পথে একটা শেয়াল একদিন রুখে এসেছিল দুজনকে; সে কী উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় প্রভাতের—পিছনে হেমন্ত ছুটতে-ছুটতে চেঁচাচ্ছিল, 'ওরে প্রভাত, থাম-থাম, শেয়ালটা পালিয়ে গেছে—থামবি না রে।'

প্রভাতের মাকে মা বলে ডাকত; কতদিন কত কাজে-অকাজে প্রভাতের কাছে এসেছে সে।

কলেজে উঠেই খুব টলস্টয় পড়ত হেমন্ত—টলস্টয়ের উপন্যাস নয়—অন্য বইগুলো। দেখেশুনে প্রভাত এমন ঠাট্টা করত তাকে—

কদমফুলের মতোন চুল ছাঁটত—বিছানার চাদর গায়ে দিত—বিস্তর নিরস নিষ্ঠুর

বই পড়ত সে—কিন্তু নিজে খুব হাসি-তামাশা মজলিশের লোক ছিল—একদিন কলেজে তাকে আর দেখা গেল না—সেই থেকে সন্ন্যাসী—

হেমন্তর জীবন একটা শ্মশানের খালের কিনারে রহস্যময় ফণীমনসার জঙ্গলের মতো গেল ন্যাড়া হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে।

বছর পাঁচেক আগে হেমন্ত যখন দেশে এসেছিল প্রভাত ওকে কমলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কমলা প্রণাম করল না। কিন্তু হেমন্ত খুব হৃদয়ের প্রসাদে আশীর্বাদ করল—একেবারে ঘোমটার ওপর পাঁচটি আঙুল চেপে—

তারপর বললে—'যাক, নাকের ডগা অব্দি ঘোমটা টানো নি যে এই জন্য তোমাকে ঢের ধন্যবাদ।' কমলার ঘোমটা নিঃসংকোচে ধরে টেনে সিঁথির সিন্দুর অব্দি উঠিয়ে দিল সে—

বললে—'তোমরা যে কথা বলবে মেঝে ফেটে যাবে'

কথা কমলা বললে না কিছু। কিন্তু বুঝলাম হেমন্ত আবার বাকশক্তি ফিরে পেয়েছে ও শব্দব্রহ্মে তার খুব বিশ্বাস।

হেমন্ত—'তোমাদের এই চিৎপটাং কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ির মতো ভাবগতিক দেখে ইচ্ছে হয় যে কোথাও লুকিয়ে যাই।'

গতবার বলেছিল—'পাঞ্জাব-মিরাট-পেশোয়ার-অমরনাথ-বদ্রীনাথের দিকে চললাম রে ভাই। ফিরব কি না শঙ্করী জানেন।'

বাস্তবিক।

দেশে ফিরেছে সে এবার; দেশের চণ্ডীমণ্ডপ, বারোয়ারি তলা, বৈঠকখানা, পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর জমিয়ে রাখবে সে কয়েক দিন।

দিনের পর দিন কেটে যায়—

দু মাস চলে গেল—আরো চার মাস বাকি।

মা লিখেছেন : খোকা বেশ গাইতে পারে। কমলা লিখেছে; খোকা পড়াশুনা করে না কিছু, ঘরে থাকে না মোটে, সারাদিন কামারপাড়ায় টইটই করে বেড়ায়। নচ্ছার ছেলেদের সঙ্গে মেশে; রোজই পাড়ার ছেলেদের লাথি কানমলা খেয়ে আসে। ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই? সেদিন পায়ে একটা মাদার কাঁটা ফুটিয়ে আনল—

পড়তে-পড়তে চিঠিটা রেখে দেয় প্রভাত—

চুরুটটা জ্বালিয়ে নেয়। এই তো বেশ : সেই ছমাসের নিঃসহায় শিশু ক্রমে-ক্রমে মানুষ হয়ে উঠছে। মুহূর্তে মুহূর্তে জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে যে ছোট্ট টুকটুকে পা দুটো দেখে এসেছিল সে আজ তা (কাঁটা) ফুটিয়ে নেবার মতো উপযুক্ত হয়ে উঠল। কে জানে ভবিষ্যতের কোনো এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে এই পা হয়তো ট্রেঞ্চের ভিতর ছুটে বেড়াবে—

এর পর নিজের জীবন সংগ্রাম প্রভাতের কাছে অনেকটা লঘু বোধ হয়।

কিন্তু রাতের বেলা মনের ভেতর কেমন যেন করতে থাকে প্রভাতের; কমলা লিখেছে ছেলেটার যেন মা-বাবা নেই। সারাদিন কত ছেলের তত্ত্বাবধান করে প্রভাত—আর নিজের ছেলেটা পথে-পথে ঘুরে মরে।

আরো গভীর রাতে প্রভাতের মনে হল : পাঁচ বছর আগে লাল তুলতুলে ছোট্ট যে দুটো পা সে দেখে এসেছিল—ছোট্ট দুটো হাত—দেশে গিয়ে এবার আর সে সব দেখবে না সে। ছেলেকে কথায়-কথায় কোলে তুলে নেওয়ারও একটা অসভ্য

জিনিশ হয়ে দাঁড়াবে—খোকা তা প্রত্যাশাও করবে না; বাপও লজ্জিত হবে—ছেলে নিজেই লজ্জা পাবে সবার চেয়ে ঢের বেশি। আদর করতে গেলে এড়িয়ে যাবে, ছুটে পালিয়ে যাবে ছেলেটি। আদর করবেই-বা কী—সেই নরম বিচিত্র হাতপা-ই-বা কোথায় খোকার—সেই রেশমের মতো চুল—টুলটুলে গাল—কোথায় গেল সে সব? খোকার জীবনের কে এমন ভয়াবহ মুণ্ডচ্ছেদ করল? প্রভাতের কোনো অনুমতির জন্যও অপেক্ষা করল না?

মানুষের জীবনের গতি বড় তীব্র : কমলার মুখও হয়তো এতদিনে থুবড়ে পড়েছে—

মা-ও না জানি কতখানি বুড়ো হয়ে গেছেন—

সমস্ত রাত মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে একটার পর আর একটা কথা ভাবতে লাগল প্রভাত। একটা কথাও মানুষকে ভরসা দেয় না—কেমন করে তোলে—

পরদিন সকালবেলা কিছুতেই আর উঠতে পারা যায় না যেন—

সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে—গায়ে কেমন অসহ্য ব্যথা—

কিন্তু তবুও ইস্কুলের বেলা হতে না হতেই উঠে বসল প্রভাত; কিছু না খেয়েই বাসে করে ইস্কুলে চলে গেল। প্রথম দুই ঘণ্টা ককাতে-ককাতে পড়িয়ে নিজেকে কেমন অমানুষ বলে বোধ হতে লাগল প্রভাতের—নিজের উপর এ কী অত্যাচার তার।

মানুষ কি ইস্কুল মাস্টারি করবার জন্যই বেঁচে থাকে না কি?

ঘণ্টা বাজাতেই হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে ছুটি চাইল সে।

হেডমাস্টার—'আপনার টেম্পোরারি কাজ, দুঘণ্টা পড়িয়েই ছুটি? কেন, কী হল আপনার?'

—'বড্ড অসুখ করেছে।'

—'অসুখ তো করবেই—আমাদের লোক বড্ড কম—এখনই তো অসুখের সময়—অসুখ না করলে চলে। এত কাজ করে কে?'

প্রভাত দাঁড়াতে পারছিল না।

হেডমাস্টার—'কী আর করা; যান—অসুখ যখন করেছে—কাল দু-এক ঘণ্টা বেশি পড়িয়ে দেবেন বরং।'

মেসে ফিরে এসে প্রভাত ঠিক করল আজই সে দেশে চলে যাবে। বাক্স বিছানা গোছাতে গোছাতে প্রভাত ভাবল মানুষ যদি এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা হলে জীবন তাকে মনে করে অপদার্থ শব, সময় আসে শকুনের মতো উড়ে, তাই আসে—তাই আসে। এ পাঁচ বছর ধরে কী করে এত অসতর্ক—অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে—জীবনের হাতে এত প্রতারণা সহ্য করল। এত অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার কী করে যে ঘটে।

কিন্তু এই সৃষ্টি যার কাছে আঁতুড় ঘরের জননীর মতো মমতা প্রত্যাশা করা অসম্ভব, যা অন্ধ অবসাদে চলে—অন্ধকারে ভাঙা সর্পিল সেতুর মতো—নিঃসহায়তার নির্মমতায় করে অপপ্রয়োগ, নিরবচ্ছিন্ন অপচেষ্টায় শানিয়ে ওঠে।

বিছানা বাঁধতে-বাঁধতে প্রভাত ভাবল—মানুষ ক-দিনই বা বাঁচে, বাঁচে না বেশিদিন। টাকাকড়ি সফলতাও খুব কম মানুষের জীবনেই হয়। কিন্তু কয়েকটা ভালোবাসার জিনিশ আমাদের জন্য সে রেখে দেয়। সে সবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে লাভ কী? অন্ধকার সেই অসংস্থিতি, খেয়াল যার এত অন্ধ, সে কখন কী কঠিনতা করে বসে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

আরো একটা দড়ির দরকার; প্রভাত খাটের নীচের থেকে একটা মস্তবড় লম্বা দড়ি বের করে বিছানাটা বাঁধতে-বাঁধতে ভাবল—এ পাঁচ বছর জীবনটাকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, সংসারে যারা সফল হবে তাদের জাত আলাদা : ভালোবাসার চেয়ে সফলতাকেই তারা ভালোবাসে বেশি—আমার ঠিক উল্টো, প্রেম, দাক্ষিণ্য, মমতার, ঘরানা গন্ধেই তৃপ্তি। যে যা ভালোবাসে সেই জিনিশেরই আরাধনা করা উচিত তার। নিজের জীবনটাকে ভুল বুঝে মিছিমিছি অন্ধ হয়ে ঘুরে কী লাভ।

দেশের বাড়িতে একটা মনিহারি দোকান খুলে বসবে সে—কিংবা দেশের ইস্কুলে একটা মাস্টারির চেষ্টা দেখবে—

বিছানা-বাক্স বাঁধা হয়ে যাবার পর শরীরটা ভালো লাগতে লাগল; জ্বরটা যেন চলে গেছে।

প্রভাতের চিন্তার গতি আবার অন্য পথ ধরল। চেয়ারে সে সুস্থির হয়ে চুপ করে বসল; একটা চুরট ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল—ভাবল; হুজুকে কোনো কাজ করা উচিত নয়। জীবন হচ্ছে লড়াইবাজ বাজপাখির বিশাল আকাশ এবং সংগ্রাম উচ্ছল, আশানীলাভ বিরাট পরিবিস্তৃত আকাশের মতো এই জীবন। যারা দুর্বল তারা পিছিয়ে পড়ে, মায়া মমতার দোহাই পাড়ে—জীবনের ভিতর বিধাতার খেলা দেখে শুধু—অনিয়ম দেখে—উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে—তা নয়—তা নয়।

চুরুটটা জ্বালিয়ে এক টান দিয়ে প্রভাতের মনে হল—জীবনকে হতবিধাতার আঁস্তাকুড় মনে করে চুপ করে থাকে যারা তাদের ক্লান্তি, গ্লানি, বেদনা, সমস্তই নিজেদের তৈরি জিনিশ; তারা উপলব্ধি করতে ভয় পায়—জীবন্মৃত হয়ে থাকতে ভালোবাসে; অলসতাকে তারা ভাবে প্রেম—ভিক্ষাকে ভাবে দাক্ষিণ্য। মানুষের জীবনের আবহমান স্রোতের ভিতর যে সুন্দর নিয়ম আছে তাকে উপেক্ষা করে মাছির ডিমের মতো। এই সংসারে কোটি-কোটি জন্মায় তারা কোটি-কোটি গুঁড়িয়ে যায়—

প্রভাত চুরুটে টান দিতেই ভাবল : পাঁচ বছর বসে প্রাণপাত করে—জীবনের সমস্ত অপচয় অপবিন্যাসের থেকে দূরে থেকে জীবনটাকে যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছি আমি এ খুব ভরসার পথ। নীলমণিবাবুর ইস্কুলে চার মাস ধরে বেশ একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করেছি—কখনো কর্তব্য অবহেলা করি নি—বেশ সুনাম হয়েছে আমার—ছেলেরা খুশি—মাস্টাররা খুশি—সেক্রেটারি খুশি—হেডমাস্টারও বিমুখ নন—

চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে প্রভাত স্বীকার করে নিল—কাজ পাকা হয়ে যাবে তার। বিছানা খুলতে-খুলতে ভাবল—পাকা হয়ে গেলে চল্লিশ টাকা মাইনে হবে—চল্লিশ টাকার একটা পাকা কাজ নিয়ে কলকাতায় বসে সে অন্য চেষ্টা করবে—হয়তো আর-একটা এম-এ দেবে—হয়তো থিসিস লিখবে—হয়তো বি-টি পড়বে—

প্রভাত বিছানাটা পুরোপুরি খুলে পেতে নিল—বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত দুপুর সমস্ত বিকাল সে ঢের উজ্জ্বলতায় ও জীবনের সুবিন্যাসের স্বপ্ন দেখল।

সন্ধ্যার মুখোমুখিই জ্বর এল আবার—

সংসারের বাজপাখি নয়, চড়ুই পাখি—শালিখ পাখি এই উদাসী, করুণ, সংসারের কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত যুবক ক্রমে-ক্রমে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়তে লাগল।

খুব খিদে পেল। খোকার জন্য প্রায় সাত মাস আগে সেই যে কয়েকটা খুচরো বিস্কুট কিনেছিল বাক্সর থেকে সেগুলো বের করে নিল প্রভাত; গুনে দেখল পনেরো

খানা; এখন মিইয়ে তুলোর মতো হয়ে গেছে; খেতে কেমন খড়িমাটির মতো লাগে—কোনো স্বাদ নেই কিন্তু তবুও কয়েকখানা খেল সে—বাকিগুলো বিছানার একপাশে ছড়িয়ে রইল। লজেনচুষগুলো গলতে-গলতে শেষে এক সময় চট বেঁধে শক্ত হয়ে রয়েছে—দু-একটা খুঁটে মুখে দিয়ে ডান কাতে শুয়ে লজেনচুষের মোড়কটা অনেকক্ষণ হাতের ভিতর রেখে দিল সে—লজেনচুষ বিস্কুট খোকা সেই সাত মাস আগের সেই বিছানা বাক্স বাঁধা, বাড়ি যাবার আয়োজন, দেশের বাড়ি, সেই কেতু যে দিল ফাঁকি, সেই খোকা যার শিশুত্ব গেল নষ্ট হয়ে, সেই মা যার নিজের হাতে লেখা চিঠি আর আসে না, তিন মাস ধরে নিয়েছেন বিছানা, বাবার চিতার উপর বিষাক্ত সাপের মতো কেলেকাঁটা খেলছে যে—একটা ডগা ছিঁড়ে পরিষ্কার করবার পর্যন্ত কোনো লোক নেই, সেই অশ্বত্থ গাছটায় পর পর দুজন লোক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে বলে সেই গাছটাকেই নাকি কেটে ফেলেছে—অপরাধ হল গাছের? এমন সবুজ ফলন্ত গাছকে কেউ কাটে? এবার গিয়ে ভালো দেখে আবার একটা অশ্বত্থের চারা লাগাতে হবে কিন্তু কত দিনে বাড়বে বিধাতা জানেন—বড় আস্তে বাড়ে। কমলার সামনের মাড়ির পাঁচ-ছটা দাঁত পড়ে গেছে। বাঃ, কেমন দেখায় তাকে। ছাই দিয়ে দাঁত মাজে। কতদিন প্রভাত তাকে আমের কচি ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে বলেছে।—বাস্তবিক, কেতু আর নেই? মা বিছানার থেকে নামতে পারেন না আর?

নিরঞ্জন ধোপার খবর কেউই লেখে না—মরল না কি? কমলা ফোকলা দাঁতে দিন-রাত কথা বলছে, খোকাকে শাসাচ্ছে, হয়তো—হাসছে—কে জানে—কাঁদছেও হয়তো। এ কী রকম যেন হয়ে গেল। জীবন যেন তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে দিতে চায় নিজেকে। প্রভাতের বুকের ভিতর কেমন যেন শূন্য বোধ হয়, বড্ড কষ্ট লাগে কমলার জন্য। কেতুর সঙ্গে মাঠে জঙ্গলে উঠানে কোথাও কোনোদিন আর দেখা হবে না?

এই সব অনেক কথা ভাবতে-ভাবতে শরীরটা কেমন অবশ হয়ে আসে। লজেনচুষের মোড়কটা হাতের থেকে খসে পড়ে যায়—লাল-নীল লজেনচুষগুলো বিছানায় গড়াগড়ি খেতে থাকে।

সারারাত ছট-ফট করে সকালবেলা যখন সে মারা গেল তখন তার অসুখের খবরও কেউ জানে না—

নিজের মৃত্যু অব্দি প্রভাত নিজের সমস্ত কাজ নিজেই সাঙ্গ করল। কিন্তু এখন থেকে সে অন্যের বোঝা।

দাহের কী হবে? মেসের সকলেই প্রায় অফিসে চাকরি করে; কেউ তেল মেখেছে—কেউ স্নান করে ফেলেছে—কারুর বা খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে।

অফিসের দিকেই সকলের মন, এ অসময়ে নিমতলায় যাওয়া চলে না—

রামপদর অবিশ্যি অফিস নাই—সে লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্ট—কিন্তু আজ একটা খুব বড় এনগেজমেন্ট আছে তার—ভারী কেস—প্রায় পনেরো হাজার টাকার পলিসি—না খেয়েই সে বেরিয়ে পড়ল—

শ্রীপতিও বেকার—কিন্তু মাথা নেড়ে সে বললে—শ্মশানে যাওয়া এখন সম্ভব হবে না তার—কর্পোরেশনের বস্তি ইনস্পেক্টরের একটা কাজ খালি আছে—আজ সকাল বেলাই কয়েকজন কাউন্সিলারের সঙ্গে দেখা করবার তার কথা—

হরিদাসবাবু একটু বড় ধরনের মানুষ—দু-এক বছর হল স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই একটি ছোট ছেলে ও মেয়ে নিয়ে মেসের একটা বড় ঘরে একাই থাকেন

তিনি—পেনশন পান—শ্মশানে যেতে তাঁর আপত্তি নেই—কিন্তু কেউই যখন যাচ্ছে না তখন একা গিয়ে আর কি হবে?

ম্যানেজার—আমিই বা মেস ছেড়ে যাই কী করে?

অফিসের চাকুরেরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল আজ। বিষ্ণুপদ থাকলেও থাকতে পারত—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই যখন চলে গেল তখন কী আর করে সে—বেরিয়ে পানের দোকানে এক পয়সার কেনাকাটা করে।

রাতে দাহ হবে ঠিক হল।

প্রভাতের কামরার দরজায় ম্যানেজার একটা তালা আটকে চলে গেল।

সমস্ত দুপুর ঠাকুর-চাকরেরা এক-একবার এসে মড়া দেখে যায়—বারান্দায় থুথু ফেলে—ম্যানেজার এক-একবার তেতলার থেকে দোতলায় নামতে-নামতে, দোতলার থেকে তেতলায় উঠতে-উঠতে মড়ার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে—

কলতলায় চাকরবাকরদের জটলা হয়—থালা-বাটি-গেলাশ ঝন-ঝন করে আছাড় খেয়ে পড়ে—

ক্রমে দুপুর আরো নির্জন হয়ে ওঠে। সমস্ত মেস নিস্তব্ধ; রান্নাঘরে চাকরবাকরদের নাকডাকার শব্দ, বারান্দায় রেলিঙে কতকগুলো চড়াইয়ের নীরব নির্বিবাদ জীবনোপভোগ—

সমস্ত মেসের ভিতর জনপ্রাণী একটিও নেই—কেবল হরিদাসবাবুর ছোট ছেলে ও ছোট মেয়েটি এক-একবার কৌতূহলে আতিশয্যে প্রভাতের ঘরের দিকে টিপিটিপি খানিকটা এগিয়ে যায়—পর মুহূর্তেই 'ভূত-ভূত' বলে চিৎকার করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসে; আবার এগিয়ে যায়, আবার পালিয়ে আসে—

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমস্ত দুপুর—তাদের এই চিত্তাকর্ষক খেলা চলে।

প্রভাতের রুদ্ধঘরে মাছির ভনভনানি, অসহ্য গুমোট ও মশা এক-এক সময় মৃতের পক্ষেও যেন অসহ্য হয়ে ওঠে—

পৃথিবীর বাজ পাখির নয়—চড়ুই পাখি, শালিখ পাখি, এই উদাসী, করুণ, সংসারের কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত বদ্ধনাত্মা যুবক কোনোদিন তার প্রমত্ততম কল্পনায় মনে করে নি যে এই মেসে সে মরবে—তার মৃত্যুর পর মেসের একটা দিন এই রকম কেটে যাবে—এই মেসের কয়েকটি বাবু সিগারেট আর পানের ডিবে নিয়ে রাতে নিমতলায় তাকে পোড়াতে যাবে—

গল্প

পা লি য়ে যে তে

মাদ্রাজ থেকে প্রায় তিন-চার বছর পর কলকাতায় ফিরলাম। ব্যবসার প্রথম বছরে হাজার পনেরো টাকা লাভ হয়েছিল; পরের বছরে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা নষ্ট হয়ে গেল। তারপর থেকে ক্রমাগত লোকসান; দেনা শোধ দিতে দিতে দেখা গেল কলকাতায় যাবার টিকিট কিনবার পয়সা পর্যন্ত হাতে থাকে না। কাজেই নরসিং চেট্টির কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে কলকাতায় এলাম। আমার ব্যবসার যখন সুদিন ছিল তখন চেট্টি রোজই আমার ফ্ল্যাটে এসে ডিনার খেত, দামি-দামি জাভা চুরুটগুলো পকেটে ভরে নিয়ে যাওয়া ছিল তার অভ্যাস। এই সবের জন্য কোনোদিন বিল দেই নি আমি তাকে, দিলে কোনো দেড় হাজার দু-হাজারে না দাঁড়াত? অবিশ্যি চেট্টি অন্য দিক দিয়ে আমাকে ঢের সাহায্য করেছিল; ব্যবসার সুপরামর্শ তার কাছ থেকে ঢের পেয়েছিলাম। নিজের শরীর খাটিয়ে এক-এক সময় সে ঢের উপকার করেছে আমার। তামিল, তেলেগু লিখতে খুব সাহায্য করেছে আমাকে; মাদ্রাজে অবিশ্যি ইংরেজিতেই অনেক দূর চলে।

চেট্টিকে বলে এসেছি, ছ-সাত মাসের মধ্যেই মাদ্রাজ ফিরব আবার।

চেট্টি বলেছে,—'না ফিরলেও বাকি এই পঞ্চাশ টাকাকে ধার বলে মনে কোরো না। দেখ, কলকাতার ব্যবসা করতে পার কি না। কিংবা চাকরি পেলে ঢের ভালো হয়।' বাস্তবিক, মাদ্রাজি বড্ড চালাক জাত। কী হবে না-হবে ধূর্ত নারদের মতো তা ধরে ফেলে।

আমার যে আর মাদ্রাজ যাওয়া হবে না, ব্যবসাও করা হবে না হয়তো, পঞ্চাশটা টাকা তার কিছুতেই শোধ দিতে পারব না যে, চাকরিই যে আমার খোঁজা উচিত, আমার চেয়েও কে তা ঢের ভালো করে জানে?

কলকাতায় এসে হাতে কুড়ি-পঁচিশ টাকা রইল শুধু; মাদ্রাজে এ তিন বছর বেশ আদব-কায়দায় থাকার অভ্যাস করে ফেলেছিলাম; সমস্ত দিন ফিটফাট সুট পরে

থাকতাম। আট-দশ রকমের সুটও ছিল আমার। দিনের মধ্যেই তিন-চারবার করে বদলাতাম। সারাদিন হ্যাভেনা চুরুট, কফি ও চা না হলে চলত না। দিনের মধ্যে দশ-বারোটা মুরগির ডিম ভাঙতে হত আমার জন্য, পোস্ত অমলেট হবে। বয়েল-কারির জন্য রোজ চারটে মুরগি মারবার ব্যবস্থা ছিল; টিনের মাংস খেতাম ঢের; বিলেতি মাছও বাদ দেই নি, টোস্টে খুব পুরু মাখনের ওপর জ্যামের পালিশ না থাকলে চলত না; সারা দিন টিনের ও তাজাফল নানা রকম খেতাম। রোজ দুপুরে ঘণ্টা দুই টেনিস খেলতাম বলে হজমের গোলমাল হয় নি কোনোদিন। শরীরটা বেশ। কলকাতায় এসে এ জীবনের কোনো কিনারাই পাওয়া যায় না আর; সঙ্গে আমার নামী-দামি কুমিরের চামড়ার সুটকেশ প্রায় আট-দশটি। হ্যাট-কোট, পাতলুন ও জীবনের শৌখিন আসবাবপত্রে ভরা গোটা দুই চকোলেট রঙের হোল্ড-অল, তিনটে গ্লাডস্টোন ব্যাগ, দুটো মস্তবড় ট্যুরিস্ট ট্রাঙ্ক, ঝুড়ি বাস্কেট, ক্যাশবাক্স, লটবহর ইত্যাদি ঢের কিন্তু হাতে যা টাকা আছে তাতে কলকাতার একটা ফার্স্টক্লাস হোটেলে উঠলে দিন-ছয়ের বেশি থাকা যায় না। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে এক-আধ মিনিট ভাবি; হাতের ছড়িটা এক-আধবার নাচিয়ে নেই; পকেটের থেকে চুরুট বের করে জ্বালানো যায়, চুরুটে এক টান দিয়ে দেখি অসংখ্য হোটেলের চর আমাকে ছেঁকে ধরেছে। হাত নেড়ে ভিড়টাকে বিদায় দিয়ে একটা ট্যাক্সি করা যায়; একটা মাঝারি গোছের বোর্ডিঙে গিয়ে উঠি, ম্যানেজার দিনে পাঁচ টাকা হেঁকে বসেন। আড়াই টাকায় ঠিক হয়। মস্তবড় একটা অন্ধকার ঘর আমাকে দেওয়া হয়। আলো-বাতাস খেলে এ-রকম ছোট একটা কামরা ঘর পছন্দ করে বদলে নেই; নীচের তলায় গোয়ালের মতো একটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে একটা চৌবাচ্চা, এরই নাম বাথরুম; জলের ভিতর ইঁদুর মরে আছে না কি আরশোলা পচছে, বোঝা যায় না। কেমন একটা চামসে গন্ধে স্নান করতে হয়।

খাবারের সঙ্গে পুঁইশাকের চচ্চড়ি অনেক আসে, মাছের নাড়িভুঁড়ি।

আঁশটে তরকারি, কাঁচকলা ভাজা, খেশারির ডাল, ট্যাংরা মাছের ঝোল, ভাতের থালা ফেলে চুরুটটা জ্বালাই আবার। বছর দুই আগে দেশের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম, তখন আমার ব্যবসায়ের ঢের পড়তা। বাড়ি গিয়ে মাস দুই ছিলাম। পুরোনো জমির পাশাপাশি নতুন জমি খানিকটা কিনেছিলাম। খড়ের ঘর। আটচালা দুটো ভেঙে ছোট-খাটো একটা টালির বাংলো তৈরি করার সঙ্কল্প ঠিক করে এসেছিলাম।

কিন্তু হল না কিছু আর।

বছর দেড়েক আগেও একবার দেশে গিয়েছিলাম; তখন আমার ব্যবসায়ে ঢের লোকসান চলছে; দিন পনেরো ছিলাম তখন।

এবারও দেশেই যেতে হবে; মাঝখানে একবার খবর পেয়েছিলাম বাবার ভয়ঙ্কর হার্টের অসুখ চলছে—মরতে-মরতে বেঁচে রয়েছেন। বড্ড আশঙ্কার কারণ; এখন খানিকটা ভালো বোধ করি। সঠিক খবর পাওয়া যায় না। নীলিমা? মা কেমন আছেন? খুকিই বা কত বড় হল? সারা দিন-রাত কী কচ্ছে? বিশেষ কিছু লেখে না বড় একটা কেউ। ব্যবসায়ের প্রথম দুবছর বাবাকে তিনশো টাকা করে মাসে পাঠাতাম। গত বছর এক পয়সাও পাঠাতে পারি নি। অবাক হয়ে ভাবি, দেশেব বাড়ির ব্যাপার কদ্দূর?

শুনেছি, বাবাকে আবার ইস্কুলে যেতে হচ্ছে; অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার, যদিও

প্রাইভেট ইস্কুলের; কিন্তু তবুও ইস্কুলের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়; বাবাকে মাসে আশি টাকা করে দেয়।

সত্তর বছরের বুড়ো মানুষ।

ইস্কুল আমাদের বাসার থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। গাড়ি চড়ে যান? চড়েন কী বাবা? তা যান না; যাবার উপায়ই-বা কোথায়? আশি টাকার।

দেশের বাড়িতে পেটও অনেক; মানুষের নানারকম তাগিদ সেইখানে।

বেতের আরাম কেদারায় বসে আছি। হ্যাভেনা চুরুটের নীল ধোঁয়া জানালা দিয়ে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যায়। রেলিঙের উপর রোদের ভিতর গোটাকয়েক চড়াই।

সুটকেশগুলো বিক্রি করে ফেললেও হবে সব। নিজের কাজের জন্য একটা রেখে দেব শুধু; গ্লাডস্টোন ব্যাগগুলো হোল্ড-অল, ট্রাঙ্ক, গোটা দশেক সুট বিক্রি করে কত পয়সা পাওয়া যাবে? মনে-মনে একটা হিশেব করে নিই। এসব জিনিশ যারা কেনে তাদের সঙ্গে বড্ড দরদস্তুরের দরকার; পুরস্কার খুব কম—এক-একবার মনে হয়, বিক্রি করে কী লাভ? জিনিশগুলোর ওপর মায়া ধরে যায়।

কিন্তু দুপুরবেলাই বিক্রি করে বসলাম। বাড়ির জন্য ধুতি, শাড়ি, ছাতা, ফ্রক, ব্লাউজ কিনে যখন ট্রেনে উঠলাম, হাতে তখন পাঁচ টাকা সোয়া ছ-আনা পয়সা বাকি শুধু।

হুইলারের স্টলের নভেলটা ধীরে-ধীরে খুলে পড়তে শুরু করি; কিন্তু আধ ঘণ্টা ধরে প্রথম প্যারাগ্রাফটাই পড়লাম শুধু—সাত লাইনের একটা প্যারা। বইটা বন্ধ করে রাখতে হয়; মাদ্রাজ যে খুব ভালো লেগেছিল তা নয়; কিন্তু কলকাতায় এসে কেমন একটা অবসাদ, চুরুটে একটা টান দেই। এখানেই ব্যবসা শুরু করব? না চাকরি খুঁজব? যা হয় করা যাবে একটা কিছু। মনের ভিতর চিন্তা, স্বপ্ন, কোনো রং নেই এখন আর। কোনো তাড়া নেই। একটা নভেল অব্দি পড়তে ইচ্ছা করে না, দেশের বাড়িতে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। সেই মস্তবড় সবুজ সতেজ লেবুগাছটা সেখানে আমার জানালার পাশে ডালপালা ছড়িয়ে নিবিড় হয়ে রয়েছে, পুবদিকের আটচালার সেই ছোট্ট কোণটুকুর ভিতর খাটের উপর মাদুর ফেলে শুরু থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তারপর ফাল্গুনের আমের বোলের গন্ধের ভিতর, দুপুরের ঝিঁঝির ডাকে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। নীলিমা হয়তো খাটের পাশে এসে বসবে—বেশ ভালো কথা; স্নান হয়ে গেছে, স্নিগ্ধ নারকেল-তেল মাখা ঠাণ্ডা চুল; খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে।

হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি স্নিগ্ধ জলের ভিতর চাঁদের আলোর মতো ঝিলমিল করছে।

হয়তো সে একা-একা বসবে না। খুকিকে এনে আমার বালিশের পাশে বসিয়ে দেবে কিংবা খুকি একা আসবে, সমস্তটা দুপুর আমার খাটে তার কাজ। কিংবা মা আসবেন। খুনসুড়ি, খেলা, ঘুম, করুণ নিবেদন, ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না, তৃপ্তি।

সন্ধ্যার পর বাবার সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলা যাবে অনেক রাত অব্দি। বাবা কতকগুলো বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে খুব ভালোবাসেন; আত্মা-অমরতা, ভগবান, ধর্ম, থিয়জফি, হিন্দু মিশন, এডুকেশন ও নানারকম সাহিত্য, উপন্যাস কবিতা।

একখানা নতুন ইংরেজি নভেল যদি বাবাকে দেওয়া যায় ভারী প্রসন্ন হন তিনি; অমনি চশমা লাগিয়ে সন্ধ্যার আবছায়ার ভিতর বিনা লণ্ঠনেই পড়তে শুরু করে দেন;

যতক্ষণে আমি পাতা দশেক পড়ে উঠতে পারি ততক্ষণে বাবার পঞ্চাশ পাতা হয়ে যায়।

মাদ্রাজে রেঙ্গুনে কলকাতায় যখনই যেখানে রয়েছি অনবরত লোকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি হয়, কথাবার্তা ফুরুতে চায় না, কাজ জমে ওঠে, কাজ নিকাশ হয়। সমস্ত সকাল, সমস্ত দুপুর, সারা দিনরাত কাজকর্মের ভিতর নিজেকে রক্তমাংসহীন পুতুল বলে মনে হয় শুধু।

তারপর দেশের বাড়িতে এক-একবার চলে যাই। মা কাছে এসে বসেন, চারদিককার খবর জানাতে থাকেন, যত বলি তার চেয়ে ঢের বেশি গল্প শুনি। নীলিমা আসে, খুকি আসে, আমার বোন অমিয়া এসে হাজির হয়, বাবার সঙ্গে অনেক রাত অবধি কথাবার্তা চলে, মনে হয়, আবার যেন শিশুর মতো কোনো এক আদিকালে এসেছি। চারদিকে নরম অন্ধকার, খাপরার আগুনের স্নিগ্ধ আঁচ, মুখে মধু, প্রাণের ভিতর আশা-সাহস, জীবনের সাধ-স্বপ্ন আগ্রহ কলরব।

মানুষের জীবনের আগ্রহ ও আস্বাদ অনেক দিন পরে ঐকান্তিক হয়ে জমে ওঠে আবার।

এক-একবার দুপুরবেলা জানালার কাছে লেবু ফুলের গন্ধমাখা বাতাসের ভিতর বসে দিনান্তের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এই মাঠ-প্রান্তর, দুপুরবেলার তারুণ্য-দীপ্ত রোদের স্ফূর্তি ও নির্জন গন্ধ, চারদিককার শুকনো বাদামি খড়, শব্দ, নীল আকাশের নীচে শাদা সজনে ফুলের রাশি, বাসন্তী, কমলা, হলদে ও পাটকিলে রঙের প্রজাপতিগুলো, ময়না কাঁটার ঝোপে অক্লান্ত ফড়িং, তেলাকুচোর জঙ্গলে লাল মাকাল ফলের মোহে টিয়ার ডানার ছড়াছড়ি, খড়ের চালের উপরে শূন্য আকাশে আচমকা মাছরাঙার চিৎকার। মাঠের ভিতর গোসাপ দেখে শালিকগুলোর উত্তেজিত কলরব, সারা দুপুর দুটো বেজির অক্লান্ত খুনসুড়ি, কামিনী গাছের ভিতর সারা দিন টুনটুনিদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি, মাঠের এক কিনারে পুরোনো ইটের পাঁজা ঘিরে শাদা লাল দ্রোণ ফুল, মনে হয় প্রাণের তৃপ্তির পক্ষে এইগুলোই যথেষ্ট। মানুষের কোনো দরকার নেই আর। নীলিমা চলে যেতে পারে, মাকে দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত ঘর-দোর যদি প্রাণীহীন হয়ে পড়ে থাকে তা হলেও দেশের বাড়ির এই মাঠ-প্রান্তরের আস্বাদ, জোনাকি-জ্বলা সন্ধ্যা, ভুতুম পেঁচার ডাকে-ভরা রহস্যময় রাত, পথপ্রান্ত, মানব-আত্মাকে অনেক দিন পর্যন্ত নিবিষ্ট করে রাখতে পারে।

কিন্তু তবুও দেশে যাচ্ছি এবার মানুষ কটির জন্যই। বাবার জন্য অনেকগুলো নতুন নভেল নিয়েছি। হুইলারের নভেলই প্রায়—কিন্তু নামজাদা ইংরেজি উপন্যাসও প্রায় আট-দশ খানা আছে।

এবার আমার হাতে ঢের প্রমাণ আছে যে মৃত্যুর পর মানুষের কপালে শ্মশানের ছাই, হাড় ও অন্ধকার ছাড়া আর-কিছু নেই; শুনে বাবা হয়তো খুব কঠিন ভাবে ঠেকে বসবেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য; কিন্তু তার পরেই আমায় অন্তরীক্ষে ক্ষমা করে যুক্তির অবতারণা করবেন; ক্রমে-ক্রমে বলবেন যুক্তি-তর্কে কিছু হয় না, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চাই। তবুও অনেক দূর পর্যন্ত তর্ক করেন তিনি, অনেক জানেন, ঢের দৃষ্টান্ত আছে যাতে মাঝে-মাঝে তার মনের পরিষ্কার উজ্জ্বলতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়, অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা জমে বেশ।

এই দেড় বছরের মধ্যে এ-পাড়ার ও-পাড়ার খবর ঢের জমে গেছে মা-র কাছে;

অনেক গল্প শোনা যাবে; গল্পের বিষয়ের চেয়ে শোনবার আগ্রহটুকুর দামই বেশি, খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা আমার ঘরের দরজা খোলা থাকলে আমার খাটের পাশে এসে বসেন। দরজা কেনই-বা খোলা থাকবে না আমার?

খুকি নাকি অনেক কথা বলতে শিখেছে; টুক-টুক করে হাঁটতে পারে বেশ; মোটা আর হল না; সেই যে সূতিকা ঘরে যে চুল নিয়ে পৃথিবীতে নেমেছে মাথার থেকে এখনও তা কাটা হয় নি নাকি; আমি গিয়ে নাপিত ডেকে কাটিয়ে দিতে বলব। কিংবা নিজেই কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেব ও বলব, কি, তোমরা এত দিন ছাঁটো নি কেন? কে জানে, সূতিকা ঘরের সেই সুন্দর নরম অপার্থিব চুলে আমিও কাঁচি লাগাতে পারব কি না। থাক, লাগাব না। খুকির পেটে না কি ঢের কৃমি জমেছে। শরীরও কৃমির মতোই রোগা।

জ্বালানো যাক চুরুটটা—

তারপর নীলিমা?

গতবার যখন আমি পাড়ায় ব্রিজ খেলতে যেতাম প্রথম দুই-তিন দিন সে কিছুতেই যেতে দেবে না আমাকে। শার্ট ধরে আটকে দিত। সারা দিন ব্রিজ খেলে সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ি ফিরতাম আমার পথের থেকে সরে যেত, ডাকলেও উত্তর দিত না, শেষে গলা জড়িয়ে ধরে বলত, সারাদিন আমাকে একা ফেলে ছেড়ে থাকতে এত ভালো লাগে তোমার?

তাই তো?

ট্রেন এতদিন পরে এবার আমার দেশের দিকেই ছুটছে। না, এবার আর পাড়ায় গিয়ে ব্রিজ খেলতে যাব না দুপুরবেলা; এনু আছে, অমিয়া আছে, আমি আছি, আমার পিসতুতো ভাই, ভগ্নীপতি আছে। এদের ব্রিজ শিখিয়ে দেব। না যদি পারে বিন্তিই খেলা যাবে—

পূর্বজন্মের স্মৃতির মতো বিন্তি খেলার ভিতরে একটা নরম করুণতা রয়েছে যেন—বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে বসে যদি খেলা যায়, সমস্ত ঝাঁ-ঝাঁ খটখটে গরম দুপুরবেলাটা সেই দক্ষিণের ঘরে দিনান্তের নিষ্করুণ আকন্দ ও ভেরেণ্ডার জঙ্গলের বাতাসের মুখোমুখি বসে।

গতবার এই বিন্তি খেলার জন্য কত বায়না ধরেছিল সে; কিন্তু ব্রিজের চাড় ছিল ঢের বেশি আমার। কাজেই বাকি দুজন লোক জোগাড় করে আনতে বলে শার্টটা গায় দিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতাম। এই উপেক্ষা ও প্রতারণার ব্যথা গত দেড় বছর মাদ্রাজে কাজ-অকাজের ভিতর কতবার জেগেছে।

ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ি—ঘোড়ার গাড়ি আমাদের বাড়ির দুয়ারে এসে থামল। থামে; গাড়ির থেকে নামতেই একটা নেড়ি কুকুর আমাকে খেঁকিয়ে আসে।

'অবাক হয়ে ভাবি, কুকুরটা কোত্থেকে এল?'

পথের এক পাশ থেকে একটা ঝামা তুলতেই কুকুরটা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়—

মাদার গাছের নীচে গিয়ে আকাশ মাথায় করে কাঁদতে থাকে।

আহা। এত করুণ তা।

কেমন অস্বস্তি লাগে। বাড়ির দুয়ারে একটা গাড়ি থেমেছে বলেও ভিতর থেকে

কোনো লোক আসে না।

গাড়োয়ানের জিম্মায় মালপত্র রেখে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকি, বাবাকে দেখা যায়। দেখলাম একটা টুলের ওপর উবু হয়ে বসে ছেলেদের খাতা দেখছেন। প্রণাম করি, মা এসে হাজির হন। মাকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম—'কেমন? ভালো আছ মা?'

—'তুমি আসছ তা তো শুনি নি।'

—'এই তো দেখো, এলাম।'

—'তুমি তো আসবার আগে বরাবর টেলি করো।'

—'এবার আর—'

—'কেন?'

—'তাক লাগিয়ে দেব বলে।'

বাবা বলেন—'ব্যবসার খবর কী রকম?'

কোনো জবাব দিলাম না।

মা—'শরীর ভালো আছে তো?'

—'হ্যাঁ, বেশ আছে মা।'

—'শরীর ভালো থাকলে ভালো, ঘরের ছেলে ঘরে এসেছিস। পরে বাবা ব্যবসা করতে যাস নি—'

—'কেন?'

—'দূর! সেই মাদ্রাজে ব্যবসা করে মানুষে?'

—'মাদ্রাজের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

—'না, মাদ্রাজে-ফাদ্রাজে আর না। যদি করো কলকাতায়। তোর জিনিশপত্র কোথায়?'

—'তোমার জন্য দুটো শাড়ি এনেছি।'

—'শাড়ি আবার আমার জন্য! নীলাম্বরী নয় তো?' মা একটু টিটকারি কেটে হাসলেন।

—'এক জোড়া চটি জুতোও এনেছি তোমার জন্য।'

—'কী জুতো?'

—'চটি।'

—'কার জন্য?'

—'তোমার জন্য মা—'

—'ছেলের কাণ্ড দেখো? সাত জন্মে জুতো পরলাম না।'

—'মাদ্রাজে স্ত্রীলোকেরা কী করে জান মা—?'

—'রেখে দে তোর মাদ্রাজের কথা'—চোখ কপালে তুলে—'হিলওয়ালা জুতো এনে বসবি কবে আবার একদিন আমার জন্য। তা জুতো তোর বউকে পরাস। এখন বরং—'

—'তুমি খালি পায়ে হাঁটবে, তা হবে না; কিংবা কোনোদিন যদি বৃষ্টি পড়ে—'

মা বাধা দিয়ে—'হয়েছে রে, আমি তোমার মেয়ে ইস্কুলের গুরুমা নই যে চটি পায় দিয়ে রাস্তা দিয়ে ফটর-ফটর করে বেড়াব।'

গাড়ি থেকে জিনিশপত্রগুলো ফটিক নিয়ে এল। মা বললেন,—'চা খাবি?'

—'হ্যাঁ, ভালো চায়ের পাতাও নিয়ে এসেছি।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন,—'ক পাউন্ড?'

—'এই দশ পাউন্ড আন্দাজ।'

বাবা একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে—'বাঁচা গেল।'

—'তোমার জন্য কতকগুলো নভেল এনেছি বাবা।'

—'নভেল আমার জন্য। কেন; আমি কি নভেলখোর।'

বাবা খাতার গাদি ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—'কই? কী নভেল? দেখি তো।'

—'বাংলা অবিশ্যি নয়।'

—'তারক গাঙ্গুলির স্বর্ণলতা পড়েছিলাম, আছে এক রকম—জোলো দুধ আর চিনি; যাক্, তার পর থেকে বাংলা নভেল পড়া ছেড়ে দিয়েছি আমি—'

—'তোমার বয়সের সকলেই তাই করেছে—বয়সও তো কম নয়, এই বুঝি একাত্তর।'

—'না, বয়সের জন্য নয়, এই দেশী নভেলগুলো কোনো কালেই ভালো লাগে না আমার, বয়সের জন্য কি আর? তিরশ-চল্লিশ বছর বয়সেও ভালো লাগত না,' বাবা মাথা নেড়ে—'অখাদ্য। চিরকাল।'

বেশ-বেশ।

ইংরেজি নভেল বের করে বললাম—'কিন্তু এই হুইলারে পুলের বইগুলো আমি কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারলাম না; একে তো খিটমিটে টাইপ, চিন্তার অসারতাও এমন মর্মান্তিক। এই টাইপের মতোন।'

—'মূল্যবান চিন্তার জন্য কেউ নভেল পড়ে?'

—'কেন পড়বে না?'

—'চিন্তার জগৎ আলাদা। সে-জন্য থিওসোফি আছে, উপনিষদ আছে, বারো খানা নভেলই বাবা ডান হাতে তুলে নিলেন, বললেন—'একমাসের খোরাক।'

—'ইচ্ছে করলে পনেরো দিনেও শেষ করতে পার—'

—'না ইস্কুলের কাজ এখন বড্ড বেশি—'

—'তা ছাড়া চোখে আগের মতো জোর নেই তোমার; গতবার দেখলাম নাকের কাছে নিয়ে বই পড়ছ?'

—'ক্যাটারেক্ট। চোখে কেমন ছানি পড়েছে।'

—'তা হলে এই বইগুলো এনে অন্যায় হয়ে গেছে দেখছি; সারাদিন ইস্কুলের কাজকর্ম, খাতা দেখা, বই পড়ানো, বোর্ডে লেখা, তারপর বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার সময় অক্ষরগুলো, খানিকটা অন্ধকার হয়ে না গেলে তোমার সন্তানের কথাও মনে পড়ে না। এতে তো গড়ুরের চোখও নষ্ট হয়।'

—'অপারেশন করলে চোখ আজই অন্ধ হয়ে যায়; যদ্দিন চোখে দেখি অপারেশনের কী দরকার। ধীরে-ধীরে অন্ধ হয়েই যাব—কিন্তু তার আগে চলে যেতে হবে। যতটা দিন বেঁচে আছি সময় কাটাতে হবে তো।'

মা—'কী যে বলো?'

একটু চুপ থেকে—'কেন, সময় তোমার আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কাটতে চায় না বুঝি?'

বাবা কোনো উত্তর দিলেন না।

মা বললেন—'না হয় ভগবানের নাম করে সময় কাটালেই পার। কতকগুলো বই পড়ে কী লাভ!'

বাবা একে-একে বইগুলো দেখছিলেন—কোনো জবাব দিলেন না।

মা—'না এই সব পড়বার সময় তোমার এখন?'

মা চলে গেলেন।

আমি—'আচ্ছা তুমি যে দিনের অনেকটা সময় ভগবানের নামে কাটাও, মা কি তা জানেন না?'

বইগুলো নাড়তে-নাড়তে নীরব হয়ে রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না;

বাবা একটা বই খুলে নিস্তব্ধ হয়ে ছিলেন—নীরবই হয়ে রইলেন।

বুঝলাম, এ প্রশ্ন বড় অস্বস্তির হয়েছে।

বললাম, 'বইগুলো কেমন মনে হয় তোমার?'

—'এইসব বইয়ের কোনো তারতম্য নেই তো।'

—'স্টলের থেকে একখানা উঠিয়ে আনলেই হল।'

—'ভালো লাগে তোমার?'

—'আমার বেশ লাগে—'

—'বইগুলোর একটা বিশেষত্ব এই যে এগুলোর বড় একটা নোংরামি থাকে না।'

—'নোংরামি মানে?'

—'মানুষের জীবনের অনেক জায়গায় নোংরা থাকে না?' বলে বাবা নিরুত্তর রইলেন।

বুঝলাম এ বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান না।

একটু চুপ থেকে বললাম—'কিন্তু মানবজীবনের বিশেষ কোনো জ্ঞানও নেই এদের।'

—'সে রকম জ্ঞান তুমি নভেলিস্টদের কাছ থেকে কোথায় পাবে?'

—'কেন তাদের তো থাকে।'

বাবা মাথা নেড়ে—'না, সে জ্ঞান উপনিষদের ঋষিদের ছাড়া আর কারো নেই।' অবাক হয়ে চুপ করলাম; কিন্তু তর্ক করতে গেলাম না আজ আর একটু চুপ থেকে—'কিন্তু উপনিষদের ঋষিরা তো মরে গেছেন কবে; সেই থেকে এ পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে মানবজীবন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই কারো?'

—'তা আছে নিশ্চয়ই।'

—'কাদের?'

—'এই ঋষিদের সাথে যাদের আত্মার মিল আছে।'

—'কারা তারা?'

—'পৃথিবীর সব জায়গায় সব খানেই তারা জন্মায়—' এর চেয়ে বেশি বাড়াতে গেলেন না বাবা।

নভেলের কথাই পাড়লাম আবার । বললাম—'এ-সব লেখকদের চরিত্রজ্ঞানও বিশেষ নেই—'

—'মানবচরিত্রজ্ঞান?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোনো ঔপন্যাসিকের তা নেই।'

—'তবে কাদের আছে?'—

'টলস্টয়ের অবিশ্যি খানিকটা ছিল, কিন্তু তিনি তো নিছক ঔপন্যাসিক নন, মানুষের চরিত্রজ্ঞান যিনি এ চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন তারই শুধু আছে, আমরা পুতুলের চরিত্র জানি শুধু।'

বাবা বইগুলো রেখে দিয়ে—'প্রত্যেক লেখকই তার নিজের মনের পুতুলগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন—বলেন, এই মানুষের মনের ভিতর এই ভাব হয়েছিল, ওই নাড়ি দিয়ে প্রাণের ভিতর ওই রকম-রকম চিন্তার তিক্ততা কিংবা স্বপ্নসাধ জেগেছিল। যদি জিজ্ঞেস করি, কী করে তুমি জানলে? এ তোমার নিজের মনের ভুল নয়? আশ্চর্য। এ পৃথিবীতে কে কার কথা জানে।'

আমার অবিশ্যি মতোভেদ ছিল; কিন্তু প্রতিবাদ করতে গেলাম না।

একটু চুপ থেকে—'এই-ই যদি তুমি ভাব বাবা, তা হলে এই বইগুলো পড়ে কী লাভ—?'

—'বেশ নিরপরাধ ভাবে খানিকটা সময় কাটে।'

—'ভালো শতরঞ্জ খেলে যেমন?'

বাবা মাথা নেড়ে—হ্যাঁ, যে খেলাগুলো শিখলাম না কোনোদিনও; শিখলে মন্দ ছিল না?'

একটু চুপ থেকে, 'সে-সব খেলা শিখলে মোটামুটি এই সব নভেলই বেশি ভালো লাগত। উত্তেজনা আক্রোশ দরকার হয় না, হইচই নেই। ইস্কুলের ছেলেদের মাথামুণ্ডহীন ইংরেজি ঘাঁটার পর সাহেবদের এই সব নির্ভুল, নির্বিবাদ ইংরেজি পড়ে বেশ একটা নিস্তার পাওয়া যায়।'

মা চা নিয়ে এলেন।

বললেন—'মুড়ি খাবি?'

—'না।'

—'রুটি নেই।'

—'থাক,'

—'ভাবলাম দুটো পরটা করে দেই কিন্তু ঘি নেই, ময়দাও গেছে পচে—পোকায় ঘিনঘিন করছে, এখনই তো ভাত খাবে।'

—'হ্যাঁ।'

—'তা চা খেয়ে নাও, মুখ ধোবে না?'

—'মুখ আমি ধুয়ে এসেছি।'

—'কোত্থেকে?'

—'গাড়িতেই পাঁচটার সময় আমার ঘুম ভাঙল', চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে—'একটা পাশের স্টেশন থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসেছি।'

বাবা খাতা দেখতে-দেখতে—'এবার থার্ডক্লাসে এলে তুমি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমারও তাই মনে হচ্ছিল।'

একটা খাতা রেখে দিয়ে—'তোমার সে সব হোল্ড-অল সুইটকেসগুলোই-বা

কোথায়?'

—'সেগুলো রেখে এসেছি।'

—'মাদ্রাজে?'

—'না, কলকাতায়ই।'

—'কলকাতায় নেবে বরাবর এ-অব্দি থার্ড ক্লাসে এলে বুঝি।'

—'হ্যাঁ।'

—'বরাবরই ফার্স্ট ক্লাসেই তো আসতে।'

—'তা আসতাম—'

—'এবার ইন্টারের টিকিটও কুলোল না বুঝি।'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'ব্যবসা বড় সাধনার জিনিশ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই রকমই হয়। আমি বুঝেছি তুমি ফতুর হয়ে গেছ।' একটু চুপ থেকে—'যা-ক্। খাওদাও, বিশ্রাম করো কিছুদিন। এর পর কী করবে ভেবে দেখো।'

বাবা কোনো কথা বললেন না আর।

মা দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন—'চা খাচ্ছ না যে?'

—'এই বার খাব।'

—'চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে—ব্যবসায় খুব লোকসান হচ্ছে এবার?'

একটা ঢোঁক গিলে—'হ্যাঁ বাজার বড় খারাপ।'

—'তা চা খাও।'

—'খাই।'

চায়ের পেয়ালাটা একবার থুতনি অবধি নিয়ে—'এ-বছর তোমাদের কিছু পাঠাতে পারি নি।'

—'আহা, তাতে আর কী হয়েছে? তাতে আর কী?'

—'কবে যে পাঠাতে পারব তাও বুঝে উঠতে পারছি না।'

দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

মা একটু চুপ থেকে—'তা, ব্যবসার অবস্থা এই রকম হল।' একটা ঢোঁক গিলে—'দেখছি তো।'

—'প্রথম বছর তোমার কত লাভ হয়েছিলে যেন?'

—'ব্যবসায় লাভ লোকসান ও-রকম ভাবে হিসাব করা যায় না।'

বাবা—'পনেরো হাজার টাকা লাভ হয়েছিল।'

—'টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিলে তুমি?'

—'না, ব্যাঙ্কে কেন, ব্যবসায় খাটালাম।'

মা মাথা নেড়ে, 'তোমার করা উচিত ছিল না।'

—'না হলে ব্যবসা কী করে চলে?'

—'তাই বলে পনেরো হাজার টাকা জলে দিতে হবে?' মা অনেকখানি দমে গেলেন।

—'ব্যাপারটা তুমি ঠিক করে বুঝলে না মা।'

—'তুমিই বা কী বুঝলে? শেষ পর্যন্ত লোকসানই যদি দিতে হয়, ঠকেই যদি আসতে হয় শুধু—তা হলে বোঝা না-বোঝা কোনো কথাই ওঠে না।'

বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—তিনি ঘাড় নিচু করে খাতা দেখছেন। বেখাপ্পা তর্কের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা নেই তাঁর, কিংবা তিনিও হয়তো মা-র মতোই ভাবছেন।

চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে—'ইস, এই চা খাও নাকি তোমরা?'

—'কেন চায়ে কী হয়েছে?'

—'যা হয়েছে তা হয়েছে'—মুখ বিকৃত করে নাক-মুখ খিঁচে চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রেখে দিতে হয়।

—'আমরা তো ছমাস ধরে এই চা-ই খাচ্ছি।'

—'এ-গুলো কী, চা, না, শুকনো পাতা গুঁড়ো।'

বাবা—'এখানে এই-ই নিয়ম; আমরা খুব শাদাসিধে ভাবে থাকি, এই-ই আমরা ভালোবাসি, মানুষের, বস্তুত জীবনেরও কোনো ক্ষতি হয় না এতে।'

মা—'তা, এ চা তুমি খাবে না?'

—'না।'

—'একটুও না?'

—'থাক।'

—'এক পেয়ালা চা নষ্ট করে ফেললে?'

একটু চুপ থেকে—'কাউকে দিয়ে দাও না।'

—'কে খাবে?'

বাবা—'এখন বেলা বাজে দশটা—এ সময় চা খাবার নিয়ম এ-বাড়ির আর কোনো লোকেরই নেই।'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'ফেলে দিলেই হয়।'

—'তাই বলছিলাম মিছিমিছি অপচয় হল।'

—'অপচয় আর কী? আমাকে খাবার জন্য দেওয়া হয়েছিল, মনে করে আমি খেয়ে ফেলেছি।'

বাবা—'সে রকম মিথ্যে মনে করতে যাব কেন? তা তো সত্যি নয়?'

—'তা অবিশ্যি।'

মুখ তুলে হেসে—'এটুকু চায়ের দাম কতই-বা? বড় জোর পাঁচ পয়সা; তোমাকে দিচ্ছি মা।'

বাবা—'এটা পারিবারিক জীবন—দেনা-পাওনার জায়গা নয় তো? এখানে এ-রকম কথা তোমার শোভা পায় না।'

—'তা ঠিক।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু আমি—'

—'না, কোনো কৈফিয়ৎ তো চাই নি তোমার কাছ থেকে।'

তবুও বললাম—'একটু ঠাট্টা করে বলেছিলাম মাকে।'

বাবা একটু হেসে—'তা বেশ, বেশ; কিন্তু কেমন একটা অসংযম দেখা যায় আজকালকার যুবকদের মধ্যে। তারা যদি পাঁচ পয়সা রোজগার করে তা হলে মনে করে বসে জীবনের সব জিনিশই পয়সা দিয়ে কেনা যায় বুঝি? তা যায় না। শেষ পর্যন্ত পয়সার দাম ঢের কম।' বাবা চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

মা-র দিকে তাকিয়ে ভরসার সুরে বললাম—'দু-তিন বছরের মধ্যে ব্যবসার সুবিধা হবে আশা করি।'

—'আসছে বছরে লাভ হবে?'

—'না, তার পরের বছরে।'

—'ঢের দেনা জমে গেছে। খুকি রোজ প্রায় দেড়সের দুধ খায় এখনো; দুধের যা দাম।'

—'দেড়সের রোজ? বাবা।'

—'বা, এর আগে তো দুসের-আড়াইসের খেত।'

—'অতটুকু মেয়ে?'

—'খিদে থাকলে খেতেই হয়। মা-র বুকে তো এক ফোঁটাও দুধ পায় না। সেই আতুর ঘর থেকেই তো এক রকম। এসব মেয়েদের যে কী ধাঁচ—ছেলে বিয়োবে, বাঁটে দুধ থাকবে না; একটা মরা গরুরও তো থাকে, অক্ষয় ডাক্তার খেতে বলেন।

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কাকে?'

—'নীলিমাকে—কেন?'

—'তখন থেকেই গরুর দুধ খেয়ে আসছে বুঝি?'

—'গরুর দুধ, ছাগলের দুধ কত কী? ফিডিং বোতল ভাঙল কতকগুলো; কিছুতেই দুধ খাবে না; ছবি চাই; ছেলেমেয় বড় করা কি কম হ্যাঙ্গাম।'

চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে দেখি একটা মাছি পড়েছে, মাছিটা মরে নি এখনো। ধীরে আঙুল দিয়ে তুলে পেয়ালার কিনারে রেখে দেই। মাছিটা আস্তে-আস্তে পেয়ালার গা বেয়ে-বেয়ে টেবিলের ওপর নেমে চুপ করে বসে থাকে।

মা—'টাকার শ্রাদ্ধ। তারপর এই তিনমাস আমাশায় পড়েছিল।'

—'কে?'

—'খুকি। রক্ত আমাশায় যায়-যায়।'

—'তা হলে তো ঢের ঝঞ্ঝাট গিয়েছে তোমাদের?'

—'টাকাও জলের মতোন খরচ।'

মা—'ফুড, গ্ল্যাক্সো, বার্লি, টিনে-টিনে একেবারে ঘর বোঝাই হয়ে গেছে; সেই আমাশায় থেকেই দুধ আর পেটে সয় না, ফুডের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয়।'

মা একটা ঢোক গিলে,—ডাক্তার একটা বাঁধা; আমি বলেছিলাম কবরেজের কথা, কিংবা আমাদের বিধু, ক্যাম্বেলের পড়া, ছেলেটিও বেশ ভালো। কিন্তু বউয়ের চোখ কপাল ফুঁড়ে আকাশে গিয়ে ওঠে। এম-বি ডাক্তার না হলে তার চলে না।' পেয়ালাসুদ্ধ চা দরজার ভিতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে মা, 'তা এম-বি ডাক্তার এক-একবার আসে দুই-দুই টাকা করে ভিজিট নিয়ে যায়। এমনই যে ভিজিটের টাকা একবার বাদ পড়ে গেলে তো পরের বার সাধ্য-সাধনা করেও তাকে আনা যাবে না। তা আমি ভাবি, টাকার চেয়ে মেয়ের প্রাণ তো বেশি; জীবনে টাকাই তো সব নয়। একটা টাকার গাছ না হলেও চলে না যে।'

—'একটা গাছের দরকার কম নয়। না হলে সংসারে কী দিয়ে কী হয়।'

পেয়ালাটা এক দিকে সরিয়ে রেখে—'তোমার বাবা দেনায়-দেনায় তো ডুবে

গেলেন।'

—'কত দেনা?'

—'থাক'

মা—'জুতো, জামা, পেনি, ফ্রক, ইজের, পাউডার কত কী, আমি বলি মেয়েকে মেমদের বেবীর মতো সাজিয়ে লাভ কী। কিন্তু তোমার বউয়ের যা মর্জি। কত ধানে কত চাল হয় একটুও যদি বুঝত। শালিকের বাচ্চাকে দিয়ে ময়ূরের পেখম উড়ানো চাই!'

—'খুকির জন্য তা হলে তো তোমাদের ঢের খরচ।'

—'ওর মা-র জন্যও কি কম? তুমি গত বছর চৈত্র মাসে শেষ কিস্তিতে যে তিনশো টাকা পাঠালে, বউ কপালে চোখ তুলে বললে, মাসে-মাসে আমার স্বামী এতগুলো করে টাকা পাঠান অথচ আমার আর্শি নেই, সিন্দুর নেই, ভালো হাড়ের চিরুনি নেই, সিল্কের ব্লাউজ নেই। সে এক কাণ্ড বাধালে। চৈত্র মাসে এই তাণ্ডব বায়না।'

খাবার টেবিলের উপর একটা শুকনো পান ছিল। মুখে দিলাম।

মা—'আমাদের জন্য ওর সহানুভূতি এত? কেন এমন হাতিপোষা বাচ্চা? সুন্দরবনের হাতি, রাজ-রাজড়ার দেউড়ি ছেড়ে।'

—'টাকা তো ঢের খরচ হল, মেয়েটা দেখতে কেমন হয়েছে?'

—'সেই এক রত্তি, আর বাড়ে না।'

—'তাই না কি?

—'তা আমি ভাবি, বামনবীর হবে না কি আবার।'

—'না তা হবে না; এক বছর মোটে বয়স। কত বাড়বে আর?'

একটু চুপ থেকে, 'এখন হামাগুড়ি দেয়? না হাঁটে?'

—'হাঁটতে পারে। টুকটুক করে হাঁটে, সলতের মতো হাত পা, খানিক হেঁটেই ধোঁকে।'

—'তা হামা দেয় না আর, টুকটুক করে হাঁটে?'

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর জানলার ভিতর দিকে তাকিয়ে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে খুঁজছিলাম। কোথাও পেলাম না।

বললাম—'গাছটা কোথায় গেল?'

—'কোন গাছ?'

—'সেই কৃষ্ণচূড়াটা।'

—'কে জানে?'

—'কেন, গাছটা দেখ নি তুমি কোনোদিন?'

—'মনে আছে কার?'

—'বাঃ, কেমন সুন্দর ফুলে ভরে থাকত বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সমস্ত দুপুর ভরে ডালে-ডালে শালিখগুলো কিচিরমিচির করত; রাতের বেলায় নিস্তব্ধে লক্ষীপেঁচা এসে বসত।'

—'গতবার তো তুমি প্রায় বার-চোদ্দটা সুটকেশ এনেছিলে। বেশ সুন্দর চকোলেট বাদামি রঙের চামড়ার। সেগুলো কই?'

—'রেখে এসেছি।'

—'কোথায়?'

একটু চুপ থেকে—'মাদ্রাজে।'

—'কেন, আনলে কী ক্ষতি হত?'

—'অত মালের ভাড়া দেয় কে?'

—'কেন, আমাকেও তো দু-চারটা দিলে পারতে।'

—'তুমি গতবারেই তো তিনটে নিলে।'

—'তা বলে আর-বুঝি লাগে না?'

—'পরে নিও।'

—'তোমার বিছানাপত্র একটা ইকড়ি-নিকড়ি শতরঞ্জিতে বেঁধে আনলে যে বড়। কেমন একটা লোকসানি শতরঞ্জি। হিন্দুস্থানি ধোপাদের মতো, খোট্টাদের মতো।'

একটু থেমে, 'মাদ্রাজে এই-ই চাল—'

—'কী?'

—'ব্যবসায়ীরা এই রকমই করে।'

—'নাপতের মতো বিছানা-বাক্স নিয়ে চলাফেরা করে?'

—'ব্যবসা করতে হলে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়।'

—'ও সব হল ছোট দোকানদারদের কথা। যারা টাকার পুরস্কার পেয়েছে জীবনটাকে সাজাতে তারা ছাড়বে কেন?'

—'তা ঠিক, আমিও তো সাজিয়েছি।'

—'কোথায়?'

—'কেন মাদ্রাজে।'

—'তোমার দোকানটা সেখানে খুব সুন্দর বুঝি?'

—'বেশ সুন্দর তো;'

—'কী কী জিনিশ বিক্রি করো?'

—'কত জিনিশ।'

—'সাইকেলের টায়ার বুঝি?'

—'তোমাকে কে বললে?'

—'জানি না বুঝি আর? হ্যাঁ—মাদ্রাজিরা খুব সাইকেল চড়ে?'

—'খুব।'

—'টায়ার তো এক দিন আমাকে দেখালেও না। কী রকম জিনিশ? রবারের তৈরি?'

একটু চুপ করে থেকে—'আর কী বিক্রি কর?'

—'চা।'

—'খুব কাটতি?'

—'খুব।'

—'দিনের মধ্যে দশবারও হয়তো চা খায় ওরা?'

—'যাদের মর্জি তারা খায়।'

—'একটা মাদ্রাজিকেও কোনোদিন দেখলাম না।'

—'দেখে কী লাভ?'

—'আমি ভাবি কি, যাদের কাছে জিনিশ বেচে তোমার এত পড়তা তাদের কাছে আমরা ঢের ঋণী।'

—'তুমি তো এই কথা বলছ, শুনতে ভারি সুন্দর তোমার কথা, ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবেই দেখা যায়; যদি মানুষের ব্যবসার ভিতরের খবর জানতে।'

সে বাধা দিয়ে বললে—'থাক, হাজার-হাজার টাকা যে তারা আমাদের করে দিচ্ছে, সে সত্য তো তুমি মুছে ফেলতে পারবে না। মাদ্রাজি মেয়েরা কেমন দেখতে?'

—'মন্দ কী?'

—'খুব সুন্দর বলো।'

—'রুচিভেদে। সংসারে কারো কাছে সুন্দর লাগে, কারো কাছে সাধারণ বলে মনে হয়।'

—'তোমার কাছেই-বা কেমন লাগল?'

—'এক-একজন ছিপছিপে মেয়ে, বেশ তো।'

—'মাদ্রাজি শাড়ি পরে?'

—'তাই তো দেখলাম।'

বললে—'আর কী বিক্রি কর?'

—'মাখন, পাউরুটি, বিস্কুট, জ্যাম।'

—'জ্যাম কাকে বলে?'

—'ওই জেলিই।'

—'কতদিন কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরি নি।'

—'কেন?'

—'না, এইসব পাড়ার লোক বড় কুচুটে। ছিঁচকে শাশুড়িও একটি কম নন।'

একটু চুপ থেকে—'পায়ে আলতা দিয়েছ দেখছি।'

—'সুন্দর দেখাচ্ছে না?'

ঘাড় নেড়ে—'বেশ।'

—'মেহেদি পাতা ঘষে দিয়েছি।'

—'তাইতে। তাতে এত লাল হয়?'

—'তা হয় বইকি।'

—'বিকেলে তোমাকে এক শিশি আলতা কিনে দেব।'

—'থাক।'

—'কেন থাকবে?'

—'আলতা আমি বড় একটা পরি না।'

একটা নিশ্বাস ফেলে—'যখন দরকার হয় মেহেদির জঙ্গলই তো রয়েছে।' নিস্তব্ধ দুপুর, ঝিঁঝি ডাকছিল।

—'বড্ড গ্রামোফোন শুনতে ইচ্ছে করে আমার।'

—'গ্রামোফোন?'

—'যেন আকাশ থেকে পড়লে। এতদিন পরে মাদ্রাজ থেকে এলে একটা গ্রামোফোনও তো আনতে পারতে।' সে আঙুল মটকাতে-মটকাতে, 'আজ কাল তো খুব শস্তায় পাওয়া যায়। একশো পঞ্চাশে একটা খুব ভালো কল হয়।'

—'তা হয় অবিশ্যি।'

—'বেকুবের মতো মাথা নাড়ছ; আনলে না তো'। জানলার পাশ থেকে একটা লেবুপাতা ছিঁড়ে নিলাম।

—'আজকাল কত নতুন রেকর্ড বেরিয়ে গেছে।'

—'পাড়ায় কারো গ্রামোফোন আছে?'

—'তা দিয়ে তোমার কী হবে?'

—'দু-তিনদিন এনে শোনা যেত।'

—'তা তুমি এনে শুনতে পার; কিন্তু ও-রকম করে গান শোনবার লোভ আমার নেই। লোকে তো সাতশো টাকা দিয়েও গ্রামোফোন কেনে। একটা দেড়শো টাকা দামের জিনিশ। এই জন্য যাব আমি পাড়ার লোকের কাছে চাইতে? সব্বাই জানে যে মাদ্রাজে তুমি হাজার-হাজার টাকার ব্যবসা করছ।'

—'না, পরের জিনিশ চেয়ে ফুর্তি করার পক্ষপাতী আমিও বড় একটা নই।'

—'ভিক্ষে করে যারা ফুর্তি করে তাদের জীবনে তৃপ্তির চেয়ে ধিক্কারই ঢের বেশি।'

—'অনাড়ম্বর নিস্পৃহ জীবনও তাদের চেয়ে ঢের ভালো।'

—'তা ঠিক।'

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব রইলাম।

—'বড় তো বললে জীবনটাকে সাজাচ্ছ। কিন্তু এই চার বছরের মধ্যেও এই খড়ের ঘরদোরের জীর্ণশীর্ণতা ঘুচল না। পশ্চিমে একটা দালান তুলতে বলেছিলে, তার ইটের পাঁজা এখনো পুড়ছে হয়তো?' একটা নিশ্বাস ফেলে, 'সে রাবণের চিতার মতো চিরকালই পুড়বে।'

একটু হেসে, 'দেখো না, কী হয়।'

ঈষৎ ঔজ্জ্বল্যে চোখ তুলে, 'জায়গা কেনা হয়ে গেছে?'

মাথা নেড়ে, 'না, কোথায় কিনব ভাবছি।'

—'ভাবছ? তা ভেবেই যাদের মনখালাশ মিছিমিছি কষ্ট করে কিনবার প্রয়োজনই-বা কী তাদের? জীবনের শেষ পর্যন্ত মনের নিরবচ্ছিন্ন ভাবনা নিয়ে বেশ বিলাসেই তো দিনরাত কেটে যাবে। জাবর কেটে চোখ বুজে লেজ নেড়ে?'

—'ভাবছি মুঙ্গেরে কিনব, না আরো পশ্চিমে যাব—ধরো দেরাদুনে।'

—'থাক্।'

—'না, কথাটা হচ্ছে কী জানো'

—'মিছিমিছি কথার অপব্যবহার করে জাহাজ বানিয়ে কী লাভ।'

একটু চুপ থেকে বললে—'আমাদের বিয়ের পর থেকেই বলে আসছ মানুষের জীবনটা একটা শ্রীছাঁদের জিনিশ। এখানকার গরু-ছাগলের খোঁয়াড়ের দিকেও তো একটু তাকাতে হয়।'

—'তা আমি ভেবেছি।'

—'সেই বিয়ের থেকেই আমাকে শোনালে মানুষের জীবন খুব একটা সুন্দর রচনার জিনিশ। তা আজ অবধি একটা কোঠা বাড়ি হল না, গ্রামোফোন নেই, অর্গান নেই, সেলাইয়ের কল নেই, মেহগিনি কাঠের চেয়ার, টেবিল, দেরাজ নেই, ছাপার খাট নেই, ঝালর বাতি নেই, একটা সেলাইয়ের কল অব্দি নেই।'

—'তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ এ দেড়বছরে।'

—'হয়েছিই তো, আরো হব।'

—'কেন?'

—'রোজ জ্বর হয়, হাত-পা ফোলে, ফুলে লাল হয়ে যায়, কট-কট করতে থাকে।'

—'তাই নাকি?'

—'তবে আবার কী? এ রকম স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে থাকলে কী আর হবে। বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে যারা আমাকে দেখেছে তারা আমাকে চিনলে হয়।'

একটা নিশ্বাস ফেলে সে—'ডাক্তার বললে ভিটামিন খেতে। দুধে ভিটামিন আছে, কমলালেবুতে আছে, কিন্তু পয়সা কোথায়। খুকির দুধ জুটিয়েই বাবা হয়রান। আমার জন্য আবার দুধ? মুখ ফুটেই-বা বলি কী করে বাবাকে? গত বছরে তো তুমি বাড়িতে একটা টাকাও পাঠালে না।'

—'আমাকে লিখলেই পারতে মাদ্রাজে।'

—'যাক্, আমার জন্য একসের দুধ আলাদা রেখো তো রোজ।'

—'তা রাখব।'

—'মাছ মাংস, ডিম, মাখন, টমেটো, কমলালেবু ভিটামিন তো অনেক জিনিশে আছে, কী বলো?'

—'তা আছে।'

—'বাজার থেকে রোজ নিয়ে এসো এগুলো; কারো ওপর দিও না। তুমি নিজেই নিয়ে এসো। টাটকা টাটকা জিনিশ আনতে পারবে তা হলে।'

—'তা পারা যাবে।'

—'ডাক্তার আমাকে দুটো ওষুধ দিয়েছিলেন; কিন্তু কেনা হয় নি।'

—'কেন?'

—'বড্ড দাম ওষুধের। প্রায় দশ-বারো টাকা। আজ একটু সন্ধ্যার সময় ঘুরে কিনে এনো। আনবে কি?'

—'আনব বইকি।'

—'এখন গরম পড়ে গেছে। জামা পরে বেচারা ঘেমে হাঁসফাঁস করে। সারাদিন বড্ড কষ্ট পায়, মোটা খদ্দরের জামা ছাড়া কিছু নেই খুকির। ওর জন্য দুটো সিল্কের ফ্রক কিনে এনো। মুনকার দোকান থেকে, চকের মোড়ে।'

—'সিল্কের?'

—'হ্যাঁ, নকল সিল্ক বা চাইনিজ সিল্ক এনো না, যা খাঁটি জিনিশ তাই আনবে। অতটুকু শিশুকে ঠকিয়ে কী লাভ?'

—'তা তো ঠিকই।'

—'এক টিন পাউডার আনবে খুকির জন্য; বাজারে যা সবচেয়ে ভালো জিনিশ তাই। বাজে জিনিশ মেখে অনেক সময়—'

—'তা নয়।'

—'আর এক জোড়া বাদামি জুতো লাল ভেলভেটের নাগরাই এনো। বেচারা সারাদিন খালি পায়ে টুক-টুক করে হাঁটে। সেদিন একটা কাচ না কী ফুটে গিয়েছিল।'

—'জুতো পায় দিলে আবার ফোসকা পড়বে না তো?'

—'না, পায়ে দেওয়ার অভ্যাস আছে, মাস তিনেক আগে এক জোড়া কিনে দিয়েছিলেন বাবা—কোথায় হারিয়ে গেছে।'

—'সে-জোড়া খুঁজে বের করলে হয় না?'

—'কেন তাই পরাবে না কি ওকে? অতটুকু মেয়ের ওপর এ-রকম জুলুম করতে তোমার রুচি হয়?'

একটু হেসে—'না পায়ের মাপের জন্য চেয়েছিলাম।'

সে একটু হেসে—'সে জন্য তোমার এত ভয় কী। একটা পেন্সিল দিয়ে এক চিলতি শাদা কাগজের ওপর এঁকে নিলেই তো হবে।'

—'তা হবে।'

—'এই যে চেককাটা খদ্দরের ব্লাউজ গায়ে দিয়েছি, গরমের ভেতর একেবারে চিড়বিড় করে ওঠে যেন; আমার জন্য কতকগুলো ব্লাউজ পিস এনো তো—সিল্কের, নকল সিল্ক হলেও চলবে আমার, জীবনটা প্রায়ই আমার নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। যেন জ্বর আসছে আবার—হাত-পা ফুলতে শুরু করল বুঝি। ওকী তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ? ঘুমিয়ে পড়লে অবশ্য মানুষ এত কথা শোনে না।'

কয়েকবার হাই তুলল, কয়েকটা তুড়ি দিল; মটমট করে আঙুল মটকাল। জানলার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ বমি করল, তারপর ধীরে-ধীরে উঠে চলে গলে।

কবিতা

শরীরিণীকে

নির্ঝর বনানী নদী আকাশ ও নারীর শরীর,
তোমাদের স্বাভাবিক সুকৃতি রয়েছে।
আমরা মৃত্যুর হাতে ভ্রান্ত হয়ে জীবনের সেবা
আধেক তো শুরু করি,—সৌন্দর্যকে হয় তো আধেক
হৃদয়ে ধারণ করে চোখ বুঝে চুপে বসে থাকি;
দিনের সূর্যের দিকে আমাদের জীবনের বাতি
ঈষৎ ফিরিয়ে।—রাতে অনিমেষ নক্ষত্রের থেকে
আশ্বাস হারিয়ে ফেলে, খুঁজি কেন অন্য এক সীমা।
কিছু নেই; হবে না; রবে না ঠিক; তবু স্বাভাবিকতায় সকল ম্লানিমা।
চারিদিকে সময়ের শূন্যতার থেকে
লীন প্রাণ বৃক্ষকে ডেকে-ডেকে
যে রকম স্থির নীল হয় দিন হয় পাখি হয় পাখিদের নীড়
নক্ষত্র নির্ঝর নদীর নারীর শরীর।

জল

অনেক বছর পরে এখন আবার দেখা;—ভালো।
চারিদিকে কলকাতার হেমন্তের বিকেল নিভছে;
গ্যাসল্যাম্পে বেশি আভা—আকাশে নক্ষত্রলোক হতে
কম আলো—কোথাও প্রকৃতি নেই—কিংবা তার ভিতরের পাখি
উচ্ছল পাতার মতো শব্দ হয়, জেগে ওঠে
কলকাতার ফুটপাথে ল্যাবারনাম গাছে
নারীকে শুধানো যেত—তবু নিরুত্তর হয়ে আছে
বারো বছরের আগের মনের ভিতরে দূরদেশে;
যেন গর্ভিণীর মতো;—অজাত শিশুর ধ্যানে চুপ
হয়ে গিয়ে মুহূর্তেই অনুভব করেছে স্বরূপ
স্বভাববন্ধ্যার মতো যেন তার।

রূপকে এ-সব কথা ভেবে নিয়ে আমি
বুঝেছি, বুঝেছে সব—আমারি মতন অন্তর্যামী।

তার পরে বেশি হাসে কথা বলে দোকানের কেনাকাটা করে
আমি জল—তবু যেন অন্য কোন জল এসে পড়ে
চোখে মুখে নাড়ীর কম্পনে তার জানি
কোনো দূর অন্ধকারে অবিরল ঋণী যে কী ঝরঝরানি
এ নারীকে দেনা নিয়ে, অপর জলের দূর দেশ থেকে শোনা যায়—
সে এই নারীর স্বামী অথবা প্রেমিক
তবু জলের মতন যেন ঠিক। ক্রমে সুদ খুব বেশি জ্বলে।
সব জ্ঞান ধর্ম উদ্যমের চেয়ে জল ভালো বলে
খাতক হয়েও তবু উত্তমর্ণ মহিলার চেয়েও সফল
সৃষ্টির অন্তিম কথা অন্ধকারে জল।

যেন তা কল্যাণ সত্য চায়

যেন তা কল্যাণ সত্য চায়—তবু অবাধ হিংসার
রিরংসা পাকে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে শূন্য হয়ে যায়—
অন্ধকার থেকে মৃদু আলোর ভেতরে
আলোর ভেতর থেকে আঁধারের দিকে
জ্ঞানের ভেতর থেকে শোকাবহ আশ্চর্য অজ্ঞানে
বারবার আসা-যাওয়া শেষ করে ফেলে।
একদিন আরো জ্ঞানী হয়ে তবু ক্লান্ত হয়ে রবে।
ব্যবসা-বাণিজ্য যুদ্ধে বারবার বিজ্ঞান বিষম
হলে তা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভয়াবহ ব্রহ্মাণ্ডের;
সময়ের আবর্তনে নিমিত্তের ভাগী বুঝি প্রেম।

সনাতন সময়ের উন্মোচনে তবু
হৃদয়ে এসেছে প্রেম বারবার;

চিরকাল ইতিহাস-বহনের পথে
রক্ত ক্ষয় নাশ করে যে এক বলয়ে
মানুষের দিকচিহ্ন মাঝে-মাঝে মুক্ত হয়ে পড়ে
অচিহ্নিত সাগরের মতন তা, দূরতর আকাশের মতো;
কোনো প্রশান্তি নয়, মৃত্যু নয়, অপ্রেমের মতো নয়,
কোনো হেঁয়ালির শেষ মীমাংসার গল্প নয়,
শুধু আরো শুদ্ধ—আরো গাঢ় অনির্বচনীয় সম্মেলন :
(হৃদয়ের ভূগোলের মহাদেশ আবিষ্কৃত হবে।)
সব পেছনের পার্শ্বের লীন লীয়মান
অন্তর্হিত হয়ে গেলে কূলহীন পটভূমি জেগে ওঠে।

সময়শীর্ষে

কি আসে যায় যদি সাগর থাকে অপার শিশিরকণায় ভিজে।
সূর্য এখন উত্তরণের মালিক হল নিজে।
কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন হয়ে থাকে কি যে
সরিয়ে দিয়ে বিশাল আলোয় দিক্-নিরূপক সূর্য আসে নিজে
যা হয়েছে : হয়েছে,—সেই পৃথিবীকে অন্ধকারে পিছন দিকে ফেলে
মানববিমূঢ়তাকে লাল দেশলাইয়েতে জ্বেলে
এসেছে সে আরেক ভোরের পটভূমির দিকে।
সারাটা দিন মাছরাঙা আর জলের ঝিলিকে
সূর্য আছে টের পেয়েছি; সংকল্প সুর তাই
গভীর হল।
নীলকণ্ঠ পাখির গুঞ্জরনে সর্বদাই
মহাদেবের কণ্ঠজ্বালা ফুরিয়ে গেছে তবে,
ভেবেছিলাম।
কত যুদ্ধ, কত অশোকস্তম্ভ আলো নিয়ে এল; ইউরোপের বিপ্লবে
মানব আশা ক্ষণিক জেগে বিনিপাতের শ্লেষে
ফুরিয়ে গেল, তবুও সূর্যকরোজ্জ্বলতাকে ভালোবেসে।
পৃথিবী তার নতুন ক্ষয় ব্যথা ভুলভালে
পিছন থেকে সারাটা দিন ডোডোপাখির টানে
শূন্য হয়ে যেতে-যেতে তবুও সকল সাধারণের তরে
আবার নতুন আশাজনক সমাজ আকাশ গড়ে;
জেনেছিলাম।
তোমাকে, আমি দেখেছিলাম বেবিলনের ছাদে
না দাঁড়াতেই ইন্দ্রপ্রস্থ ভোরের সূর্যস্বাদে
আমার পানে তাকিয়ে আছো।
অনেক দিনের মানবইতিহাসের পটভূমি
শেষ করে এক নিকটতর সূর্যালোকে ভোরের আলোয় তুমি তবুও ছিলে
তবু নীল আকাশে পালকে পাখি আলোকে ঠিকরিয়ে
কখন হঠাৎ চলে গেছে সূর্য সঙ্গে নিয়ে
জানি না কোন শাদায় কালোয় মিশেল নিবিড় রঙের দিকে;
অন্ধকারে দেখে গেছে মানব পৃথিবীকে :
ইতিহাসের নবীনতর এ আঁধারে অকূল মরুভূমি,
তেমনি আজও ছড়িয়ে আছে—শববাহন তেমন সংহার,—
তেমনি অসীম শবের প্রাবরণী খুলে ধীরে,
অন্তবিহীন মৃত্যুকে আজ ঢাকছ শিশিরে
করুণাময় শান্ত মৃত্তিকায়, মৃত্যু ছাড়া কিছু কি আসে যায়?

অন্তবিহীন কিছু কি আছে শববাহন ছাড়া?
অন্ধকারে অনন্তকাল অনুগমন করে গেছে যারা
শোককাতর মৃতের জগৎ জীবন পাবে বলে,
আলম্বিত রাতের আকাশ আলোয় অন্বেষণ।
আমরা যে সব শববাহক; বিলাপশীল ইতিহাসের মনে
পৃথকসূত্র আছে জন্মে; তবুও চিরদিন
অনেক-অনেক রকম অন্ধকারে লীন
দেখেছি প্রেমিক গণিকাদের নিকট থেকে ঋণ।

যদিও আজ তোমার চোখে

যদিও আজ তোমার চোখে আমি ছাড়া অন্যরা বিখ্যাত
মনে পড়ে অনেক আগে এমন ছিল না তো
মাঠে ঘরে সম্মেলনের থেকে ফিরে
তখন তুমি সহজ স্বাভাবিকের মতন ছিলে
আমিও তখন তোমাকে ছেড়ে সমাজ পৃথিবীর
অসংগতির করুণ ক্লান্ত ভাষা
শুনিনি এমন। গভীর অন্তরঙ্গ আঘাত করে :
চূর্ণ করে ফেলতে পারে তোমার আমার মতোন ভালোবাসা।

দিনে তোমার সঙ্গে নিয়ে নদী নগর প্রাকসামরিক রাষ্ট্র পৃথিবীতে
হৃদয় ভরে কিছু নিতে, কিছু দিয়ে দিতে
ব্যস্ত থেকে ভুলে যেতাম বীজাণু রোগ মৃত্যু মলিনতা
ক্লান্তি বিয়োগ ছিল, তবু সে সব নিছক মাংসপেশীর ব্যথা
সুস্থিরতার কাল চলেছে তখনের প্রায় ভারতে ইউরোপে
প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শুরু তখন, কানে খানিক জল
ঢুকে গেলেও পূর্বাচার্যেরা সব ঝেড়ে
ব্যাঙ্কে ধর্মে যৌন সম্মিলনে সূর্যে আশ্চর্য সফল।

দিনের বেলা ফ্যাক্টরি ডক বস্তি ফাঁড়ি আজিকাজি ডাঙার ভিতর দিয়ে
ঢাকনি খুলে ঘুরে বেড়ায় সে-সব পথে তোমার কাছে গিয়ে
পরিহাসের রসিকতায় উৎসারিত হয়ে
সৈন্য, নটী, দালাল, ভাঁড়, ব্রাত্য, সার্থবাহের ঘরে
সচ্ছলতা আশা আপোস কাড়াকাড়ি বিলাস ব্যর্থতায়
দেখেছিলাম কল্কী ও তার ঘোড়া রগড় করে।
আঁধার সভা স্বদেশীমেলা ঢের জানালার হৃদয়বিদারক
অন্ধকারে চেয়ে থেকে পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও ছক
হৃদয় এল ধীরে—ক্রমে—বিষণ্ণতার স্থির প্রতীকের মতো।
ইতিহাসের নিয়ম কঠিন, তবুও ফোটায় করুণাবশত
অপার আশার আকাশকুসুম; লোকায়ত সফলতায় প্রবেশ করে নিতে
দেরি করে;—মানুষেরাও ক্লান্তিবিহীন প্রাণের প্রকাশ দেখিয়ে দিতে জানে
বলে : তখন লোহা পাথর ছিল, এখন অণুর বিদারণে
পথে এল, আলো পেল মানবতার মানে।

এখনো সে তেমন হতে পারে নি কিছু তবু
ভেবেছিলাম মানুষ ইতিহাসের হাতে ক্রমেই বড় হবে

মেশিনকে বশ করে খেলার চেয়ে
হয়ে পড়ে অন্য সফলতায় প্রবীণ;—তবুও মানুষ খেয়ে
মেশিন ক্রমেই আজ পৃথিবীর একক শক্তি হল
প্রেমের ছেদ হয়ে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা
বেড়েই গেল—জ্ঞানের পরিণামের মানে হল
এই ধরণের পৃথক করার কথা?

এখনো ঢের আলোয় পথিক রয়েছে তবু জানি
অনেক অমর অর্ধসত্যে অবিশ্রান্ত রাজকীয় চালানি
চলছে আজও স্পষ্ট শতাব্দীকে স্পষ্ট অর্থে দাঁড় করাতে গিয়ে
দেখেছি সে কাজ প্রমথদের; চারিদিকের অন্ধকারের ভিতরে দাঁড়িয়ে
তবুও দেশ সময় ও সমাজ বাস্তবতা
অনেক দূরের থেকে করুণ সুরের মতো ক্রমে-ক্রমে বজ্রশব্দে এসে
আজকে যুগের গণনাহীন ব্যক্তি জাতি অর্থ প্রয়াস রীতির স্তম্ভ ভেঙে
মৃত্যু সে কি, গভীরতর (সফলকাম) সত্য ভালোবেসে।

আকাশে রাত

এখন আকাশে রাত,
সে অনেক রাত;
ঊনিশশো অনন্তের রাত্রি নাকি।
সময় ও অসময়—সকলের সুর
স্থির স্থিরতর হয়ে উঠে
জলের ওপরে জলকণিকার কথিকার শব্দের মতন
অবনমনের ব্যাপ্তি পায়।
পৃথিবীর জাগরীর গুঞ্জরন দূরে
সৈন্য নটী ভিখিরির;
তার পর কোনো এক সময়ের জন্য নীরবতা
মেনে নিতে হবে জেনে সার্থবাহদের
আলাপ মিইয়ে আসে মুখে
এখন ঘুমের আগে
গভীর রাত্রির পথে।
পৃথিবীর নানা দেশনগরীর কয়েকটি সচকিত ছবি
প্রাণে উৎসারিত হয়ে যেতে চায় :
দিল্লী, চীন, প্যালেস্টাইন, কলকাতা, করাচি,
এথেন্‌স্‌, মিশর, ফ্রান্‌স্‌, মস্কৌ, লন্ডন, ন্যুইয়র্ক, ওয়াশিংটন,
আধুনিক ভূমিকার গাঢ় মানদণ্ডের মতন
এইসব।

এইসব নগর বন্দর দেশ আজও
অতীতের উত্তরাধিকার থেকে ক্লান্ত প্রাণে উঠে
নতুন সূর্যকে সেধে তবু তাকে শীত করে দিতে চায় যেন।
কোথাও ভ্যার্সাই প্ল্যান লোকার্নো জেনিভা প্রেত ...প্রাণে
কথা কয় বলে মনে হয়;
নিথর আটোয়াচুক্তি ফেঁড়ে গিয়ে—থেমে
কেউ নয় আজ আর;
মিউনিখ্‌ প্যাক্ট্‌ চিরন্তন বিষয়ের
লক্ষ্যভেদ হয়ে গেছে ভেবেছিল;
প্রায়ান্ধ দেবীর মতো নীলজলরাশির ওপার থেকে দ্বীপ
সমস্যার নিরসন হবে বলেছিল
ভারতকে যাকে যা দেবার সব স্থির করে ভালো করে
দান করে;
আরো পরে কনফারেন্স কমিশন প্ল্যান

বিদেশ স্বদেশ সমসাময়িকতার হয়ে তবু
যেন ঢের বিস্তীর্ণ সময়
অধিকারে রয়ে গেছে মনে ভেবে বিহ্বলতায়
মানুষকে বিজড়িত করে চলে গেছে।

কবেকার অন্ধকার আদি দায়ভাগ থেকে ক্রমে মানবের
জীবন বন্ধনমুক্ত হতেছিল নাকি?
কারা যেন সেই
সমুদ্রের মতন মুক্তিকে
গোষ্পদে বিমুক্তি দিতে গিয়ে নেশনের
ব্যবহারে ব্যভিচারে বারবার ছেনেছে ছিঁড়েছে।

রাষ্ট্রনীতি কামনাকেলির চুক্তি সব;
এ ছাড়া এসব দেশ জাতি অধিনায়কের প্রাণে
কোথাও প্রেরণা নেই—দীপ্তি নেই;
আজ এই আধুনিক দিনে মাসে সময়ে কী কাজ হতে পারে
সে জ্ঞান হারায়ে ওরা অন্তহীন হেতুহীন সময়ের হাতে
সব ভুল শুদ্ধ হবে ভেবে
অবচেতনায় অন্ধকারে প্ল্যান গড়ে, প্যাক্ট করে।
সময়ের ব্যাপ্ত চোরাবালির ভিতরে
ডুবে যায়।
তবুও এখন ওরা
নতুন শক্তির মতো
নিজেদের মতো সেই মূল্যজ্ঞান রয়েছে; তা ছাড়া
কোথাও অপর কাজে মূল্য নেই মনে ভাবে ওরা
আবার প্রলুব্ধ করে যায়,
অবসন্ন পৃথিবীর প্রাণে আত্মপ্রসাদের ঋতু
আবার নেমেছে বলে।

বলে নিতে চায় : সবই নেশনের-নেশনের-নেশনের।
কানাডার সমুদ্র ও বল্‌কান্ বল্‌টিক্ গ্রিক সাগরের থেকে
দিল্লি লন্ডন কাইরো ডাম্বার্টন ওক্‌স্ টেহেরান ইয়াল্টায়
ফ্রান্‌স্ লেকসাক্‌সেস্ চীন আমেরিকা সোভিয়েটে
বিরাট বিসার নাদ মনে হয় যেন ব্যস্ত, অন্তরীক্ষে ঘুরে
সন্তানের মতো নিঃসীম জীবনের জননীকে খুঁজে
শিহরিত হয়ে তবু দেখে গেছে আজ এই অন্ধকার পৃথিবীর সীমা
যদিই-বা আলোকিত হয় তবে সে এক বিমূঢ় হিরোশিমা।
চারিদিকে তাই ব্যর্থ মৃত্যুশীল তবুও

আশ্চর্য সব আশাশীল মানুষের আলোড়ন।

তারা স্থির নেই;
দিন শেষ হয়ে গেলে আরো বড় রাত্রির ভিতরে
ঘুমে নেই; মৃত্যু আছে; অথবা আমৃত্যুলোক—পামর, অনন্দা;
সে সব মরণোত্তর ভিড় আজ অন্ধভাবে অনুভব করে;
তাদের দেহের সব অনাগত সন্তানের তরে রেশনের
নির্দিষ্ট মাত্রার মতো কোনোদিকে নারী
নারীরা রয়েছে—কিংবা নেই;
প্রেম নেই, প্রীতি নেই, সূর্য নেই, অন্ন নেই, কিংবা মহাকাল
কেউ নয়;

অন্ন নেই—অন্ন নেই—নেই;
ইতিহাস : বিছানায় মৃতপ্রায় মুগ্ধা অন্তঃসত্ত্বার মতন;
বাকি সব সন্তানের সন্তানেরা এসে একদিন
লিখে যাবে।

মানুষের চেতনার দাহ আছে আজও শোকাবহ
যত বেশি আলো তাতে আরও বেশি তাপ
সংগতি বেড়ে গেলে পেতে পারে ক্রমেই স্নিগ্ধতা
প্রাণের প্রেমের স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে হবে
দিতে হবে ক্রমেই স্নিগ্ধতা
এ না হলে বিজ্ঞানের মর্মে মর্মে কীট আর ব্যথা
নিরন্তর দোষে পরিণত হবে মানবের প্রতিভাব গুণ
সব আলো হয়ে যাবে ক্ষমাহীন নিয়মের আগুন।

এখানে দিনের—জীবনের স্পষ্ট বড় আলো নেই

এখানে দিনের—জীবনের স্পষ্ট বড় আলো নেই
ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনে আসো নি
চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না ছায়ার ভিতরে
আহত নগরীগুলো কোন এক মৃত পৃথিবীর
নিহিত জিনিশ বলে মনে হয়, তবু,
মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা

আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ-নগরগুলো সে রকম আন্তরিকভাবে মৃত নয়
বাজারদরের চেয়ে বেশি ভালো টাকা ঘুষ দিয়ে জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোন জীবনের উৎস অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে—ছিন্ন হয়ে—বিরোধিতা করে
সকলের আগে নিজে—অথবা নিজের দেশ নিজের নেশন
সবের উপরে সত্য মনে করে—জ্ঞানপাপে অস্পষ্ট আবেগে

পৃথিবীর মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা সফলতা যদি দেশলাইয়ে
পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবে
আমি ও আমার দেশ আমার স্বজন ছাড়া ওরা
উৎসাদিত হয়ে যাক—এই ভাব—এমনি কঠিন অপ্রীতি চারিদিকে
আমাদের রক্তের ভিতর অনুরণিত হতেছে
তবুও সার্থককাম কেউ নয়
আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোট বড় সফলতা সব
মুষ্টিমেয় মানুষের যার যার নিজের জিনিশ
কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়
এইখানে মর্মে কীট রয়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে
রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে।
প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজনমতো তাতে নির্মলতা আছে
আর কিছু আছে তাতে, হেন মানুষের সব প্রয়োজন সীমা
শেষ করে অহেতুক অন্তহীন চকিত জিনিশ
রয়ে গেছে—এক-আধজন কবি প্রেমিকের তবু
এ সব জিনিশ নিয়ে প্রয়োজন—সকলের নয়।

প্রকৃতি ও জীবনের তীরবাসী জ্ঞানময় মুক্ত মানুষের

নিকট সংস্পর্শে এসে শান্ত শান্তিকাম
হবে নাকি আমাদের শতকের অবিশ্বাসী অধীর মানুষ
কবে সে উজ্জ্বল হবে প্রিয় হবে সহৃদয় হবে
পৃথিবীর অগণন সহোদর জীবনের তারে।

সাগরকণ্ঠের মতো রাত্রি বাতাস অন্ধকারে
আমাদের শরীরের শুভ্রশঙ্খে কেমন বিধৌত হয়ে উচ্ছলিত হয়
মানুষের কানে কানে কথা বলে সমস্ত আকাশ
সহসা সুদূরে গিয়ে আধো পরিচিত মহিলার
শাড়ির মতন নীল—উপস্থাপিত হয়ে রৌদ্রের ভিতরে
নীলিমা কি প্রকৃতির? অথবা সাধনোচিত নারীর প্রতিভা?
পাখিদের ডানাপালকের থেকে বিকেলের আলো
নিভে গেলে রাত্রির নক্ষত্রেরা হৃদয়ের কৃতার্থতা ভেঙে
প্রশান্তির বাতাসের মতো আসে, যেন কোনো ঘুমন্তের মনে
কথা কাজ চিন্তা স্বপ্ন অকুতোভয়তা
নিজের স্বদেশে এল—

এই সব অবিরল উৎসারিত বন্ধুর মতন
আমাদের চারিদিকে দিন রাত্রি আকাশ নক্ষত্র নীড় সিন্ধুজল
সমাজের শুভ দিন প্রণয়নে অহেতুক নির্দেশের মতো
আশ্চর্য প্রাণের উৎসে রয়ে গেছে শতাব্দীর আঁধারে আলোকে
কেউ তাকে না বলতে এ পৃথিবী সকালের গভীর আলোয়
ছেয়ে যায় ;—কেউ তাকে না চাইতে তবু ইতিহাসে
দুপুরের জল তার, কেমন কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে
প্রকৃতির ভালো জল—সঞ্চারিত নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভরে যায়—সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে : নদী
নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছে কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে?
শুভ্র হবে, কখন উন্নত হবে, মানুষের নিজের হৃদয়।

স ম্পা দ কী য়

এই তৃতীয় খণ্ড তৈরি করে তুলতে আমাদের কিছু বেশি সময় লেগে গেল—প্রায় আট মাস।

এর আগের খণ্ডগুলিতে প্রধান অংশ জুড়ে ছিল যে-উপন্যাস দুটি—'জলপাইহাটি' ও 'মাল্যবান'—সেগুলি আগেই, কাগজে ও বই হয়ে বেরিয়েছিল। আমাদের কাজ ছিল মুদ্রিত সেই পূর্বপাঠের সঙ্গে মূল পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন।

কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গে আমরা এই সংগ্রহের কঠিনতর পর্যায়ে ঢুকছি। ছোটগল্প ও কবিতা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে এই সংগ্রহে ইতিপূর্বে এসেছে যদিও, উপন্যাসের বেলায় তেমন ঘটছে এই খণ্ডেই প্রথম।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও, সংগ্রহে আসবার আগে, কাগজে-পত্রে বের করে নিলে সম্পাদনার কিছু সুবিধে ঘটে। তেমন কিছু-কিছু আমরা করেছি—পাক্ষিক 'প্রতিক্ষণ'-এ—কিন্তু সে সব রচনাই আমরা সংগ্রহে এখনই নিচ্ছি না শুধু এই কারণেই যে তাতে নতুন পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারের কাজ আরো পিছিয়ে যাবে। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপিগুলি পাঠোদ্ধারের পর কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জি তৈরি করার উপাদান আমাদের আয়ত্তে আসবে। আর, তার ফলেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের তথ্যসমর্থিত ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তাঁর গদ্যরচনা ও কবিতারচনার ভিতরকার অন্তর্সম্পর্কও সেই তথ্যের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

'কারুবাসনা' উপন্যাসটির সঙ্গে আমরা 'নিরুপম যাত্রা' বড় গল্পটি প্রকাশ করছি—দুটি রচনা পরপর পড়লে দেখা যায় জীবনানন্দ এ দুটি কাহিনীতে পরস্পর বিপরীত এক পরিবেশভূমি তৈরি করেছেন—একটি গ্রামের, অপরটি শহরের।

তাঁর অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থভুক্ত যে-কবিতাগুলি আমরা এই সংগ্রহে বের করছি সেগুলোর কোনো-কোনোটি, প্রকাশিত ইতিপূর্বে কবিতার পূর্বপাঠ বা অংশ।

এই খণ্ডে যে-সব কবিতা বেরোল, তার কোনো-কোনোটি অন্য চেহারায় তাঁর মৃত্যুর পরে—কাগজে বেরিয়েছে, তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংযোজিত হয়েছে ও 'বেলা, অবেলা কালবেলা', 'আলো পৃথিবী' ও 'মনোবিহঙ্গম' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ ও তাঁর স্ত্রী নলিনী দাশ পাণ্ডুলিপিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। কবিভগ্নী সুচরিতা দাশ এক সময় এই সব পাণ্ডুলিপির বেশ কিছু কবিতা কপি করেছিলেন। কবিপত্নী লাবণ্য দাশ-এর দায়িত্বেই এই সব পাণ্ডুলিপি ছিল। শেষোক্ত দু-জন এখন মৃত। পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তাই প্রথমোক্ত দুজনের কাছ থেকেই জানি যে কিছু কবিতা তাঁরা সবাই আলাদা করে একটা কাগজের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখেন—'ইলিজিবিল এন্ড আনপাবলিশড' বলে। এই কবিতাগুলি সেখান

থেকেই একে-একে পড়ে-পড়ে খুঁজে পাওয়ার পর দেখা গেল পাণ্ডুলিপি-পাঠের সঙ্গে কোনো-কোনো কবিতার প্রকাশিত পাঠের পার্থক্য অনেকখানি—পাণ্ডুলিপির স্বতন্ত্র কবিতা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দীর্ঘ কবিতার অংশ হয়ে গেছে, কোথাও কবিতার নামেরও বদল ঘটেছে। সে কারণেই এই কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি-পাঠ আমরা এখানে প্রকাশ করছি।

প্রকৃতপক্ষে, 'জীবনানন্দ সমগ্র'-এর মতো পরিকল্পনা কোনো সময়েই হয়তো একক সম্পাদনায় সম্পূর্ণ হতে পারে না, খুব আংশিক শুরু হতে পারে মাত্র। ভবিষ্যতের সম্পূর্ণতর সংস্করণের জন্যে যত বেশি তথ্য সাজিয়ে দেয়া যায়, ততই ভালো।

পাণ্ডুলিপি কপি করার কাজে কল্যাণীয়া অশোকা শিকদার ও তীর্ণা রায়-এর উৎসাহী সমর্থন ও প্রুফ পরীক্ষায় আফসার আমেদ-এর সাহায্য এই খণ্ডে খুব ভরসা দিয়েছে।

উপন্যাস

কারুবাসনা

১৯৩৩-এর আগস্টের দুটি খাতায় উপন্যাসটি লেখা। যেমন জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, এই খাতা দুটির নামপত্রে তাঁর নিজের নাম, 'বরিশাল' ও মাস-বৎসর ইংরেজিতে লেখা—সবচেয়ে ওপরের a novel I ও a novel II। প্রথম খাতায় ১১৫ ও দ্বিতীয় খাতায় ১২২ পৃষ্ঠা লেখা—পিঠোপিঠি, কিন্তু মাঝে মধ্যে ছেড়ে-ছেড়ে। এই খণ্ডটির ৬৮ পৃষ্ঠার প্রথম ছ-লাইনের পর যে বিরতি আছে—সেটাই দুই পাণ্ডুলিপি সীমা।

উপন্যাসটি থেকে একটি পদ নিয়ে আমরা উপন্যাসটির নামকরণ করেছি।

জীবননান্দ সাধারণভাবে তাঁর উপন্যাসে, চিন্তা ও বর্ণনার অংশ ও সংলাপের অংশের মধ্যে, গভীর কোনো মিশ্রণ ঘটান না এবং উপন্যাসের প্রগতি প্রায়ই তিনি ঘটাতে পারেন এই দুই অংশের সমানুপাতিক অনায়াস বিন্যাসে। কিন্তু পুরো উপন্যাসটি প্রধান চরিত্রের সঙ্গে তার বাবা, মা, মেয়ে, স্ত্রী, কাকা, বন্ধু ও গ্রামবাসীর এমন সংলাপে-সংলাপে গড়ে ওঠার এই গঠন জীবনানন্দেও খুব সুলভ নয়।

বেশিরভাগ চরিত্রের সঙ্গে সংলাপ ঘটেছে একাধিক, এবং দুই সংলাপের মধ্যে তেমন কোনো গুরুতর ঘটনাও ঘটে না, কিন্তু উপন্যাস তার নিজস্ব গতি পায় এই একাধিক সংলাপেরই বিরোধাভাসে।

প্রধান চরিত্র উত্তমপুরুষে কথা বলেছে। কবিতা-লেখায় জীবনব্রতী এক প্রধান চরিত্র উত্তমপুরুষে কথা বলে যায় বলেই এই উপন্যাসে অনেক সময়ই ডায়েরি-জার্নালের প্রকৃতি যেন বেশি ধরা পড়ে। জীবনানন্দ নিজেই এ-রচনাকে 'novel' বলে চিহ্নিত করে না-গেলে মনে হতে পারত যে তিনি সব আড়াল ভেঙেই নিজের জীবনের কোনো-এক সময়ের ডায়েরি রেখে গেছেন। জীবনানন্দের উপন্যাসে তাঁর আত্মজীবনীর প্রয়োগ সম্পর্কে কোনো ধারণা বা আন্দাজ থেকেই মাত্র, এই উপন্যাসটির এমন জার্নালধর্ম ঠিক বুঝে ওঠা যায় না, যদিও তাঁর জীবন সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের ভিত্তি ছাড়া তেমন আন্দাজও অর্থহীন।

কিন্তু, এই উপন্যাসটিতে উপন্যাস ও আত্মজীবনের মধ্যে তেমন কোনো আড়াল যে নেই তারই যেন আরো আভাস মেলে, সেই সব অংশে, যেখানে জীবনানন্দের বিভিন্ন পরিচিত কবিতার আভা চোখে পড়ে ও জীবনানন্দ কাব্যরচনার প্রক্রিয়া নিয়েই কয়েক লাইন লিখে ফেলেন। (২৬ পৃষ্ঠা থেকে ২৮ পৃষ্ঠায় প্রথম—তার পরেও মাঝে-মাঝেই)।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'কুড়ি বছর পরে', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'অন্ধকার'—এই কবিতাগুলির কোনো-কোনো কল্পনার আসা-যাওয়া এই উপন্যাসেই প্রথম দেখা গেল। ১৯৩৪-এর এই কবিতাগুলি পাণ্ডুলিপিতে চিহ্নিত করা যায়, উপন্যাসটি ১৯৩৩-এ লেখা।

কিন্তু জীবনানন্দের জীবন ও কাব্যের অন্বয়ে ১৯৩৩-এ লেখা এই উপন্যাসটির গুরুত্ব প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে চায় 'বনলতা'-র প্রথম উল্লেখে।

১৯৩৪ বলে চিহ্নিত কবিতার সেই খাতাটিতে বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা সযত্নে কাটা। তারই একটিতে 'বনলতা সেন' কবিতাটি ছিল। একটি পাতায় কবির নিজের হাতে—'বনলতা সেন কবিতা পৌষ' লেখা—'কবিতা' পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশের এই উল্লেখ।

পরে, তাঁর কাগজপত্রের ভিতরে ঠিক এই কটি পৃষ্ঠা এক সঙ্গে গাঁথা পেয়েছি।

কিন্তু, এখন এখানে, বনলতার সেই আপাত আদি উল্লেখেরও আগে, এই ১৯৩৩-এর খাতাটির এই উপন্যাসেই এখন পর্যন্ত 'বনলতা' নাম ও প্রতিমার প্রথম উচ্চারণ পাওয়া গেল।

কবিতাটির আগেই 'বনলতা' এই উপন্যাসে স্মৃতিনির্মিত নায়িকা।

> চারিদিকে তাকিয়ে দেখি শুধু মৌসুমির কাজলঢালা ছায়া। কিশোরবেলায় যে কালোমেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহুদিন যাকে হারিয়েছি—আজ, সেই যেন পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশে দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশে সেই যেন দিগবালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণামণি, পুব আকাশ ঘিরে তারই নিটোল কালো মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কাল দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো রূপ তার—প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মতো অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম, বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোনো পল্লীর দিনগুলো সমর্পণ পরে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।
>
> সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তার পর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝ পথে গেল থেমে, তার পর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তার পর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।
>
> তার পর তাকে আর আমি দেখি নি।
>
> অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল; মন পবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি

পরে, চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা—।

আবার এই উপন্যাসের আর-এক সঙ্কটে

বনলতার কথা মনে হয়—এমনি শান্ত ধূসর শ্রাবণের শেষ রাতে সেও কি কোনো দূর দেশে তার স্বামীর ঘরে জানালার ভিতর দিয়ে কোনো প্রান্তরের চিতার দিকে তাকিয়ে আমার কথা ভাবছে এমন করে?

উপন্যাসটির কয়েকটি বর্জিত অংশ

রচনাসংগ্রহের পৃষ্ঠা/নির্দেশ	বর্জিত অংশ বা সংশোধন
৩৯ শেষ প্যারার পর	অবিশ্যি এক-এক সময় এক-এক দেশে কিংবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের সম্পর্কে শিল্পীর জীবনের এই ভবিতব্যতা লক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়। যেমন আধুনিক ইউরোপে কিংবা আমেরিকায় কিংবা আমাদের দেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে
৪৫ ওপর থেকে ১ম লাইনের পর	—'প্রভাত আজকাল কী করে?' —'কলকাতায় আছে। বছর চারেক আগে আই-সি-এস দিয়েছিল।' —'আই-সি-এস দিয়েছিল?' —'হ্যাঁ।' —'তারপর?' —'ইলেভেন্থ হল। সেবার দশ জন নিয়েছিল।' —'বড় তো মন্দ কপাল।' —'পরের বছর আবার দিল?' —'দিল।' —'হ্যাঁ। সেভেনটিনথ্ হল। সেবার নিল পনেরো জন।' —'তারপর? —'নানা রকম ডিপার্টমেন্টে চেষ্টা করল, কয়েকটা কলেজ করছিল, পেল না, গত বছর গেল একেবারে ভাওয়ালিতে।' —'ভাওয়ালি? সে কোথায়?' —'ইউ-পি তে।'

—'চাকরি পেয়ে গেল বুঝি সেখানে?'
—'হ্যাঁ, খুব ভালো চাকরি, ফুসফুসে যক্ষ্মা।'
—'যক্ষ্মা?'
—'কিন্তু ভাওয়ালিতে গিয়ে শুনল প্রভাতের হয়ে যারা বিলি ব্যবস্থা করেছে, তাদেরই হয়েছে ভালো। স্যানিটেরিয়ামের জন্য বেডের ব্যবস্থা করা হয় নি। পাওয়াঁরও কোনো সম্ভাবনা নেই।
মধুপুর চলে গেল।'
একটু চুপ থেকে বললাম—'আমি দেখে এসেছি কলকাতায় এসেছে।'
—'কেন?'
—'ল পড়ছে। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবে।'
দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

৫০ ১ম লাইনের পরে

'খুব...তেঁতুল গাছের ডালপালার মধ্যে বক ডাকে, লেবুফুলের গন্ধ আসে, কোনো তাড়া নেই, সফলতা-নিষ্ফলতার প্রশ্ন নিয়ে জীবন-বিধাতা খোঁচা দিতে আসেন না।'

৯৯ ওপর থেকে ১৭ লাইনের পর

—'কলকাতার চিড়িয়াখানায় যাস?'
—'না।'
—'কেন?'
—'খিদিরপুরে ট্রামে যাওয়া-আসায় আমার কতকগুলো পয়সা খরচ হয়ে যায়।'
—'খিদিরপুর না আলিপুর?'
—'খিদিরপুর ব্রিজের কাছে নামলেই হয়।'
—'চিড়িয়াখানায় যেতে হলে?'
—'হ্যাঁ, খিদিরপুর বাজারটার কাছেই তো।'
—'তা ট্রামে কত পয়সাই-বা লাগে, এক-আধ দিনের জন্যই তো যাওয়া।'
—'কলকাতায় একটা পয়সারও দাম আমার কাছে খুব বেশি; হিশেব করে খরচ করতে হয়। এ-রকম করে-করে হৃদয় গেছে মুষড়ে, জীবন বড্ড নোংরা হয়ে গেছে। কিন্তু কী করব? উপায় নেই তো। চুরি তো করতে পারি না। জুতো বুরুশ করতে লজ্জা করে।'
—'মিউজিয়ামের সেই চিতা বাঘটা এখনো আছে?'

—'তা থাকবে না কেন? আলেকজান্ডারের লাইব্রেরির মতো মিউজিয়ামটাকে কেউ ধ্বসিয়ে ফেলে দিয়ে যায় নি তো'—

—'সে প্রায় বছর কুড়ি আগে দেখেছি। উনি কলকাতায় গিয়েছিলেন, তোমার মেজকাকা নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে, বললেন, বড় বউ এই বাঘের পেটে কিন্তু খড় খচখচ করছে, অথচ কী জ্যান্ত দেখো তো।'

আস্তে একটা নিশ্বাস ফেললাম।

—'সেই জয়পুরি, কাশ্মীরি শালগুলো আছে?'

—'সব আছে।'

—বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে আমার সব।'

১০১ ওপর থেকে ১৩ লাইনের পর

পথের ধারে বৃষ্টিভেজা বাঁশের জঙ্গল, ভাট, শেওড়া ও বাবলার বন, বিনম্র কাঠমল্লিকা, মিষ্টি ব্যাঙের ডাক, নক্ষত্রভরা নীল আকাশ, শিশুবেলা মায়ের যে-রূপ দেখেছিলাম, তেমনি, স্নিগ্ধ নিবিড় অনুপম দেহ ও হৃদয়ের মতো। অপরূপ।

৪৫ পৃষ্ঠাটি শাদা। ৪৭ পৃষ্ঠার মাথায় II Left alone লিখে এই লেখাটি শুরু। এই প্রথম পৃষ্ঠার শেষের দিকে একটি জায়গায় সংযোজন করেছেন ৪৬ পৃষ্ঠার মাথায়। ১০৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত টানা লেখা। মাঝখানে ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠা দুটি শাদা। মনে হয় ৫১ পৃষ্ঠার পর পাতা উল্টানোর সময় বাদ পড়ে যায়।

খাতার এই দ্বিতীয় রচনাটি, 'নিরুপম যাত্রা'। সেকালে পরীক্ষার খাতা দেখা হত বা অ্যাকাউন্টেন্সির কাজে লাগত যে-ধরণের খুব মোটা শিসের লাল নীল পেন্সিল—তেমনি কোনো পেন্সিলে, লালে, জীবনানন্দ এই রচনাটি বহু জায়গায় সংশোধন করেছেন, সংযোজন করেছেন তার চাইতেও বেশি। এই মোটা শিসের পেন্সিলে দাগ দেয়া যত সহজ, লেখা তত সহজ নয়। ফলে, লেখার হরফগুলো, যখন তিনি এই পেন্সিল ব্যবহার করেছেন, অপরিচিত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সংযোজনের সময় তিনি হয়তো শুরুর সংকেতটা ঠিকই দিয়ে রেখেছেন কিন্তু তারপর লাল পেন্সিলের সংযোজন লিখে গেছেন ইতিপূর্বেই লিখে ফেলা লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে, মার্জিনের ওপরে। ফলে এই খাতায় এমন কিছু পাতা আছে যেখানে একটি পাতায় দুটি পাণ্ডুলিপি লুকানো—একটি প্রথমবারের লেখা, আর-একটি দু-এক পাতা। আগে থেকে শুরু কোনো সংযোজনের সঙ্গে যুক্ত। একটি আগেকার দিনের ব্লু-ব্ল্যাক কালিতে পেনে লেখা। আর-একটি ওই লাল পেন্সিলে। ফলে সাধারণভাবেই দুষ্পাঠ্য জীবনানন্দীয় পাণ্ডুলিপির ভিতরেও আবার এই রচনাটি একটু বিচিত্র ধরণের জটিল, পাঠ্যতায় নতুন ধরণের বাধা। কিন্তু জীবনানন্দের রচনায় অসম্পূর্ণ বাক্য, ভুল শব্দ—এই ধরণের অনিশ্চয়তা প্রায় থাকে না বললেই চলে, তাই একবার ভিতরে ঢুকে গেলে দুই রঙের পাঠকে নিশ্চিত ভাবেই আলাদা করে ফেলা যায়।

জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি-অভ্যাসের মতো এই পাণ্ডুলিপিতেও বিকল্প লেখা আছে কিন্তু কোনোটিই কাটা নেই, কোথাও দাগ দেয়া আছে—সংশোধনের বা বর্জনের সঙ্কেত হিশেবে। সেই কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরই বাছতে হয়েছে ও স্থির করতে হয়েছে কোনটি গ্রহণীয়। জীবনানন্দ তাঁর চরিত্রদের পূর্ণনাম মাত্র প্রথমবারই ব্যবহার করেন। তারপর তাদের ইংরেজি আদ্যক্ষর। আমরা তাদের পূর্ণনামই ব্যবহার করলাম। ইংরেজি শব্দ তিনি ইংরেজি হরফে লেখেন। আমরা বাংলা করে নিয়েছি।

এই রচনাটিতে সংশোধনের চাইতে সংযোজন বেশি। সংযোজনের ধরণ দেখলে বোঝা যায়, পরবর্তী পাঠে এক-একটি জায়গাকে তিনি সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন কিছু-কিছু করে। সেই সম্প্রসারণগুলোর ভাষাতেই বোঝা যায় রচনাটির ভিতরে তাঁর পুনর্প্রবেশের ফলেই সম্প্রসারণগুলো হয়ে উঠেছে তীব্র, অর্থদ্যুতিবান, আবার কখনো বিষয়বিস্তারে সূক্ষ্মতর। পাঠক, সংযোজনের ধরণের ইঙ্গিত পাবেন—বর্তমান ছাপায় দ্বিতীয়বার যেখানে ফাঁক দেয়া হয়েছে তার পরের অংশে ('চুরুট নিবে গেল বুঝি?')—'দিঘির পাড়ের অশ্বত্থের সবচেয়ে মোটা ডালগুলো তখনো জন্মায় নি'—এই পুরো প্যারা থেকে। তেমনি, উপন্যাসের একেবারে শেষ প্যারাটি বা তার একটু আগে 'সন্ধ্যার মুখোমুখি জ্বর এল আবার' এই অংশের পরবর্তী জ্বরাক্রান্ত চিন্তাভাবনা থেকেও। এই অংশগুলি পরবর্তী সংযোজন—প্রথম খশড়ার লেখা নয়।

এ উপন্যাসে জীবনানন্দের বাস্তবতা-অন্বেষণ তথ্যনিষ্ঠ। তাই একটু যেন হতচকিত হয়ে যেতে হয় আমাদের ত্রিশের দশকে গোড়ার দিকে দুনিয়াব্যাপী মন্দার আঘাত জর্জর এই উপনিবেশের এক রাজধানীতে বেকার এক শিক্ষিত যুবকের দৈনন্দিন অস্তিত্বের এই বৃত্তান্তে। জীবিকা ও জীবনধারণের উপায় খোঁজার তাড়ায় এই উপন্যাসে কলকাতা ও কলকাতার বাইরের সারাটা বাংলা যেন দুই মহাদেশ। এই মহাদেশের মধ্যবর্তী ব্যবধানটি উপন্যাসের প্রথমে মনে হয় দুস্তর, আর, শেষে মনে হয় চিরন্তন। সেই কঠিন বাঁচার মধ্যে কলকাতার বিপ্রতীপে 'রূপসী বাংলা'-র অনুষঙ্গ আসে অস্তিত্বমথিত এক বাস্তব হিশেবে—সে বাস্তবে কল্পনাটিই বাস্তব। জীবনানন্দের এ উপন্যাসের নায়ক তিরিশের দশকের গোড়ার সেই আশিরনখর বাঙালি যুবকটি—আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে যে খুব একটা প্রামাণিক হয়ে ওঠে নি। এই উপন্যাসে প্রায় একমাত্র চরিত্র প্রভাত, তিরিশের দশকের যুবক বাঙালির নাগরিক অস্তিত্বকে প্রামাণিকতা দিল।